ভারতের সাধক

প্র- খণ্ড

শঙ্করনাথ রায়
(প্র-না-ভ)

করুণা প্রকাশনী । কলিকাতা-৯



(ক) অষ্টম সংস্করণ : পৌষ ১৩১২

নবম মুদ্রণ আষাঢ়

প্রকাশক

শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন,

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

২০৯-এ, বিধান সরণি

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী

সুকুমার সেন

ভূমিকা

ভারতের সাধক যিনি লিখেছেন, তিনি আমার সতীর্থ, বন্ধু, তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমার অগ্রজ। আমি স্বেচ্ছায় তাঁর এই বই-এর ভূমিকা লেখবার ভার নিয়েছি, তাঁর কীর্তির পরিচয় দেবার জন্যে নয়, তাঁর কীর্তির সঙ্গে নিজের নামকে সংযুক্ত রাখবার লোভে।

যখন ধারাবাহিকভাবে হিমাদ্রিতে এই লেখাগুলি বেরুতে থাকে, জীবনী-লেখক হিসাবে আমার একটা স্বাভাবিক ঔৎসুক্য জেগে ওঠে, ঔৎসুক্য ধীরে মুগ্ধতায় পরিণত হয়। এ জাতীয় জীবনী বাংলা ভাষায় ইদানীং আমি আর পড়ি নি।

সাধু-সন্ত মহাপুরুষদের জীবন ও সাধনা নিয়ে বাংলা ভাষায় কিছু কিছু লেখা আছে, দু-একখানি জীবনী সংগ্রহ আছে। কিন্তু সেগুলি নিতান্ত মামুলী, অগভীর এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রামাণিক নয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধু মহাপুরুষদের জীবনা তাঁদের বিশেষ ভক্ত-শিষ্যদেরই লেখা এবং সে-সব জীবনীতে জীবনের উপকরণের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে ভক্ত-শিষ্যের ভক্তির উচ্ছ্বাস। সেইজন্যে ধর্মসাধক আত্মিক মহাপুরুষদের জীবন ও সাধনা নিয়ে সত্যিকারের সাহিত্যিকের লেখা একখানি প্রামাণ্য বই-এর খুবই অভাব ছিল। 'ভারতের সাধক' সার্থকভাবে সেই অভাব পরিপূরণ করেছে।

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ও বস্তুতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার তাড়নে এমন একদিন ছিল যখন সাধারণ শিক্ষিত লোক ধর্মকে অবাস্তব, কাল্পনিক ও জীবনে অপ্রয়োজনীয় মনে করতেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে য়ুরোপে কম্যুনিজম্-এর উত্থানের ফলে ধর্মবিরোধিতা শিক্ষিত মহলে ফ্যাসান হয়ে ওঠে। আজ বিংশ-শতাব্দীর মধ্য লগ্নে আবার তার প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে,

এই প্রতিক্রিয়ার সুযোগে যেমন একদিকে ধর্ম-ব্যবসা হঠাৎ বেড়ে উঠেছে, তেমনি একদল মানুষের মনে সত্যিকারের ধর্মজিজ্ঞাসা জেগেছে, আত্মিক জীবনের প্রতি মানুষের একটা সত্যিকারের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠেছে। আজ তাই সে চারিদিকে খুঁজছে, কোথায় এই আত্মিক জীবনের রহস্য নিহিত আছে? সে রহস্যের স্বরূপ কি? সম্ভাবনা কি?

ভারতের সাধকেব মরমী লেখক আজকের মানুষের এই নবজাগ্রত আত্মিক পিপাসার দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতের তথা বাংলার আত্মিক মহাপুরুষদের জীবন-সাধনার রহস্যকেন্দ্রের অনুসন্ধান করেছেন এবং সেই অনুসন্ধানের ফল ঔপন্যাসিকের সরস ভঙ্গীতে, ভক্তের অন্তদৃষ্টি ও জ্ঞানীর বিশ্লেষণ ভঙ্গীতে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

ভারতের সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, প্রত্যেক সাধক তাঁর নিজস্ব বিশেষ পন্থায় দিব্য সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। তাই ভারতের সাধনার ও ভারতীয় সাধকের সাধনার ধারা হয়তো বহুমুখী। কেউ নিজেকে শাক্ত বলে পরিচয় দিয়েছেন, কেউ বৈষ্ণব, কেউ তান্ত্রিক, কেউ বৈদান্তিক, কেউ বাউল কেউ সর্বত্যাগী যোগী। প্রত্যেকের লক্ষ্য এক, কিন্তু সাধনার ধারা স্বতন্ত্র। ভারতের সাধকের লেখক এই ঐতিহাসিক সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই বিভিন্ন পন্থাশ্রয়ী বিশেষ বিশেষ সাধকের জীবনী এই বইতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং সুগভীর ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেই সব বিভিন্ন সাধক মহাপুরুষদের বিভিন্ন সাধনার অন্তর্গূঢ় তত্ত্বকে অপূর্ব দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এবং লেখকের রচনার প্রধান কৃতিত্ব হল, তত্ত্বকে প্রকাশ করতে গিয়ে জীবনকে তিনি বাদ দেন নি। প্রত্যেক সাধকের জীবনের কাহিনী ঔপন্যাসিকের মতন তিনি জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। এই বিস্মৃত-স্মৃতি মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনী সংগ্রহের জন্যে দিনের পর দিন তিনি বিভিন্ন সূত্র ধরে গবেষণা করেছেন, বহু জীবিত লোকদের কাছ থেকেও বহু আখ্যান সংগ্রহ করেছেন এবং এর জন্যে সমস্ত পুরনো দলীলপত্র নিষ্ঠা সহকারে ঘেঁটেছেন। সর্বোপরি, এই জাতীয় জীবনী লেখবার জন্যে সব চেয়ে বেশী দরকার, লেখকের নিজস্ব আত্মিক সাধনার ঐকান্তিকতা, লোকচক্ষুর অন্তরালে ভারতের সাধকের লেখক সেখানে নিজেকে যে ঐকান্তিকতায় প্রস্তুত করেছেন তার চিহ্ন তাঁর লেখার প্রত্যেক চরণে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এই বই যিনি লিখেছেন, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তিনি বিশ্বাস করেন—

মানুষের. এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্র পৃথিবীর বাইরে বৃহত্তর অস্তিত্বের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আছে এবং সেই অদৃশ্য বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে আমাদের এই ইন্দ্রিয় পরিমিত ক্ষুদ্র পৃথিবীর একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে। এই সূত্রগুলির ওপর ভিত্তি ক'রেই তিনি এইসব জীবনী লিখেছেন। তাই তাঁর লেখায় লৌকিক ও অলৌকিক সমান মর্যাদা পেয়েছে।

আজ সারা বিশ্বে, তথা ভারতে ও বাংলায় একটা নতুন আত্মিক জীবনের আস্পৃহা জেগে উঠেছে। আমার বিশ্বাস, এই বই সেই নবজাগ্রত আস্পৃহার শিখাকে উজ্জ্বলতর করে তুলবে।

এ দেশের সব সাধক মহাপুরুষের জীবনী এখানে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নি, লেখকের উদ্দেশ্যও তা নয়। ভারতের সাধনার বিভিন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে লেখক সেইসব মহাপুরুষের জীবনীই গ্রহণ করেছেন, যাঁদের সাধনার একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে।

শঙ্করনাথ রায় লেখকের ছদ্মনাম। আজ বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম ব্যবহারের একটা রীতি এসেছে। এই ছদ্মনামের আড়ালেই তিনি থাকতে চান, তাই তাঁর নিভৃতি থেকে তাঁকে বাইরে আর টেনে আনতে চাইনে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

তৈলঙ্গস্বামী	...	১
যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী	...	৩৫
গম্ভীরনাথ মহারাজ	...	৭৩
স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী	...	১২৬
রামদাস কাঠিয়াবাবা	...	১৪৯
বামাক্ষেপা	...	২২৯
বালানন্দ ব্রহ্মচারী	...	২৬৫
স্বামী নিগমানন্দ	...	২৯২

শ্রীতৈলঙ্গ স্বামী

বারাণসীর আকাশগাত্রে প্রভাতের আলোক-ছটা সবেমাত্র ফুটিয়া উঠিতেছে। বিশ্বনাথ মন্দিরে মঙ্গলারতি শুরু হওয়ার আর বেশী দেরি নাই। শঙ্খ ঘণ্টার রবে সারা পথঘাট মুখরিত। দিকে দিকে শোনা যায় সুগম্ভীর স্তবধ্বনি—শিব-শম্ভো-শঙ্কর-হর-মহাদেও।

বেণীমাধবের ধ্বজার নিকটেই পঞ্চগঙ্গার প্রাচীন ঘাট। পাথরের সোপানগুলি ধাপে ধাপে নিচে বহুদূরে নামিয়া গিয়াছে। সম্মুখে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রসারিতা পুণ্যতোয়া জাহ্নবী।

ভক্ত মুমুক্ষু নরনারী রোজই দলে দলে স্নানান্তে এই ঘাটের উপরে উঠিয়া আসে। মহাকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসীর চরণে তাহারা নিবেদন করে সশ্রদ্ধ প্রণতি। 'হর হর বম্ বম্' নিনাদে শিরে তাঁহার ঢালিয়া দেয় পুষ্পাঞ্জলি আর গঙ্গাবারি।

নির্বিকার ধ্যানগম্ভীর যোগীর কিন্তু কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ভক্তের দল জানে তাঁহাকে সচল বিশ্বনাথরূপে। প্রতিদিন এমনি করিয়া এই মহাপুরুষকে তাহারা দর্শন করিতে আসে, সমাধি-মগ্ন নিস্পন্দ দেহে অর্পণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য, কৃতার্থ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়।

কাশীধামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে এই মানব-বিগ্রহ তৈলঙ্গ মহারাজ নামে পরিচিত। প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া এই শিবপুরীতে তিনি বিরাজমান। যোগেশ্বর মহাপুরুষ বলিয়া লোকে যেমন তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের চোখে দেখে, তেমনি জানে পরম আত্মজনরূপে। আপদ বিপদ ও সঙ্কটের দিনে এই মহাত্মারই পরমাশ্রয়ে তাহারা দিনের পর দিন ছুটিয়া আসে।

গঙ্গার ঘাটে যে-সব ভক্ত নরনারী একান্ত নিষ্ঠায় যোগীবরকে অর্ঘ্য দিতেছে, খোঁজ নিলে জানা যাইবে, তাহাদের পিতা, পিতামহ

ও প্রপিতামহও এমনিভাবে এই দেবদুর্লভ পুরুষের সান্নিধ্যলাভে হইয়াছে কৃতকৃতার্থ।

প্রায় দুইশত আশি বৎসরের সুদীর্ঘ জীবনে, কঠোর তপশ্চর্যার ফলে, তৈলঙ্গস্বামী অর্জন করেন অপরিমেয় যোগবিভূতি। কিন্তু এই পরম সম্পদের অধিকারী হইয়া জনসমাজ হইতে তিনি দূরে সরিয়া থাকেন নাই, মুক্তিকামী আর্ত মানবের কল্যাণে জীবন-পথের দুই পাশে এ-সম্পদ অবলীলায় তিনি ছড়াইয়া দিয়া যান।

স্বামীজী ছিলেন যোগসাধনার প্রদীপ্ত ভাস্কর। এই জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষের চরণতলে বসিয়া সাধক ও দর্শনার্থীর দল দিনের পর দিন আলোকস্নান করিয়াছে, জীবন তাহাদের সার্থক হইয়াছে। কিন্তু মহাযোগীর প্রকৃত স্বরূপ কি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে? কে-ই বা জানিয়াছে এই নিগূঢ় অধ্যাত্মজীবনের পরম মহিমা? এই করুণাঘন 'সচল-বিশ্বনাথে'র দিব্য স্পর্শে কত জীব যে শিব হইয়া উঠিয়াছে, সে সন্ধানই বা কয়জন রাখে?

বারাণসীর মহাতীর্থে ভক্ত সাধকদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। প্রায় একশত ত্রিশ বৎসরকাল ব্যাপিয়া স্বামীজীর উপদেশ ও আশীর্বাদ তাঁহাদের অনেকে লাভ করিয়াছেন, সাধনজীবনকে করিয়া তুলিয়াছেন উজ্জ্বলতর।

সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদের কথা। অন্ধ্রদেশের ভিজিয়ানাগ্রাম অঞ্চলে হোলিয়া নামক এক বর্ধিষ্ণু জনপদ তখন বর্তমান ছিল। নরসিংহ রাও সেখানকার এক ভূম্যধিকারী। সৎ ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া সকলে তাঁহাকে সম্মান করিত। তাঁহার স্ত্রী, ভক্তিমতী সাধিকা, বিদ্যাবতীরও সুনাম ছিল যথেষ্ট। স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া দেবপূজা, ব্রাহ্মণসেবা ও ধর্মাচরণে সদাই রত থাকিতেন।

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলেও রাও-দম্পতির কোনো সন্তান জন্মে নাই। বংশরক্ষার জন্য নরসিংহ তাই বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া আবার তাঁহাকে আর একটি বিবাহ করিতে হয়।

গৃহে বহুদিন যাবৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এবার হইতে এই দেববিগ্রহের সেবা-পূজাতেই বিদ্যাবতী তাঁহার বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়া দিতে থাকেন।

দেবাদিদেবের কৃপার ধারা অতঃপর একদিন নামিয়া আসে, ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের এক পুণ্যলগ্নে বিদ্যাবতী একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তান লাভ করেন। নরসিংহের গৃহ মুখর হইয়া উঠে আনন্দ কলরবে।

শিবের করুণায় জন্ম, তাই শিশুর নামকরণ করা হয়—শিবরাম। এই শিবরামই উত্তরকালে ভারতের অধ্যাত্ম-গগনে আবির্ভূত হন মহাযোগী তৈলঙ্গস্বামীরূপে।

শিবরামের আবির্ভাবের কিছুকাল পরে নরসিংহের অপর স্ত্রীর গর্ভেও এক পুত্রসন্তান জন্মে, তাহার নাম রাখা হয় শ্রীধর।

বিদ্যাবতী সেদিন শিবজীর ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। শিশু শিবরাম নিকটে বসিয়া আপন মনে খেলাধূলা করিতেছিল, তারপর শান্ত হইয়া কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মা তাহা লক্ষ্য করেন নাই। পূজা ধ্যান শেষ হইবার পর হঠাৎ এক অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গেলেন। দেখিলেন, শিব-বিগ্রহ হইতে নির্গত হইতেছে অলৌকিক জ্যোতির ধারা, আর সারা গর্ভ-মন্দিরটি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণকাল পরেই এই জ্যোতি ভূতলে শায়িত শিশুর দেহে বিলীন হইয়া গেল।

বড় অদ্ভুত কাণ্ড। বিদ্যাবতীর মনে জাগিল অজানা আশঙ্কা, ত্রস্তব্যস্তে পুত্রকে কোলে নিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

নরসিংহের নিকট এ ঘটনাটি বলা হইলে স্ত্রীকে তিনি সান্ত্বনা দিলেন, "ওগো, তুমি মিছে ভেবো না। এতে ভয় পাবার কিছুই নেই। এ সন্তান তুমি লাভ করেছো শিবজীর কৃপায়, এ তোমার দীর্ঘ আরাধনার ফল। প্রভু দেবাদিদেব আজ এ ইঙ্গিতটিই এভাবে তোমায় দিয়ে গেলেন।"

বালক শিবরাম বড় স্বভাবগম্ভীর। সে যেন শিশুরাজ্যের এক

ব্যতিক্রম। খেলাধূলায় তাহার কোনো আসক্তি নাই। চঞ্চল আনন্দ-মুখর সঙ্গীদের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজেকে সে বড় বিব্রত বোধ করে। শুধু বাল্যকালে বা কিশোর বয়সেই নয়, যৌবনের উন্মেষেও এই উদাসীন মনোভাব তাহার বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

পুত্রের বৈরাগ্য ও বিষয়বিরক্তি ছিল সহজাত। তারপর সাধিকা জননীর উপদেশ ও সহায়তায় গোড়ার দিকে সে তাহার বিধিনির্দিষ্ট জীবন-পথটি খুঁজিয়া পায়। এতদিনের শিবারাধনার ফলে সাধ্বী বিদ্যাবতী যাহা কিছু সাধনসম্পদ লাভ করিয়াছেন, পুত্রের জীবনে অকৃপণ করে তাহা ঢালিয়া দেন। অধ্যাত্মজীবনের প্রথম পদক্ষেপের কালে জননীই হন শিবরামের শিক্ষয়িত্রী। তাঁহারই নির্দেশিত পথে তরুণ সাধক অগ্রসর হইয়া চলেন।

পুত্রের চালচলন, তাহার এই বৈরাগ্য, নরসিংহ রাওকে কিন্তু চঞ্চল করিয়া তোলে। শিবরাম এখন যুবক। তাছাড়া, বংশের সে জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতা স্বভাবতই তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু বিবাহ করাইবেন কাহাকে? তরুণ পুত্রের মানসপটে ইতিমধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে সংসারের অনিত্যতাবোধ। চিরকুমার থাকিয়া, নিরুপদ্রবে, তিনি সাধন-ভজন করিতে চান। পিতার প্রস্তাবে তাই তীব্র অসম্মতি জানাইয়া বসিলেন।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা, শিবরামের মাতা বিদ্যাবতী নিজেই ছেলের এ মতকে সমর্থন করিয়া বসেন। নরসিংহকে বুঝাইয়া বলেন, "আমার শিবরাম সংসার করতে চায় না। চিরকুমার থেকে সাধনভজন করবে, ভগবান লাভ করবে—এ সংকল্পই সে করেছে। বেশ তো। এ রকম সাধুসংকল্পে তাকে আর বাধা দেওয়া কেন? বরং বলছি কি, ঈশ্বর-দর্শন ক'রে সে বংশের মুখ উজ্জ্বল করুক। ঘর-সংসার করার জন্যে তো শ্রীধরই রয়েছে।"

মহীয়সী জননীর এই কথায় সবাই সেদিন বিস্মিত হয়, মুগ্ধ হয়। অতঃপর নরসিংহ আর বড় ছেলের বিবাহের প্রস্তাব নিয়া পীড়াপীড়ি করেন নাই।

শিবরামের সাধন-জীবনের প্রথম বাধাটি সেদিন মায়ের হস্তক্ষেপে এমনি করিয়া অপসারিত হয়।

বৃদ্ধ নরসিংহ রাও-এর জীবনের দ্বারে হঠাৎ একদিন পরলোকের ডাক আসিয়া গেল। শিবরামের বয়স তখন চল্লিশ বৎসরের বেশী নয়। ইহার প্রায় বার বৎসর পরে বিদ্যাবতী দেবীও একদিন আত্মপরিজনদের মায়া কাটাইয়া প্রস্থান করিলেন সাধনোচিত ধামে। পিতার প্রয়াণে শিবরামের সংসারবন্ধন শিথিল হইয়াছিল, এবার জননীর তিরোধানে সে বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল।

গ্রামের শ্মশানের একপ্রান্তে একটি পর্ণকুটির তিনি বাঁধিলেন। নিমগ্ন হইলেন অধ্যাত্ম সাধনায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীধরের অশ্রুজল, আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের অনুনয়, কোনো কিছুই সেদিন তাহাকে সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু শ্রীধরকে দান করিয়া সংসারের বন্ধন তিনি ছিন্ন করিলেন।

সাধনকুটিরের একদিকে রহিয়াছে চিতাভস্মপূর্ণ মহাশ্মশান, আর একদিকে কল্লোলিনী তটিনী। জীবন-মরণের এই পটভূমিকায় বসিয়া দুর্জ্ঞেয় মহাসত্যকে শিবরাম উপলব্ধি করিতে চান। একান্তে, পরম নিষ্ঠায়, তাঁহার সাধনা অগ্রসর হইয়া চলে।

ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফল অবশেষে ফলিয়া যায়। কোন এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে শ্মশানের ঐ পর্ণকুটিরটিতে সেদিন পদার্পণ করেন স্বামী ভগীরথানন্দ সরস্বতী। পাঞ্জাবের বাস্তর গ্রামে ছিল এই শক্তিমান্ সাধকের পূর্বাশ্রমের গৃহ। ইনিই শিবরামের ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পথপ্রদর্শক—চিহ্নিত যোগীগুরু।

ভগীরথ স্বামীর ইঙ্গিতে শিবরাম এবার চিরতরে হোলিয়া গ্রাম ত্যাগ করেন। তারপর দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের বহুতর তীর্থ পর্যটনের পর উভয়ে আসিয়া উপস্থিত হন পুষ্করে। এই পবিত্র তীর্থে সাধক শিবরাম স্বামীজীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এ সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় আটাত্তর বৎসর। সন্ন্যাস আশ্রমে তাঁহার

নূতন নামকরণ হয়—গণপতি সরস্বতী। কিন্তু তেলঙ্গ দেশ হইতে আগত সন্ন্যাসী বলিয়া উত্তরকালে কাশীর জনসাধারণ তাঁহাকে অভিহিত করিত তৈলঙ্গস্বামী নামে।

দীক্ষা গ্রহণের পর হইতেই শিবরাম সাধনার গভীরে নিমজ্জিত হইয়া যান। গুরু ভগীরথ স্বামীর নির্দেশে হঠযোগ ও রাজযোগের দুরূহ সোপানগুলি একে একে তিনি অতিক্রম করেন। দশ বৎসর কঠোর তপশ্চর্যার পর গুরুকৃপায় পরিণত হন এক যোগসিদ্ধ মহা-শক্তিধর মহাপুরুষরূপে। গুরু পুষ্করতীর্থেই মরলীলা সংবরণ করেন। তারপর তৈলঙ্গস্বামীজী ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহের পরিক্রমায় বহির্গত হন। এ সময়ে তাঁহার বয়স ছিল অষ্টাশি বৎসর। কিন্তু এই বয়সেও জরাবার্ধক্যমুক্ত এই সিদ্ধযোগীর সুগঠিত দেহ লোকের মনে বিস্ময় জাগাইয়া তুলিত।

কয়েক বৎসর পরের কথা। স্বামীজী তাঁহার পর্যটনের পথে সেবার সেতুবন্ধ রামেশ্বরধামে উপনীত হইয়াছেন। মহা সমারোহে সেখানে এক বৃহৎ মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত এক ব্রাহ্মণতনয় এ সময়ে এই তীর্থক্ষেত্রে অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃতদেহ সৎকারের আয়োজনে সকলে ব্যস্ত, মৃতের আত্ম-পরিজনের বিলাপ ও আর্তনাদে অবতারণা হইয়াছে এক করুণ দৃশ্যের।

প্রশান্তবদন বিরাটকায় এক সন্ন্যাসী দণ্ডকমণ্ডলু হস্তে ঐ স্থান অতিক্রম করিতেছিলেন। বিলাপ ও কান্নার করুণ ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, অন্তরে জাগিল আলোড়ন। কমণ্ডলু হইতে কিছুটা জল নিয়া মহাপুরুষ অস্ফুটস্বরে কি এক মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন।

ঐ জল মৃতের দেহে ছড়াইয়া দিবামাত্র এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়া যায়। সহস্র মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে যুবক ব্রাহ্মণটি ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করে। দেখা যায়, মহাত্মার যোগবিভূতির বলে শবদেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে যোগীপুরুষ কিন্তু জনতার ভিড় এড়ানোর জন্য কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

মেলার একদলসিদ্ধমহাপুরুষের কাছে কিন্তু এই শক্তিধর সন্ন্যাসীর পরিচয় সেদিন গোপন ছিল না। তাঁহাদের কাছে শোনা গেল, ইনি মহাযোগী ভগীরথজীর সার্থকনামা শিষ্য, গণপতিস্বামী। উত্তরকালে এই সন্ন্যাসীই প্রসিদ্ধি লাভ করেন তৈলঙ্গ মহারাজ নামে।

ইতিমধ্যে আরও বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। স্বামীজী মহারাজ নানা দুর্গম তীর্থ পরিক্রম করিতে করিতে এক সময়ে নেপালে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানকার গভীর অরণ্যে এ সময়ে কিছুকালের জন্য তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করেন।

নেপালের এক রানা সেদিন শিকারের উদ্দেশ্যে সদলবলে গহন বনের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল, কয়েকটি গুলীও তিনি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু বার বারই হইল তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট।

রানার জেদ চাপিয়া গেল। সঙ্গীদের ফেলিয়া দ্রুতবেগে তিনি শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। খানিক পরেই যে দৃশ্য সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলেন বিরাটকায় এক যোগী অদূরে বৃক্ষমূলে সমাসীন রহিয়াছেন, আর পলায়মান সেই বাঘটি গর্জন করিতে করিতে তাঁহার আসনের সম্মুখে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে যোগীবর আদর করিয়া ঐ শরণাগত ব্যাঘ্রের দেহে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছেন। তাঁহার কাছে এটি যেন এক পোষা মার্জার।

রানা ও তাঁহার অনুচরগণ তো বিস্ময়ে হতবাক্! দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহারা নির্নিমেষে এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছেন। এমন সময়ে হস্ত সঞ্চালন করিয়া যোগী রানাকে অভয় দিলেন, নিকটে ডাকিলেন।

প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সস্নেহে তিনি কহিলেন, "দেখো বেটা, ইহা কোই ডরকা কারণ নহীঁ হ্যায়। তেরা মনসে

হিংসা হটা দো, ইয়ে শের তুমকো কুছ্ বিগাড়নে নহীঁ সাকেগা। সবকোই জীব তো একহী ভগবানকো সৃষ্টি হ্যায়—উস্ কো প্রেম দো, উয়ো ভী জরুর তুম্‌কো প্রেম দেগা। ইয়ে বাত্ ঠিক্‌সে ইয়াদ্ রাখ্‌না”—অর্থাৎ, ছাখো বাবা, আমার এখানে তোমার ভয়ের কোনো কারণ নেই। তোমার মন থেকে হিংসা দূর করে দাও, তাহলে বাঘ কখনো তোমার অনিষ্টসাধনে সক্ষম হবে না। সব জীবই তো তোমার ঈশ্বরের সৃষ্টি—সব জীবকেই তুমি সত্যকার প্রেম দাও, তারাও তোমাকে এ প্রেম ফিরিয়ে দেবে।

রানা সাহেব সেদিন কাঠমাণ্ডুতে ফিরিয়া গিয়া নেপালের প্রধান মন্ত্রীর কাছে এই অদ্ভুতকর্মা মহাযোগীর কাহিনী বিবৃত করেন। শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ বহুতর ভেট নিয়া প্রধানমন্ত্রী তৈলঙ্গস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, আশীর্বাদ লাভে ধন্য হন।

যোগীবরের অলৌকিক কাহিনীর কথা লোকমুখে ক্রমে প্রচারিত হয়, অরণ্যমধ্যে প্রচুর জনসমাগম হইতে থাকে। অতঃপর বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই বনাঞ্চল ত্যাগ করিতে হয়।

স্বামীজীর বিভূতিলীলা এই সময় হইতে নানাস্থানে প্রকটিত হইতে থাকে। শোক তাপ ও ব্যাধি জর্জরিত মানবের দুঃখমোচনের জন্য আগাইয়া আসিয়া যোগবিভূতির এই লীলা আত্মপ্রকাশ করে করুণালীলারূপে। আপনভোলা মহাশক্তিধর সন্ন্যাসীর মর্মকেন্দ্রে যাহারই আর্ত আবেদন কোনোমতে একবার পৌঁছিতে পারিয়াছে, কৃপার ধারায় তখনি সে হইয়াছে অভিসিক্ত।

নেপাল ত্যাগের পর তিব্বত ও মানস-সরোবর ঘুরিয়া স্বামীজী সেবার হিমালয় হইতে নিচে অবতরণ করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন পথের একস্থানে গ্রামবাসীদের ভিড়। সেখানে, সাত বৎসর বয়স্ক একটি বালকের মৃতদেহ কোলে করিয়া নিয়া এক বিধবা স্ত্রীলোক উচ্চস্বরে কাঁদিতেছে। এই বালকই ছিল তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, নয়নের মণি। তাহাকে হারাইয়া অভাগিনীর হৃদয়ে

শোক-সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে, কোনো প্রবোধবাক্যই সে কানে তুলিতেছে না।

সঙ্গীরা শব সৎকারের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময় স্বামীজী ধীর পদক্ষেপে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তেজঃপুঞ্জকলেবর কে এই বিরাটকায় সন্ন্যাসী? তাঁহাকে দর্শন করামাত্র পুত্রশোকাতুরা মাতার অধীরতা কেন যেন হঠাৎ থামিয়া গেল। তবে কি তাহারই বিপদোদ্ধারের জন্য, এই মৃত শিশুকে বাঁচানোর জন্য, এ মহাপুরুষের আবির্ভাব? ইনি কি দৈব-প্রেরিত? শোকাকুলা জননী তখনি মৃত বালকটিকে কোল হইতে নামাইয়া সন্ন্যাসীর পদতলে শোয়াইয়া দিল।

রমণীর ক্রন্দন ও মিনতিতে যোগীবরের দুই চোখ করুণায় ছল্-ছল্ করিয়া উঠিল। প্রশান্ত বদনে অস্ফুট স্বরে কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মৃতদহেটি তিনি স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শবদেহে দেখা গেল প্রাণের স্পন্দন। একি বিস্ময়কর কাণ্ড! জননী ও আত্মজনেরা বালকটিকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ বাদেই শক্তিধর সন্ন্যাসীর খোঁজ পড়িল। কিন্তু তিনি কোথায়? তাঁহাকে তো পাওয়া যাইতেছে না। সবার দৃষ্টি এড়াইয়া খেয়ালী সন্ন্যাসী কোন্ গিরিকন্দরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই।

উত্তরাখণ্ড হইতে অবতরণ করার পর তৈলঙ্গস্বামী নর্মদাতীরে আসিয়া উপস্থিত হন। সর্বজনবন্দিতা এই স্রোতস্বিনীর তটে রহিয়াছে পুরাণ-বিশ্রুত মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রম। কয়েকটি বিশিষ্ট সাধু মহাত্মা সে-সময়ে এই পবিত্রস্থানে বসিয়া তপস্যা করিতেছেন। এই আশ্রমের এক কোণে নিজের আসনটি স্থাপন করিয়া তৈলঙ্গ মহারাজ কিছুকালের জন্য ধ্যানধারণায় রত হইলেন।

খাকাবাবা নামে এক মহাপুরুষ দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে অবস্থান করিতেছিলেন। এ অঞ্চলে তাঁহার যোগসিদ্ধির খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট

একদিন শেষরাত্রে খাকীবাবা নর্মদার তীরে বসিয়া সাধনক্রিয়া করিতেছেন, হঠাৎ নর্মদার জলধারার দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। অদূরে দেখিলেন এক বিচিত্র দৃশ্য!—নর্মদার জলস্রোত শুভ্র দুগ্ধধারায় রূপান্তরিত হইয়া কুলুকুলু শব্দে বহিয়া যাইতেছে, আর স্রোতমধ্যে দণ্ডায়মান তৈলঙ্গস্বামী এই দুগ্ধধারা বার বার অঞ্জলি পুরিয়া পান করিতেছেন।

মহাপুরুষ খাকীবাবা মুহূর্তে বুঝিয়া নিলেন, নবাগত সন্ন্যাসী তৈলঙ্গস্বামীর শক্তিবলেই সঙ্ঘটিত হইয়াছে এমন বিস্ময়কর কাণ্ড। কোন্ এক আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে মহাযোগীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল নর্মদা-মাঈর স্তন্যধারা পান করার অভিলাষ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সেই অভিলাষই হইয়াছে অমোঘ, পীযূষধারাকে আজ এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে।

বড় অভাবনীয় নর্মদার এই পরিবর্তন! অলৌকিক শক্তি হইতে উদ্ভূত ঐ দুগ্ধধারা পানের জন্য খাকীবাবাও উৎসুক হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! তিনি উহা স্পর্শ করিবামাত্রই সেই মুহূর্তে নদীর জল পূর্বাবস্থা ধারণ করিয়া বসিল। বিস্ময়-বিহ্বল খাকীবাবা বহুক্ষণ নদীতীরে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মার্কণ্ডেয় আশ্রমের সন্ন্যাসীরা সকলেই তৈলঙ্গস্বামীজীকে শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন। এবার মহাত্মা খাকীবাবার মুখে এই অলৌকিক অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিয়া সকলেই বুঝিলেন, সাধনার সুমেরুশিখরে আরোহিত এই নবাগত যোগীর শক্তি পরিমাপ করিতে অনেকেরই কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া যাইবে।

নর্মদাতটের এ আশ্রমে আট বৎসর অবস্থানের পর তৈলঙ্গস্বামী প্রয়াগে আসিয়া উপনীত হন।

সেদিন ত্রিবেণীসঙ্গমের ঘাটে স্বামীজী বসিয়া আছেন। গ্রীষ্মকাল। আকাশে হঠাৎ দেখা গেল মেঘের ঘনঘটা। কালো কালো মেঘের

বুক চিরিয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিতেছে। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় স্থানটি তখন প্রায় জনশূন্য।

রামতারণ ভট্টাচার্য নামে এক পণ্ডিত তৈলঙ্গস্বামীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। নদীতীরে আসিয়া যোগীবরের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িতেই বড় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। এ সময়ে বাবা এখানে বসিয়া? ঝড় বাদলে যে তাঁহার মহা কষ্ট হইবে!

নিকটে আসিয়া কহিলেন, "বাবা, এখনি ঝড় উঠছে। আপনি নদীতীরে বসে অনর্থক কেন কষ্ট পাবেন? কাছেই লোকালয় রয়েছে, সেখানে এসে বসুন।"

স্বামীজী প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "হমারে লিয়ে ফিকর্ মত্ করো, হমারা কোই কষ্ট নহীঁ হোগা। লেকিন, উস্ নাওকে যাত্রীয়োঁকো তো রক্ষা করনে পড়েগা!" অর্থাৎ, আমার জন্য কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কোনো কিছুতেই আমার বিপদ হয় না, কষ্ট হয় না, কিন্তু ঐ নৌকার আরোহীদের তো বাঁচাতে হবে!

স্বামীজীর অঙ্গুলি-সংকেত অনুসরণ করিয়া পণ্ডিত, রামতারণ লক্ষ্য করিলেন, দূরে একটি নৌকা তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদীর সহিত যুঝিতেছে। বহুতর আরোহী উহাতে দণ্ডায়মান। সংগমঘাট লক্ষ্য করিয়া নৌকাটি অতি কষ্টে তীরের দিকে আসিতেছে। কিন্তু একি দুর্দৈব! প্রচণ্ড ঝড়ের তাড়নায় হঠাৎ যে উহা নদীগর্ভে তলাইয়া গেল!

এ দৃশ্য বড় মর্মান্তিক। রামতারণ আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। স্বামীজী তাঁহার পাশেই উপবিষ্ট, তাঁহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে গিয়া বিস্ময় তাঁহার চরমে উঠিল। আসনখানি শূন্য। মুহূর্তমধ্যে তিনি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন! নদীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই রামতারণ পণ্ডিতকে একেবারে হতবুদ্ধি হইতে হইল। একি! নিমজ্জিত নৌকাটি আবার কোন্ ইন্দ্রজালবলে ভাসিয়া উঠিয়াছে!

আরোহীদের নিয়া নৌকাটি যখন এপারে পৌঁছিল পণ্ডিতের তখন বাক্‌স্ফূর্তি হইতেছে না। দেখিলেন, স্বামীজীও অপর আরোহীদের সঙ্গে ঘাটে অবতরণ করিতেছেন।

কোথা হইতে, কখন যে উলঙ্গ সন্ন্যাসী নৌকায় চড়িয়া বসিলেন, মাঝি-মাল্লা ও আরোহীরা তখন অবধি সে রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই।

ঝড়ের বেগ তখনো একেবারে প্রশমিত হয় নাই। স্নানের ঘাট প্রায় জনশূন্যই রহিয়াছে। রামতারণ স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, তারপর ভক্তি গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, যে অপূর্ব বিভূতিলীলা আপনার কৃপায় আজ নিজের চোখে দেখলাম, তাতে থ বনে গিয়েছি। এ অলৌকিক শক্তি কি ক'রে মানুষ লাভ করে, তা আজ আমায় খুলে বলতে হবে।"

পথ চলিতে চলিতে স্বামীজী স্মিতহাস্যে বলিলেন, "রামতারণ, এতে কিন্তু অবাক্ হবার কিছুই নেই। ঐশী শক্তি সমস্ত মানুষের মধ্যেই গুপ্ত রয়েছে। বেটা, তাকে জাগ্রত ক'রে নিতে পারলেই তো সবকিছু সম্ভবপর হয়। এ মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে, প্রকৃত স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়েই মানুষ বরং আজ অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। তাই যা তার অতি স্বাভাবিক শক্তি তাকে অলৌকিক ও অদ্ভুত মনে ক'রে সে চমকে ওঠে।"

• •

এই ঘটনার পর তৈলঙ্গস্বামীজী বারাণসীধামে উপনীত হন। ১৯৪৪ সালের মাঘ মাস। শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ চলিতেছে। এই সময়ে একদিন প্রত্যূষে অসিঘাটে ঘটে এই মহাকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। কাশীধামের জনজীবনে অচিরে এই আবির্ভাব এক আলোড়ন জাগাইয়া তোলে।

সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তৈলঙ্গস্বামীর যোগৈশ্বর্য-লীলা একটির পর একটি এই পুণ্যতীর্থে প্রকটিত হইতে থাকে। শিবপুরী কাশীধামে তিনি অখ্যাত হন 'সচল বিশ্বনাথ' নামে, এদেশের সাধকসমাজে লাভ করেন অভূতপূর্ব মর্যাদা।

ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে বৎসরের পর বৎসর অগণিত তীর্থকামী মানুষ বারাণসীতে উপস্থিত হয়। বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, দশাশ্বমেধ ও

মণিকর্ণিকা ঘাট দর্শনের পরই সকলে ছুটিয়া যায় তৈলঙ্গস্বামীজীর দর্শনে। এই বহুকীর্তিত মহাযোগীর আশীর্বাদ না নিয়া কেহ সহসা কাশীধাম ত্যাগ করিতে চায় না।

প্রথমে স্বামীজী অসিঘাটে তুলসীদাসের বাগানে বাস করিতে থাকেন। আপনভোলা মহাপুরুষ একদিন ধীর পদে হেলিতে দুলিতে লোলার্ককুণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সামনেই এক দুর্ভাগা রাস্তার ধারে বসিয়া রোগযন্ত্রণায় ক্রন্দন করিতেছে।

লোকটি জন্মবধির, তদুপরি কুষ্ঠরোগে একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। নাম তাহার ব্রহ্মসিংহ, বাড়ি আজমীর দেশে। এই বিকটদর্শন রোগী ও তাহার কাতর কণ্ঠ তৈলঙ্গ মহারাজের অন্তরে করুণা জাগাইয়া তুলিল। ধীর পদক্ষেপে সর্বজনপরিত্যক্ত লোকটির সম্মুখে গিয়া তিনি দাঁড়াইলেন।

মহাযোগীর দর্শনমাত্র ব্রহ্মসিংহের রোগযন্ত্রণা নিমিষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। শিবপ্রতিম এই মহাপুরুষের স্তুতিতে তাহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতে লাগিল শিবারাধনার স্তোত্ররাশি।

অপূর্ব এ স্তববন্দনা আর্ত ভক্তের। মহাযোগীর আনন প্রসন্ন মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তখনি সস্নেহে একটি বিল্বপত্র ব্রহ্মসিংহের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বাবা, তোমার চিন্তা নেই, লোলার্ককুণ্ডে এখনি স্নান সমাপন ক'রে এসো। তারপর এই বেলপাতাটি তুমি শিরে ধারণ করো, অচিরে হবে রোগমুক্ত।"

ব্রহ্মসিংহের উৎকট ব্যাধি অতঃপর সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায় এবং স্বামীজীর একনিষ্ঠ ভক্তরূপে সে গণ্য হয়।

ইহার পর স্বামীজী কিছুকাল ব্যাস আশ্রমে অবস্থান করিতে থাকেন। একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি গঙ্গার ঘাটে গিয়াছেন। সম্মুখে জনতার মস্ত ভিড়। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছেন।

এই ভদ্রলোকের নাম সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যক্ষ্মারোগে

ভুগিয়া ভুগিয়া একেবারে অস্থিচর্মসার হইয়াছেন। আজ গঙ্গাস্নানে আসিয়া রোগযন্ত্রণায় হঠাৎ তিনি অচেতন হইয়া পড়েন। স্নানার্থীদের কয়েকজন এ সময়ে তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যস্ত। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিয়া ঘাটের অনেকেই হায়-হায় করিতেছে।

তৈলঙ্গস্বামী থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কি জানি কেন, মৃত্যুপথযাত্রী এই রোগী মহাযোগীকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

সম্মুখে আসিয়া কৃপাভরে অঙ্গুলিদ্বারা তিনি সীতানাথের বক্ষ স্পর্শ করিলেন। নিস্পন্দ দেহে দেখা দিল প্রাণের লক্ষণ, লুপ্ত চেতনা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এ যেন তাঁহার পুনর্জীবন! চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, বিরাটকায় যোগীরাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান।

আর্ত ব্রাহ্মণ করজোড়ে তাঁহার দুরারোগ্য ব্যাধির কথা নিবেদন করিতেছেন, আর দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। স্বামীজী তাঁহাকে অভয় দিলেন, আর দিলেন ঔষধরূপে কিঞ্চিৎ গঙ্গামৃত্তিকা। নির্দেশ রহিল—গঙ্গাস্নানের পর প্রতিদিন তাঁহাকে উহা সেবন করিতে হইবে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবার ঐ রোগ হইতে মুক্ত হন। তৈলঙ্গ মহারাজের করুণালীলার এক প্রত্যক্ষ নিদর্শনরূপে দীর্ঘদিন তিনি কাশীতে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন।

স্বামীজী হনুমানঘাটে বাস করার সময়ও এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। এ অঞ্চলের একটি সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মহিলা রোজই বিশ্বনাথের চরণে পূজা দিতে যাইতেন। পূজা-উপচারাদি নিয়া সেদিনও তিনি মন্দিরের দিকে চলিয়াছেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, অপরিসর রাস্তাটি জুড়িয়া বিপরীত দিক হইতে হেলিয়া দুলিয়া আসিতেছেন ভীমকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসী, তৈলঙ্গস্বামী।

ভয়ে সংকোচে মহিলাটি একপাশে সরিয়া দাঁড়ান। স্বামীজীকে উদ্দেশ করিয়া এ সময়ে নানা কটূক্তি করিতেও তিনি ছাড়েন না।—সন্ন্যাসী হইয়া যদি উলঙ্গই থাকিবে তবে বনে-জঙ্গলে গেলেই তো হয়। জনাকীর্ণ তীর্থস্থানে পড়িয়া থাকার দরকার কি? শ্লেষপূর্ণ

তিরস্কার ও ধিক্কার বার বার বর্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু যাঁহাকে কথাগুলি বলা হইতেছে তিনি একেবারে নির্বিকার। বীতরাগভয়ক্রোধ মহাযোগী প্রশান্তচিত্তে আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন।

যথারীতি বিশ্বনাথজীর পূজা-ধ্যান সারিয়া মহিলাটি গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। সেইদিন রাত্রেই তিনি কিন্তু এক চাঞ্চল্যকর স্বপ্ন দেখিলেন।—বিশ্বনাথ স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত। সক্রোধে প্রভু বলিতেছেন, "ছাখ্, যে সংকল্প নিয়ে তুই রোজ আমার পূজা দিচ্ছিস তা তো আমাদ্বারা সিদ্ধ হবে না। উলঙ্গ মহাযোগীকে তুই আজ পথের মাঝে অপমান করেছিস। কিন্তু জেনে রাখিস, শুধু তাঁর কৃপায়ই তোর মনস্কামনা সফল হতে পারে, অন্য কোনো উপায় নেই।"

মহিলার স্বামীর উদরে হইয়াছে মারাত্মক ক্ষত। জীবন রক্ষার কোনো আশাই তাঁহার নাই। স্বামীর রোগমুক্তির সংকল্প নিয়াই যে তিনি এতদিন যাবৎ বিশ্বনাথের পূজা দিতেছিলেন।

আজিকার এই স্বপ্নদর্শনে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। না জানিয়া কি কুক্ষণে শক্তিধর সন্ন্যাসীকে অপমান করিয়াছেন। মহাপুরুষ কি তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন? স্বামীকে কি আর বাঁচানো যাইবে? আবার ভাবিতে লাগিলেন—নির্বিকার যোগীবর তাঁহার তিরস্কারে তো কর্ণপাত করেন নাই। ভাবতন্ময় অবস্থায় আপন মনেই তিনি পথ চলিতেছিলেন। নিশ্চয় তাঁহার কৃপা মিলিবে!

পরের দিনই মহিলাটি ব্যাকুল হইয়া স্বামীজী মহারাজের পদতলে পতিত হইলেন। বার বার মাগিলেন ক্ষমা, আর তাঁহার মৃতকল্প স্বামীর জন্য প্রাণভিক্ষা।

কৃপা মিলিতে কিন্তু দেরি হয় নাই। যোগীবর প্রসন্ন বদনে এক মুষ্টি ভস্ম তাঁহাকে প্রদান করেন, আর ইহা দেহে লেপন করিয়াই তাঁহার স্বামী ব্যাধির কবল হইতে মুক্ত হন।

সেবার একজন দেশীয় নৃপতি সপরিবারে কাশীতে তীর্থ করিতে আসিয়াছেন। সেদিন ছিল এক মহা পুণ্যযোগ। দশাশ্বমেধ ঘাটে

রানী ও পরিজনবর্গসহ তিনি স্নান করিবেন, তাহারই তোড়জোড় তখন চলিতেছে।

রাজপ্রাসাদ এই ঘাটেরই সন্নিকটে। পুরমহিলারা রক্ষণশীল, তাই তাঁহাদের স্নানের জন্য একটি বস্ত্রবেষ্টনী প্রস্তুত করা হইয়াছে—প্রাসাদ হইতে দশাশ্বমেধ ঘাট অবধি তাহা প্রসারিত।

রাজা ও রানী এই বেষ্টনীর মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছেন। এমন সময় সেখানে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সিপাই সান্ত্রীদের কড়া পাহারা এড়াইয়া কোন ফাঁকে এক মহাকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসী তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রানী ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি একপাশে সরিয়া গেলেন। হাঁক-ডাকের সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীরা অনুচরগণ ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়া ফেলিল।

রাজা বাহাদুর তো ক্রোধে অধীর। এ কোন কাণ্ডজ্ঞানহীন সন্ন্যাসী? উপযুক্ত শাস্তি না দিয়া কিছুতেই তিনি ইহাকে ছাড়িবেন না। পাহারাধীনে সন্ন্যাসীকে প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল।

দশাশ্বমেধ ঘাটের জনতার নিকট এ সন্ন্যাসীর পরিচয় অজানা নয়। তখনি সর্বত্র সংবাদ রটিয়া গেল, তৈলঙ্গস্বামীকে রাজপ্রাসাদে ধরিয়া নিয়া যাওয়া হইয়াছে।

তখনি কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত রাজার কাছে গিয়া উপস্থিত হন, স্বামীজীর মাহাত্ম্য ও পরিচয় তাহাকে জানাইয়া দেন।

তৈলঙ্গস্বামীকে মুক্তি দেওয়া হয় বটে, কিন্তু রাজার কয়েকটি অত্যুৎসাহী অনুচর প্রাসাদের বাহিরে তাঁহাকে অপমানিত করে।

সেইদিনই রাত্রে রাজাবাহাদুর এক আতঙ্ককর স্বপ্ন দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন।—জটাজুটধারী ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত এক পুরুষ সক্রোধে ত্রিশূল আন্দোলিত করিতেছেন, আর রোষকষায়িত নেত্রে রাজার দিকে তাকাইয়া কহিতেছেন, "তোর এত বড় স্পর্ধা! তুই তৈলঙ্গস্বামীজীর পরিচয় জেনেছিস, তারপরও তোর অনুচরেরা তাঁকে অপমান করার সাহস পেলো। তোর মতো দুরাচার এ শিবধামে থাকবার উপযুক্ত নয়। আজই তুই এখান থেকে দূর হ।"

রাজার ভয়ার্ত চীৎকারে প্রাসাদের লোক-লস্কর সবাই জাগিয়া উঠিল। সারাটা রাত কাটিয়া গেল আতঙ্ক ও উত্তেজনায়। পরদিন ভোর হইতে না হইতেই রাজা নগ্ন সন্ন্যাসীর চরণতলে গিয়া পতিত হইলেন। তৈলঙ্গস্বামী পরম কৃপালু, সদানন্দময় মহাযোগী—অনুতপ্ত রাজাকে ক্ষমা করিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

স্বামীজী মহারাজ যেমনি এক মহাশক্তিধর যোগী, তেমনি তিনি পরম কারুণিক—কাশীর জনসাধারণের মধ্যে কাহারও একথা অজানা নাই। তাই রাস্তা ঘাটে বাহির হইলেই আধি-ব্যাধিক্লিষ্ট নরনারী তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকে। মহাপুরুষের প্রধান আশ্রয়স্থল তাঁহার গঙ্গামাঈ। প্রায়ই পুণ্যতোয়া গঙ্গার এক একটি ঘাটে আসিয়া তিনি উপবেশন করেন, ধ্যান সমাধিতে মগ্ন হন। আবার ভিড় জমিলেই গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিয়া হন অদৃশ্য।

কখনো বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিকায় দেহটি নিয়া অবলীলায় তাঁহাকে জলবিহার করিতে দেখা যায়। ঘাটের সবাই নির্নিমেষ নয়নে এই স্বেচ্ছাময় মহাপুরুষের দিকে তাকাইয়া থাকে।

গঙ্গামাঈর প্রতি বরাবরই স্বামীজীর আকর্ষণ বড় প্রবল ছিল। সুযোগ পাইলেই পরম আনন্দে এই পুণ্যতোয়া তটিনীর বক্ষে তিনি বিচরণ করিতেন। অনেকে বলিত, গঙ্গাপুত্র ভীষ্মই এ যুগে আবার মর্ত্যলোকে অবতরণ করিয়াছেন। স্বামীজীর শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায় গুরুর গঙ্গাবিহারের বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"..উভয়ে স্নান করিবার জন্য জলে নামিলাম। তিনি নিস্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ জলের উপর চিত হইয়া ভাসিতে লাগিলেন। তাহার পর কোনো অঙ্গ সঞ্চালন না করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুদূর যাইয়া জলে মগ্ন হইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইলেন আর দেখিতে পাইলাম না। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে আবার আমার নিকটেই ভাসিয়া উঠিলেন। পরে জল হইতে সিঁড়ির উপর উপবেশন করিলে, আমি তাঁহার অঙ্গ মুছাইয়া দিলাম এবং উভয়ে আশ্রমে গমন করিলাম।"

গঙ্গার স্রোতে ভাসমান থাকার কালে স্বামীজী বালকবৎ নানা আচরণ করিতেন। দিগম্বর আত্মভোলা ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের এই নদী-বিহারের সহিত কাশীর সকলেই সে সময়ে পরিচিত ছিল।

সেবার উজ্জয়িনীর মহারাজা কাশীধামে আসিয়াছেন। একদিন ব্যাসকাশী ও রামনগর দর্শন করিয়া তিনি নৌকাযোগে এপারে ফিরিতেছেন, সহসা দেখা গেল, জাহ্নবীর স্রোতে এক বিশালবপু সাধু ভাসমান। নৌকারোহীদের মধ্যে কেহ কেহ তৈলঙ্গস্বামীকে চিনিতেন। রাজার নিকট তাঁহারা এই মহাযোগীর পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন।

অল্পকাল পরেই দেখা গেল, স্বামীজী মনের আনন্দে সন্তরণ করিয়া তাঁহাদের দিকেই আসিতেছেন। নিকটে আসিলে সসম্ভ্রমে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নৌকায় তোলা হইল।

মহারাজ ও তাঁহার পার্ষদেরা স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন। মৌনী যোগীবরকে ঘিরিয়া সকলে কৌতূহলী হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় তিনি এক খামখেয়ালী শিশুর ন্যায় আচরণ করিয়া বসিলেন। উজ্জয়িনীরাজের কটিদেশে ঝুলানো রহিয়াছে এক তরবারি, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

তরবারিটি চাহিয়া নিয়া, খানিকক্ষণ নাড়িয়া-চাড়িয়া স্বামীজী হঠাৎ উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলে কি হয়, স্বামীজী কিন্তু খল্‌খল্ করিয়া বালকের ন্যায় হাসিতেছেন—এ যেন নিতান্তই এক মজার খেলা!

এই তরবারিটি মহারাজা তাঁহার মর্যাদার স্বীকৃতিস্বরূপ ইংরেজ সরকার হইতে পাইয়াছেন। তাঁহার কাছে এটি মহা মূল্যবান, তাই তাঁহার ক্ষোভ ও ক্রোধের সীমা রহিল না। উন্মত্ত সন্ন্যাসীকে কঠোর শাস্তি দিবেন বলিয়া বার বার শাসাইতে লাগিলেন।

নৌকায় কয়েকজন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহারা তৈলঙ্গস্বামীজীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন।

তাঁহারা আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনি মোটেই অধীর হবেন না, দক্ষ ডুবুরির সাহায্যে ঐ তরবারি উদ্ধার করা যাবে। স্বামীজী মহাব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। স্বেচ্ছাময় হলেও, কারুর কোনো ক্ষতি তাঁর দ্বারা কখনও হতে দেখি নি। আপনি শান্ত হোন।"

নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। ক্রুদ্ধ মহারাজ উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "এ নাঙ্গা সাধুকে তোমরা ছেড়ে দিও না। এর হঠকারিতার শাস্তি দিতেই হবে।"

স্বামীজী নীরবে নির্বিকারভাবে সব শুনিয়া গেলেন, তারপর মুচকি হাসিয়া হাতটি নিমজ্জিত করিলেন গঙ্গাগর্ভে।

একি অদ্ভুত ব্যাপার! সকলে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে দেখিলেন, জল হইতে তাঁহার হাতে উঠিয়া আসিয়াছে দুইটি উজ্জ্বল তরবারি। গঙ্গায় যেটি ফেলিয়াছেন ঠিক উহারই অনুরূপ!

যোগীবর রাজাকে কহিলেন, "এবার তোমার নিজস্ব তরবারিটি চিনে নাও! অবশ্য যদি চেনবার ক্ষমতা থাকে।"

রাজা তো একেবারে হতবুদ্ধি। কোন্‌টি নিবেন? দুইটিই যে হুবহু এক রকমের!

স্বামীজী তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "মূর্খ! তুমি নিজের জিনিস বলে যে বস্তু দাবি করছো, তা নিজেই চিনে নিতে পারলে না? আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার ভেতরটা পূর্ণ রয়েছে শুধু মোহ, দম্ভ আর অজ্ঞানে। জেনে রেখো, ইহকাল পরকালে যা মানুষের নিত্যসঙ্গী, তাই শুধু তার নিজস্ব বস্তু। মৃত্যুর পর এ তলোয়ার নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যাবে না। যা সঙ্গে যাবার নয়, যা এপারে ফেলে যেতে হবে, তা তোমার জিনিস কি করে হ'ল বলতে পারো? যে বস্তু নিজের নয়, তার জন্যে কি এত দম্ভ, এত ক্রোধ করা সাজে?"

এবার ভীত বিস্মিত মহারাজের সম্মুখে তাঁহার নিজস্ব তরবারিটি ফেলিয়া রাখিয়া অপরটি স্বামীজী নিক্ষেপ করিলেন গঙ্গাগর্ভে।

আপন মূঢ়তা মহারাজা ইতিমধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। এবার স্বামীজীর চরণতলে পড়িয়া কাতরকণ্ঠে ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন।

ক্ষণপরেই ক্ষমা মিলিল। এবার স্বেচ্ছাবিহারী যোগী ধীরে ধীরে গা ভাসাইয়া দিলেন গঙ্গাস্রোতে।

অসিঘাটের সম্মুখ দিয়া তৈলঙ্গস্বামী সেদিন পথ চলিতেছেন। হঠাৎ চোখে পড়িল এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য! মৃত পতিকে জড়াইয়া ধরিয়া এক সদ্য-বিধবা উন্মাদিনীর মতো চিৎকার করিতেছে।

পূর্বরাত্রে স্বামীটি সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সর্পদষ্ট মানুষের দেহ দাহ করা হয় না, প্রচলিত প্রথামতো জলে ভাসানো হয়। মৃতের আত্মজনেরা তাই উহা গঙ্গায় ফেলিতে আসিয়াছে।

কিন্তু তরুণীর অবস্থা দেখিয়া কাহারও মুখে কথা সরিতেছে না।

স্বামীজী এ সময়ে সেখান দিয়া কোথায় চলিয়াছেন। আত্মভোলা তপস্বীর মনের দুয়ার এক মুহূর্তে হঠাৎ উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং পতি-বিয়োগবিধুরা রমণীর করুণ ক্রন্দন তাঁহার মর্মতলে গিয়া বিঁধে। সঙ্গে সঙ্গে যোগেশ্বর মহাপুরুষের হৃদয় গলিয়া যায়, ঐশী কৃপার ধারা নামিয়া আসে মর্ত্যের ধূলিতে। পরম দয়াল স্বামীজী নদীতীর হইতে খানিকটা গঙ্গামৃত্তিকা নিয়া মৃতের ক্ষতস্থানে লেপন করেন, তারপর পরমানন্দে ঝাঁপ দিয়া পড়েন গঙ্গামাঈর বক্ষে।

অল্পকাল পরেই মৃত ব্যক্তিটি ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করে, দেহে চেতনা আবার ফিরিয়া আসে। নিজের এ বন্ধনদশা দেখিয়া সে তো অবাক! ইতিমধ্যে ঘাটে এক বিরাট জনসমাগম হইয়াছে। এতক্ষণ সবাই উৎসুক নয়নে স্বামীজীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল, এবার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হইতে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে হৈ-চৈ ও আনন্দ কলরব পড়িয়া গেল।

দুই-চারজন ইংরেজ রাজকার্য উপলক্ষে বারাণসীতে বাস করেন। মাঝে মাঝে কৌতূহলী দর্শক ও ভ্রমণকারী হিসাবেও সাহেব-মেমদের এখানে দেখা যায়। যোগীবর তৈলঙ্গ মহারাজ প্রায়ই থাকেন আপন খেয়াল-খুশিতে, নগ্ন অবস্থায় যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ান। ইউরোপীয়দের

চোখে কিন্তু এ দৃশ্য বড়ই দৃষ্টিকটু লাগে। বিশেষত মেমসাহেবেরা এই উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বড় অস্বস্তি বোধ করেন। কাশীর তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এসব কথা গেল। সন্ন্যাসীর এই রুচিবিগর্হিত আচরণের প্রতিবিধান করিতে তিনি উদ্যোগী হইলেন।

স্বামীজী সেদিন উলঙ্গ অবস্থায় গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আছেন। হঠাৎ একটি পুলিশ অফিসার সেখানে আসিয়া উপস্থিত। স্বামীজীকে তখনি সে আদেশ দিল তাহার সঙ্গে থানায় যাইতে। ধ্যানাবিষ্ট মহাপুরুষের কানে তাঁহার একটি কথাও পৌঁছিল না। অফিসারটি তো মহা খাপ্পা। বেয়াড়া লোকদের কি করিয়া কথা বলাইতে হয়, সে উপায় তাহার ভালই জানা আছে। স্বামীজীকে সে প্রহার করা শুরু করিবে, এমন সময়ে ভক্তেরা আসিয়া বাধা দিলেন।

অতঃপর অফিসারটি থানায় ছুটিয়া গিয়া আরও লোকজন নিয়া আসে। এবং মৌনী স্বামীজীকে একটি দোলায় উঠাইয়া নিয়া সরাসরি হাজির করে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে।

সাহেব কড়া মেজাজের লোক। রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "সাধু, তুমি অসভ্যের মতো উলঙ্গ থাকো কেন, এভাবে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও-ইবা কেন?

একটি শব্দও স্বামীজীর কানে প্রবেশ করিল না। কথায় বা ইঙ্গিতে কোনো উত্তরও তিনি দিলেন না।

ম্যাজিস্ট্রেট ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, আদেশ দিলেন, "এখনই একে হাতকড়া পরিয়ে হাজতে নিয়ে যাও।"

মুহূর্তমধ্যে সেখানে ঘটিয়া গেল এক অলৌকিক কাণ্ড। প্রহরী-বেষ্টিত কামরা হইতে, ম্যাজিস্ট্রেট ও সমবেত লোকজনের দৃষ্টি এড়াইয়া সন্ন্যাসী কোথায় হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অথচ সাহেবের কাছেই তো তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন।

এজলাস কক্ষের ভিতরে বাহিরে অনেক খুঁজিয়াও কেহ বন্দীর সন্ধান পাইল না। পুলিস কর্মচারীরা যখন একেবারে গলদঘর্ম হইয়া উঠিয়াছেন, তখন হঠাৎ দেখা গেল, স্বামীজী তাঁহার পূর্ব স্থানটিতেই

নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার চোখে মুখে বালসুলভ কৌতুকের হাসি।

ব্যাপার দেখিয়া ম্যাজিস্ট্রেট হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন। এতক্ষণে তাহার ধারণা হইয়াছে, এই সন্ন্যাসী সাধারণ মনুষ্য নহেন।

ইতিমধ্যে স্বামীজীর কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত এক উকীল সঙ্গে নিয়া আদালতে আসিয়া উপস্থিত। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁহারা বুঝাইলেন, ইনি একজন বিখ্যাত সাধু—সমস্ত জাগতিক লোভ-মোহ দ্বন্দ্ব-সংকোচের অতীত। চন্দন এবং বিষ্ঠায় এই নির্বিকার পুরুষের সমজ্ঞান। তাই বস্ত্র পরিধানের আবশ্যকতা ইনি কিছুমাত্র বোধ করেন না। একজন বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও একথা সমর্থন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, "উত্তম কথা। কিন্তু যদি এ লোকটির সর্ব বস্তুতে সমজ্ঞানই হয়ে থাকে, তবে তাকে আমার খানা খেতে হবে, আর এখানে দাঁড়িয়েই তা খাওয়া চাই।"

নিষিদ্ধ আমিষযুক্ত খানা এই সন্ন্যাসী কি করিয়া গ্রহণ করে তাহাই তিনি দেখিতে চান।

স্বামীজীকে প্রশ্ন করা হইল, সাহেবের খানা খাইতে তাঁহার কোনো আপত্তি আছে কিনা? এতক্ষণে মৌনী মহাপুরুষের বাক্‌স্ফূর্তি হইল। প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "সাহেব, তুমকো খানা ম্যায় খা সক্‌তা, লেকিন ইস্‌কে পহ্‌লে মেরে খানা তুমকো খানে হোগা।" অর্থাৎ সাহেব, তোমার খানা আমি নিশ্চয়ই খাবো, কিন্তু তার আগে আমার খাদ্য তোমায় গ্রহণ করতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট তখনি স্বীকৃত হইলেন। ভাবিলেন, এ আর এমন কি শক্ত কথা? হিন্দু সন্ন্যাসীরা তো প্রধানত ফলমূলই খাইয়া থাকে। তাহা খাইতে আর বাধা কোথায়? কিন্তু সন্ন্যাসীকে তো নিষিদ্ধ মাংস ভোজনে বাধ্য করা যাইবে।

এজলাস-ভরা জনতার সম্মুখে স্বামীজী এবার এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলেন। তখনি আপন হস্তের উপর কিছুটা মলত্যাগ করিয়া

সাহেবের দিকে উহা প্রসারিত করিয়া দিলেন। কহিলেন, "সাহেব, এই হচ্ছে আমার আজকের খানা।"

চন্দন ও বিষ্ঠায় ব্রহ্মবিদ্ মহাযোগীর সমজ্ঞান। এই অদ্ভুত বস্তু সর্বসমক্ষে নির্বিকারভাবে তিনি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন।

অসামান্য যোগবিভূতির প্রভাবে এই ঘৃণ্য বস্তু তখন রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে এক সুস্বাদু খাদ্যে। শুধু তাহাই নয়, সারা আদালত কক্ষ ভরিয়া উঠিয়াছে ইহার সৌগন্ধে।

এ সন্ন্যাসীর যোগশক্তি যে অপরিমেয় এবং ইহার ক্রিয়াকলাপ যে মোটেই সাধারণ মানুষের মতো নয়, সাহেব ইতিমধ্যে এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়াছেন। অবিলম্বে তিনি আদেশ প্রচার করিলেন, "তৈলঙ্গ স্বামীজী উলঙ্গ অবস্থায় স্বেচ্ছামতো এ শহরে বিচরণ করতে পারবেন, এতে কখনো কোনোরূপ বাধা দেওয়া হবে না।"

এই ম্যাজিস্ট্রেট কাশী হইতে বদলী হন। ইহার পর যে সাহেব কার্যভার নিয়া আসেন তিনি অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক। স্বামীজী সেদিন তাঁহার চিরাচরিত অভ্যাসমতো উলঙ্গ হইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে ঘুরিতেছেন। নূতন ম্যাজিস্ট্রেট তো ইহা দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা!

সন্ন্যাসীকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া আনিয়া হাজতে তালাবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। ভক্তজন ও বিশিষ্ট নাগরিকদের কোনো যুক্তি বা প্রার্থনায় জেলাশাসক কর্ণপাত করিলেন না।

পরদিন ভোরবেলায় সাহেব হাজতগৃহে তাঁহার নূতন কয়েদীটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে গিয়াছেন। সেখানে পৌঁছিয়াই তো তিনি অবাক। একি! সন্ন্যাসী যে পরম নিশ্চিন্তমনে হাজতের বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কি করিয়া যে সে কারাকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

ক্রুদ্ধ ম্যাজিস্ট্রেট তখনি হাজতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও রক্ষীদের ডাকাইলেন। তৈলঙ্গস্বামীকে যে কক্ষে রাখা হইয়াছিল তাহার দ্বার তখনও পূর্ববৎ রহিয়াছে তালাবদ্ধ। অনুচরদের সঙ্গে নিয়া সাহেব

লৌহদ্বার, তালা, চাবি ও কক্ষের দেয়ালগুলি বার বার তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু কয়েদীর কারাকক্ষের বাহিরে আসার কোনো সূত্রই আবিষ্কার করা গেল না।

গম্ভীরস্বরে তৈলঙ্গস্বামীকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "সাধু, সত্য কথা বল, কি ক'রে তুমি হাজতের বাইরে এলে?"

স্বামীজীর উত্তর অতি সহজ ও সরল। কহিলেন, "প্রত্যূষে আমার বাইরে আসবার ইচ্ছে হয়েছিল। সে ইচ্ছা হবার পরমুহূর্তেই বাইরে এসে পড়লাম, কোনো বাধা কোথাও পেলাম না।"

কারাকক্ষটি জলে জলময় হইয়া রহিয়াছে। সেদিকে তৈলঙ্গস্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে অবলীলায় উত্তর দিলেন, "রাতে আমার প্রস্রাবের বেগ হইয়াছিল, দেখলাম দ্বার তালা বন্ধ। ঘরের বাইরে যেতে তখন ইচ্ছে হয় নি, তাই শায়িত অবস্থায়ই খানিকটা মূত্রত্যাগ করেছি। তারপর রাত শেষ হয়ে এলে, অন্ধকার ঘরটা তেমন আমার ভাল লাগছিল না, তাই মুক্ত হাওয়ায় এ বারান্দায় একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

ম্যাজিস্ট্রেটের ক্রোধ আরও তীব্র হইয়া উঠিল। বন্দীকে আবার হাজতকক্ষে পুরিয়া স্বহস্তে ডবল তালা লাগাইয়া তিনি এজলাসে চলিয়া গেলেন।

খানিক পরেই আবার একি অদ্ভুত কাণ্ড উলঙ্গ সন্ন্যাসীর! দেখিলেন কারাগৃহ তো দূরের কথা, এবার তাহার আদালত কক্ষেরই এক কোণে বন্দী দাঁড়াইয়া আছে। চোখে-মুখে দুষ্টু বালকের কৌতুক-চপল মৃদু হাসি। নিতান্ত অবিশ্বাস্য এ দৃশ্য। ম্যাজিস্ট্রেট একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছেন।

যোগীবর তৈলঙ্গস্বামী এবার ধীর পদক্ষেপে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "সাহেব, তুমি অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো শুধু জড় ও জড়ের শক্তিই বোঝ। এই জগতের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে এক মহাচৈতন্যলোক,—তার খবর তোমার মোটেই জানা নেই। সেই চৈতন্যলোকের সঙ্গে যার

যোগাযোগ সাধিত হয়েছে, কোনো বন্ধন বা কোনো বাধাই আর তার স্বেচ্ছাবিহারকে আটকাতে পারে না। ভারতের যোগীপুরুষদের শক্তির কাছে পৃথিবীর কোনো কার্যই কখনো অসাধ্য বলে গণ্য হয় না। বেটা, তাহলে বল দেখি, আমার মতো সাধু-সন্ন্যাসীকে বিরক্ত ক'রে লাভ কি? তাছাড়া, সে শক্তিই-বা তোমার আছে কই?"

এবার সাহেবের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি নির্দেশ দিলেন, তৈলঙ্গস্বামী এখন হইতে স্বেচ্ছামতো কাশী শহরে ঘুরিয়া বেড়াইবেন। শুধু তাহাই নয়, ভবিষ্যতে কেহ যেন এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর উপর কোনো উপদ্রব না করে—এ মর্মেও এক বিশেষ আদেশ তিনি এই সময়ে জারী করিলেন।

শেষের দিকে তৈলঙ্গ মহারাজ পঞ্চগঙ্গার ঘাটে বসিয়াই দিন অতিবাহিত করিতেন। নিকটেই ছিল মঙ্গলভট্ট নামক মারাঠী ভক্ত ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র আবাস। প্রায় সাত বৎসর সাধ্য-সাধনার পরে ভট্টজী এই গৃহে মহাযোগীকে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

স্বামীজীর এবার একটা বাসস্থান ও ঠিকনা হইল, সত্য—কিন্তু স্বেচ্ছাবিহারী শক্তিধর মহাপুরুষকে এক স্থানে নিশ্চিন্ত হইয়া পাইবার জো কোথায়? মনের আনন্দে কখনো দশাশ্বমেধ ঘাটে, কখনো বা মণিকর্ণিকার শ্মশানে তিনি বেড়াইয়া বেড়ান। কখনও দেখা যায়, তিনি জাহ্নবীর খরস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া আনন্দে বিচরণ করিতেছেন।

ইতিপূর্বে প্রায়ই মৌনী থাকিলেও তৈলঙ্গ মহারাজ কথাবার্তা একেবারে কখনো বন্ধ করেন নাই। মঙ্গলভট্টের গৃহে আসিবার পর হইতে তাঁহার চারিদিকে জনসমাগম আরও বাড়িতে থাকে। ব্যাধি-ক্লিষ্ট আর্ত জনগণ এবং অধ্যাত্মনির্দেশপ্রার্থী সাধকদের আনা-গোনায় তিনি বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাই আত্মরক্ষার জন্য এখন হইতে প্রায়ই তাঁহাকে মৌনী থাকিতে হয়। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে এ সময়ে তিনি কথাবার্তা বলিতেন না।

গঙ্গাজলে বিহার ও ইতস্তত ভ্রমণের পর স্বামীজী মঙ্গলভট্টের আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন। এ সময়ে দর্শনার্থী ও শিষ্যদের সঙ্গে

তিনি কথাবার্তা চালাইতেন ইঙ্গিতের মাধ্যমে। এ কাজে একান্ত সেবক মঙ্গলভট্টজী ছিলেন তাঁহার প্রধান সহায়ক। কুটির প্রাঙ্গণে, মুক্ত উদার আকাশের তলে, উচ্চ একটি পাথরের বেদীতে স্বামীজী মহারাজ শয়ন করিয়া থাকিতেন, আর উহার নিচেকার দেয়ালে লিখিত থাকিত শাস্ত্রগ্রন্থের বহুতর শ্লোক ও উপদেশ। সত্যকার ভক্ত সাধক বা মুমুক্ষু কেহ আসিলে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী শুধু অঙ্গুলি সংকেত করিতেন। আর মঙ্গলভট্টকে ঐ সকল শ্লোকের মর্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া জিজ্ঞাসু আগন্তুকদের নানা কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে হইত।

স্বামীজী মহারাজের আবাসের এক প্রান্তে ছিল প্রস্তর নির্মিত বিশাল শিবলিঙ্গ, আর উহার এক পার্শ্বে নৃমুণ্ডমালিনী মহাকালীর পাষাণ প্রতিমা শক্তিধর মহাসাধকের অধ্যাত্মজীবনের দুই মুখ্য প্রতীক। শিব শক্তির এই যুগ্ম আরাধনার পথে, যোগ ও তন্ত্র-সাধনার সমাহারের মধ্য দিয়াই, মহাযোগী তৈলঙ্গস্বামীর বিরাট অধ্যাত্মসত্তা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুর সঙ্গে কাশীতে তীর্থ করিতে আসিয়াছেন। বিশ্বনাথ দর্শনের পরই ঠাকুর 'সচল শিব' তৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন করিতে চলিলেন।

এই দর্শন সম্পর্কে উত্তরকালে ঠাকুর তাহার ভক্ত ও পার্ষদদের বলিয়াছিলেন, "দেখলাম, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁর শরীরটা আশ্রয় ক'রে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন। উঁচু জ্ঞানের অবস্থা। শরীরের কোনো হুঁশই নেই। রোদে বালি এমনি তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য? তিনি সেই বালির ওপরেই শুয়ে আছেন!"

স্বামীজী তখন মণিকর্ণিকা ঘাটেই বেশীর ভাগ সময় কাটান। ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে নিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু শ্মশানচারী 'সচল শিবে'র সামাজিক বুদ্ধি বোধহয় তখনো একেবারে লোপ পায় নাই। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে

দণ্ডায়মান দক্ষিণেশ্বরের মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ, আসন্ন এক অধ্যাত্ম-লীলার যিনি চিহ্নিত নায়ক। তৈলঙ্গ মহারাজ সেদিন পরম প্রসন্ন। স্মিতহাস্যে ঠাকুরের সম্মুখে একটি নস্যদানী তুলিয়া ধরিলেন।

প্রবীণ ব্রহ্মবিদ্ স্বীকৃতি দিলেন নবীন ব্রহ্মবিদ্‌কে।

শ্রীরামকৃষ্ণও প্রথম দর্শনের দিনেই খুঁটিয়া খুঁটিয়া স্বামীজীর দেহের যোগীচিহ্ন সকল দেখিয়া নিলেন। তারপর ঘরে ফেরার পথে হৃদয়ের কাছে সোৎসাহে কহিলেন, "ওরে, বুঝলি, এঁতে যথার্থ পরমহংসের লক্ষণ সব বর্তমান। ইনি যে সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর!"

একাদিক্রমে কয়েকদিনই ঠাকুর রামকৃষ্ণ শ্রদ্ধাভরে তৈলঙ্গস্বামীজীর সমীপে গমন করেন। দুই বিরাট মহাপুরুষের অন্তর্লোকে সেদিন যে দেওয়া-নেওয়ার পালা চলিয়াছিল, তাহার সন্ধান অবশ্য কাহারো জানা নাই, জানিবার কথাও নয়।

সহজ সমাধিতে সদা নিমজ্জিত, মৈনাক-সদৃশ, এই মহাযোগীর সহিত ইঙ্গিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন কিছু তত্ত্বপ্রসঙ্গও আলোচনা করেন; এসম্পর্কে উত্তরকালে বলিয়াছেন, "তখন তিনি কথা কন না, মৌনী। ইশারায় তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—ঈশ্বর এক, না অনেক? তাতে ইশারা ক'রেই বুঝিয়ে দিলেন—সমাধিস্থ হয়ে দেখ তো—এক; নইলে যতক্ষণ আমি, তুমি, জীব, জগৎ ইত্যাদি নানা জ্ঞান রয়েছে ততক্ষণ—অনেক।"

একদিন পরমহংসদেবের মনে অভিলাষ জাগে, স্বামীজীকে তিনি ক্ষীর ভোজন করাইবেন। মথুরবাবুকে বলিয়া তাঁহার জন্য আধ মণ ক্ষীর প্রস্তুত করানো হইল। সহস্তে যোগীবরকে ইহার সবটা খাওয়াইয়া ঠাকুর লাভ করিলেন পরম তৃপ্তি।

তৈলঙ্গস্বামীজী দীর্ঘকাল অজগর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেন। নিজের আহার সম্পর্কে বরাবরই তিনি ছিলেন একেবারে নির্বিকার। খাদ্যবস্তু সংগ্রহের কোনো চেষ্টা যেমন তাঁহার ছিল না, তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজনও তেমনি তিনি বোধ করেন নাই। নিজ হস্তে কখনো তাঁহাকে কোনো আহার্য গ্রহণ

করিতে দেখা যাইত না। আবার কেহ এসব সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেই মহাযোগী অবলীলায় তাহা মুখবিবরে গ্রহণ করিতেন।

খাদ্যাখাদ্যে তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই, তাই একবার একদল দুষ্ট লোক তাঁহাকে জব্দ করিতে আসে। এক বালতি চুনগোলা জল সম্মুখে ধরিয়া স্বামীজীকে তাঁহারা উহা পান করাইতে শুরু করে। ইহাদের কু-অভিসন্ধি বুঝিতে স্বামীজীর মোটেই দেরি হয় নাই। কিন্তু দ্বন্দ্বাতীত লোকে যাঁহার সদা বিচরণ, এদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর তাঁহার কই? সমস্তটা চুন-গোলাই তিনি নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন, প্রশান্ত মুখমণ্ডলে বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

পরম গম্ভীর যোগীর এই নির্বিকার ভাব দেখিয়া, কি জানি কেন দুষ্টদের মনে বড় অনুতাপ শুরু হয়, পদতলে পড়িয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে থাকে। এবার তৈলঙ্গ মহারাজের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে। তখনি অবলীলায় তিনি সকলের সম্মুখে মূত্রদ্বার-পথে সমস্তটা চুন-গোলা জল নিঃসারিত করিয়া দেন।

বহু ধনবান্ শেঠ ও রাজরাজড়ারা বারাণসীতে তীর্থ করিতে আসে। ইহাদের অনেকে শ্রদ্ধাভরে স্বামীজীকে স্বর্ণালংকারে সাজাইয়া দিয়া ধন্য হয়। এই ভক্তেরা চলিয়া গেলেই দুর্বৃত্ত চোরেরা ছুটিয়া আসে—স্বামীজীর অঙ্গ হইতে ঐসব অলংকার খুলিয়া নিয়া যায়। লোষ্ট্র কাঞ্চনে সমজ্ঞান মহাযোগীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, চিত্তে নাই বিন্দুমাত্র আলোড়ন। পরম প্রশান্তি ও নির্লিপ্তি নিয়া তিনি শুধু অপরাধীদের দিকে তাকাইয়া থাকেন।

সে-বার যোগীবর তৈলঙ্গস্বামী ভিজিয়ানাগ্রাম মহারাজার প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া মহারাজা পাত্রমিত্রসহ ছুটিয়া বাহির হইলেন। সযত্নে স্বামীজীকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হইল। সকলে মিলিয়া সোৎসাহে তাঁহাকে পট্টবস্ত্রে সাজাইয়া দিলেন। কোমরে, বাহুতে ও গলায় পরানো হইল সোনার অলংকার।

স্বামীজীর কিন্তু পরিচ্ছদ ও আভরণের দিকে কোনো লক্ষ্যই নাই।

সবেমাত্র রাজবাড়ির বাহিরে কিছুটা দূর আসিয়াছেন, এমন সময় কয়েকটি দুর্বৃত্ত আগাইয়া আসে, তাঁহার শরীর হইতে এগুলি খুলিয়া নেয়। স্বামীজী কিন্তু চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছেন, তস্করদের কাজ শেষ করার সুযোগ দিতে চান। এমন সময় রাজপ্রহরীরা দূর হইতে ব্যাপারটি টের পায়, ছুটিয়া আসিয়া ইহাদের ধরিয়া ফেলে।

চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। মহারাজা দুষ্কৃতদের বাঁধিয়া আনিয়া স্বামীজীর পদতলে ফেলিলেন। কহিলেন. "বাবা, আপনি বলুন, এ দুষ্টদের কি সাজা দেবো ?"

এতকিছু উত্তেজনা ও কোলাহলের মধ্যে তৈলঙ্গ মহারাজ কিন্তু আপন মৌন মহিমা নিয়া নির্বিকার চিত্তে দাঁড়াইয়া আছেন।

মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে অঙ্গুলি সংকেতে নিজ দেহটি দেখাইয়া আকারে প্রকারে যাহা বলিতে চাহিলেন তাহা[illegible] মর্ম—'ওরা অলংকারগুলো নিয়েছে তো কার কি ক্ষতি হয়েছে ? আমি তো যেমন ছিলাম, তেমনি রয়েছি, আমার কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে ? নির্বোধগুলিকে এবারকার মতো ছেড়ে দাও।'

এক্ষেত্রে আর কি করা যায় ? সকলে নিতান্ত অনিচ্ছায় দুর্বৃত্তদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

এক সময়ে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপরও বর্ষিত হয় যোগীবরের আশীর্বাদ। গোস্বামীজীর অধ্যাত্মজীবনের রূপান্তর সাধনে এই আশীর্বাদ পরম সহায়ক হইয়া উঠে।

তৈলঙ্গ মহারাজের সহিত যখন বিজয়কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজেই রহিয়াছেন। হৃদয়ে তাঁহার মুমুক্ষার তীব্র আকুতি, তাই অস্থির হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সে-বার কাশীতে আসার পর যোগীবরের দর্শন মিলিল, অল্পদিনের মধ্যে ধন্য হইলেন তাঁহার স্নেহসান্নিধ্য ও কৃপালাভে।

গোস্বামীজী নিজে এ সাক্ষাতের এক মনোরম বিবরণ দিয়াছেন। উলঙ্গ স্বামীজী গঙ্গার স্রোতে এক ঘাট হইতে অন্য ঘাটে ভাসিয়া

বেড়াইতেছেন, আর তিনি তটপথে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতেছেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

স্থির হইয়া একস্থানে বসিলেই স্বামীজী গোঁসাইজীর আহারের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেন। ভক্তেরা তাঁহার আদেশে মিষ্ট দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিত, আর তিনিও সস্নেহ ভঙ্গিতে নানা-ইঙ্গিত করিয়া বিজয়কৃষ্ণকে এগুলি ভোজন করাইতেন।

উত্তরকালে বিজয়কৃষ্ণ সোল্লাসে যোগীবরের পুণ্যস্মৃতি আলোচনা করিতেন। এই স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়া তৈলঙ্গ মহারাজের এই সময়কার এক চিত্তাকর্ষক চিত্র ফুটিয়া উঠে :

"কোনো সময়ে হয়তো স্বামীজী গঙ্গায় ডুবিয়া ভোঁস করিয়া ডুব দিতেন ও মণিকাণকার ঘাটে গিয়া উঠিতেন। আমি তখন গঙ্গার পাড় দিয়া দৌড়াইয়া যাইতাম।···

"একদিন এক কালীমন্দিরে গিয়া স্বামীজী প্রস্রাব করিয়া তাহা ছিটাইয়া কালীর অঙ্গে দিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'একি ব্যাপার! বিগ্রহের গায়ে প্রস্রাব দেন কেন?" তিনি মাটিতে লিখিয়া দিলেন, 'গঙ্গোদকং'।

"আমি বললাম, 'কালীর গায়ে ইহা ছিটাইয়া দিলেন কেন?' তিনি অবলীলাক্রমে উত্তরে বলিলেন, 'পূজা'।"

ঘটনাটি ঘটিবার সময় ঐ দেবালয় জনশূন্য ছিল। কিছুকাল পরে মন্দিরের লোকজন ফিরিয়া আসিলে গোস্বামী প্রভু তাঁহাদের নিকট তৈলঙ্গস্বামীজীর এই অদ্ভুত আচরণের কথা বলিলেন। মন্দিরের পূজারী ও অন্যান্য লোক তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া উঠিলেন, "ইনি তো সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর! এঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে নেই। এঁর প্রস্রাব যে গঙ্গোদক, তা ঠিকই।"

স্বামীজীর প্রতি কাশীর অধিবাসীদের এই প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন তৈলঙ্গ মহারাজ গোঁসাইজীকে জানাইয়া দিলেন, এবার তিনি তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিবেন।

গোঁসাইজী তো একথা শুনিয়া অবাক !

ইতিমধ্যেই এই বিরাট পুরুষের সান্নিধ্য ও অন্তরঙ্গতা তাঁহাকে অনেকটা দুঃসাহসী করিয়া তুলিয়াছে। সহজ কণ্ঠে স্বামীজীকে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু আপনার কাছে আমি দীক্ষা নেবো কেন ? আপনি দেববিগ্রহের গায়ে প্রস্রাব ছিটিয়ে দিয়ে বলেন—গঙ্গোদকং। আমি অমন অনাচারী লোকের দ্বারা দীক্ষিত হব না। তাছাড়া, আমি তো ব্রাহ্ম, আমাকে আপনি কি ক'রে দীক্ষা দেবেন ?'

তৈলঙ্গ মহারাজ সহাস্যে কহিলেন, "বেটা, তোমায় দীক্ষা দেবার ব্যাপারে একটা গূঢ় কারণ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত দীক্ষা আমি দিচ্ছিনে। গুরু গ্রহণ না করলে শরীর শুদ্ধ হয় না, তাই গুরুকরণ প্রয়োজন। কিন্তু তোমার আসল গুরু আমি নই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "এরপর তিনি আমায় ত্রিবিধ মন্ত্র প্রদান ক'রে বললেন, 'অব যাও। মেরে পর ভগওয়ানকো যো হুকুম থে উহ্ ম্যায় তামিল কিয়া।' অর্থাৎ, আমার উপর ঈশ্বরের যা আদেশ ছিল তাই আমি পালন করলাম, এবার তুমি যথায় ইচ্ছা যেতে পারো।"

উত্তরকালে গোস্বামীজী সন্ন্যাস ও যোগসাধন গ্রহণ করার পর আর একবার কাশীধামে উপনীত হন। যোগীবরের সঙ্গে সে-সময় আবার তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাকে সেই পুরাতন ঘটনার ইঙ্গিত করিয়া প্রশ্ন করেন, "ক্যা, তুমকো ইয়াদ হ্যায় ?"—কি হে, আগেকার কথা কি তোমার স্মরণ আছে ?

গোস্বামীপ্রভু করজোড়ে ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, মহারাজ।"

যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ীও একবার তৈলঙ্গস্বামীর চরণোপান্তে উপনীত নন। লাহিড়ী মহাশয়কে দূর হইতে দর্শন করিয়াই স্বামীজী পরম স্নেহে তাঁহাকে জানান তাঁহার সংবর্ধনা।

কয়েকটি বিশিষ্ট ভক্ত সাধক তখন সেখানে উপস্থিত। স্বামীজীর

এমনতর ভাবোচ্ছ্বাস তাঁহারা বড় একটা দেখেন নাই। তাই অনেকেই সবিস্ময়ে এ সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন।

উত্তরে স্বামীজী ভক্তদের বলিলেন, "যোগমার্গের যে উচ্চাবস্থায় পৌঁছে সাধকদের লেঙটি পর্যন্ত ছাড়তে হয়, ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত এ মহাপুরুষ অনেক আগেই সে অবস্থা লাভ করেছেন।"

তৈলঙ্গ স্বামীজীর সেদিনকার এই সস্নেহ আচরণ ও স্বীকৃতি কাশীর সাধকসমাজে অতি সহজে এই নবাগত প্রচ্ছন্ন যোগীকে পরিচিত করিয়া তোলে।

পঞ্চগঙ্গা ঘাটের কাছে নানা স্থানে ও মঙ্গলভট্টের আবাসে স্বামীজী প্রায় আশি বৎসরকাল বাস করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কখনো কোনো মঠ আশ্রম বা মণ্ডলী স্থাপনের ইচ্ছা এই শক্তিধর মহাপুরুষের অন্তরে স্থান লাভ করে নাই।

সচ্চিদানন্দ সাগরের উদার বক্ষে স্বেচ্ছাবিহারী মীনের মতো ছিলেন এই মহাযোগী। ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধ্যাত্মলীলাটি উদ্‌যাপন করিয়াছেন তিনি একান্ত নিঃসঙ্গতায়, লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া চিহ্নিত সাধকদের জীবনে বহাইয়া দিয়াছেন ব্রহ্মজ্ঞানের অমৃতপ্রবাহ।

লোকোত্তর মহাপুরুষের মরলীলা এবার ধীরে ধীরে শেষ অঙ্কে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। হঠাৎ একদিন গঙ্গাবিহার হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজেই আসন্ন তিরোধানের সংবাদটি প্রকাশ করিলেন।

মঙ্গলভট্টের পৌত্র গোবিন্দভট্ট আমাদিগকে তৈলঙ্গ স্বামীজীর সেদিনকার কথোপকথনের এক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়াছেন—

ভট্টজী এবং আরো কয়টি বিশিষ্ট ভক্ত সেদিন সেখানে উপস্থিত। হাতছানি দিয়া স্বামীজী তাঁহাদের কাছে ডাকিলেন। স্মিতহাস্যে কহিলেন, "বেটা সব, এবার তোরা আমায় বিদায় দে। আমি স্থির করেছি, আজই সমাধিযোগে এ দেহ ত্যাগ করবো।"

এ সংবাদ যেমনি মর্মান্তিক তেমনি অপ্রত্যাশিত। ভক্তদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। করুণ কণ্ঠে তাঁহারা কহিলেন "সে কি বাবা! হঠাৎ

আপনি একি অলক্ষুনে কথা বলছেন? আপনি চলে গেলে আমরা বাঁচবো কি নিয়ে।"

"আরে আমি কি তোদের একেবারে ছেড়ে যাচ্ছি? দেহের এই খোলস্‌টা বড় পুরোনো, বড় জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর না বদলালে চলে না। তাই এটিকে এবার ছেড়ে দেবো।"

মঙ্গলভট্ট আবদারের সুরে কহিলেন, "না বাবা সে হয় না। আগে থেকে বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ এমনি একদিন চলে গেলেই হলো? তবে এটাও বুঝতে পারছি, সিদ্ধান্ত যখন আপনি স্থির ক'রেই ফেলেছেন তখন এটা আর ফেরানো যাবে না। কিন্তু আমাদের একটু সময় তো দেবেন। মনটাকে তো প্রস্তুত ক'রে নিতে হবে। তা ছাড়া আপনার একটা পাথরের মূর্তি গড়িয়ে রাখব বলে ভাবছি।"

"হ্যাঁরে ভট্ট, এই রক্ত মাংসের দেহ, এই পাথরের মূর্তি, এসব নশ্বর জিনিসের কি কোনো মূল্য আছে? এতদিন আমার সঙ্গ ক'রে এসে আজ তোদের এ সব কি কথা?"

"বাবা, আমরা বদ্ধজীব, আপনাকে বুঝতে পারলুম কই? কিন্তু বাবা, আপনি যাই বলুন, আমরা একান্তভাবে চাই—একটা পাথরের মূর্তি অন্তত আপনার এই সাধনক্ষেত্রে থাক। আপনার তিরোধানের পর রোজ আমরা বিগ্রহের শিরে ঢালতে পারবো গঙ্গাবারি, দিতে পারবো ভক্তির অর্ঘ্য—পুষ্পাঞ্জলি।"

করুণাময় মহাযোগীর আননে ফুটিয়া উঠিল প্রসন্ন মধুর হাসি। কহিলেন, "আচ্ছা বেশ। বেটা, তাহলে আমার যাবার দিন একমাস পিছিয়েই দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি তোরা মূর্তি তৈরির যোগাড় কর্।"

চঞ্চল বালক যেমন স্বেচ্ছামতো তাহার খেলনাটি নিয়া খেলিয়া বেড়ায়, আবার ছুঁড়িয়া ফেলে, তেমনি তৈলঙ্গ মহারাজও অবলীলায় দূরে ঠেলিয়া দিলেন তাঁহার মৃত্যুর নির্দিষ্ট লগ্নটিকে।

হাতে সময় বেশী নাই। ভক্তেরা তোড়জোড় শুরু করিয়া দিলেন।

সেই দিনই স্থানীয় এক ভাস্করকে ডাকিয়া আনা হইল, মাসখানেকের মধ্যে গড়িয়া উঠিল স্বামীজীর এক বৃহৎ প্রস্তরমূর্তি।[১]

মহাপ্রয়াণের পূর্বদিন ভক্তদের প্রার্থনায় কিছু কিছু সাধন-উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী একটি সুবৃহৎ চন্দন কাঠের সিন্দুক প্রস্তুত করানো হইল। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর তাঁহার মরদেহ এটিতে পুরিয়া সমাহিত করিতে হইবে গঙ্গাগর্ভে।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পৌষ মাস। শুক্লা একাদশীর পুণ্যতিথিটি তৈলঙ্গ মহারাজ শেষ যাত্রার জন্য বাছিয়া নিলেন। ঐ তিথিতেই ব্রহ্মরন্ধ্র পথে উপক্রম ঘটিল মহাযোগীর অমরাত্মার।

কাষ্ঠসম্পুটস্থিত মরদেহখানি গঙ্গার ঘাটে নৌকায় তোলা হয়। ইতিমধ্যে তৈলঙ্গ স্বামীজীর তিরোধানের সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হয়। সর্বজনবন্দিত মহাপুরুষের গঙ্গাসমাধির অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করিতে গঙ্গাতট সেদিন লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠে।

অসি হইতে বরুণা অবধি স্বামীজীর পূত দেহবাহী কাষ্ঠাধারটিকে ভ্রমণ করানো হয়, তারপর দেওয়া হয় গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন।

শিবধাম বারাণসীতে শিবকল্প মহাযোগী প্রায় দেড়শত বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার অপরূপ লীলানাট্য অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। শত সহস্র লোকের নয়নসমক্ষে এ নাট্যের দৃশ্যপট একের পর এক হইয়াছে উন্মোচিত। সেদিনকার সায়ংসন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে সেই লীলা সংবরণের পালাটিই সকলে সাশ্রুনয়নে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিল।

১ কাশীধামের তৈলঙ্গস্বামী মঠের পরিচালক গোবিন্দভট্টজী আজো পরম শ্রদ্ধাভরে এই প্রস্তর বিগ্রহটি এবং তৈলঙ্গ স্বামীজীর ব্যবহৃত জলপাত্র, পাদুকা ইত্যাদি দর্শনার্থীদের প্রদর্শন করিয়া থাকেন। খেয়ালী স্বামীজী একদিন গঙ্গাতীর হইতে স্বহস্তে এমন একটি বিরাট প্রস্তরময় শিবলিঙ্গ অনায়াসে তুলিয়া আনেন তাহা বহন করা দশবারোজন বলিষ্ঠ পুরুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। এই শিবলিঙ্গটিও স্বামীজীর লীলার এক স্মারকচিহ্নরূপে বর্তমান রহিয়াছে।

যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ী

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। হিমালয়ের রানীক্ষেত অঞ্চলে এক সেনা-নিবাস নির্মাণের আয়োজন চলিতেছে। সামরিক পূর্তবিভাগের এক তরুণ বাঙালী কর্মচারী দানাপুর হইতে সেদিন এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছেন। প্রাথমিক কাজকর্ম সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। সামান্য যাহা কিছু কাজ হাতে থাকে তাঁবুতে বসিয়া প্রাতেই তিনি তাহা শেষ করিয়া ফেলেন। তারপর সারাদিন ব্যাপিয়া অখণ্ড অবসর। এ সময় প্রায়ই পিয়ন ও পাহাড়ী কুলিদের নিয়া নানা গল্পগুজবে তাঁহার সময় কাটিয়া যায়।

সম্মুখে নাগাধিরাজ হিমালয়। কন্দরে কন্দরে ইহার কত যোগী, কত সিদ্ধ সাধু-সন্ন্যাসী তপস্যায় রত। জন্মজন্মান্তরের পুণ্যফলে কোনো কোনো ভাগ্যবানের জীবনে ঘটে তাঁহাদের আবির্ভাব, প্রকাশিত হয় দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রকৃত স্বরূপ।

পূর্তবিভাগের এই কর্মচারীটি স্থানীয় লোকদের মুখে নানা অলৌকিক কাহিনী, নানা জনশ্রুতি শুনিয়াছেন। আরও জানিয়াছেন অদূরস্থ দ্রোণগিরি শিবকল্প তাপসদের এক বিচরণভূমি। এখানে তাঁহাদের নানা কৃপালীলা নাকি অনুষ্ঠিত হয়।

সেদিন তাঁহার অন্তরে কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। পাহাড়টিকে ভাল করিয়া একবার দেখিয়া আসা মন্দ কি? বিকাল বেলায়ই এ উদ্দেশ্যে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

রানীক্ষেত হইতে দ্রোণগিরি প্রায় পনের মাইল পথ। চারিদিকে দেবদারু ও চীরগাছের ঘন বন। অদূরে দুর্গম পাহাড়ের সারি পর পর উঁচু হইয়া উঠিয়া গিয়াছে ঊর্ধ্বে নীলাকাশের মহাশূন্যে।

পাকদণ্ডির আঁকাবাঁকা বনপথ দিয়া চলিতে চলিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সম্মুখেই চোখে পড়ে নন্দাদেবীর গিরি-চূড়ায়

অস্তরাগের অপরূপ সমারোহ। দূরে দিক্‌চক্রবালে চিরতুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গের তরঙ্গমালায় ছড়াইয়া পড়ে তাহার বর্ণচ্ছটা। দেবাদিদেব ধূর্জটির তাম্রাভ জটাজালে যেন দিগন্ত ঢাকিয়া গিয়াছে!

আত্মবিস্মৃত তরুণ এ মহিমময় দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আছেন।

অকস্মাৎ নির্জন দ্রোণগিরি কম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল—"শ্যামাচরণ! শ্যামাচরণ লাহিড়ী!"

একি! কে এই জনমানবহীন পার্বত্য অঞ্চলে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে? সরকারী টেলিগ্রাম পাইয়া শ্যামাচরণ হঠাৎ দানাপুর হইতে পাঁচশত মাইল দূরে এই রানীক্ষেতে চলিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই অঞ্চলের কোনো লোকই তো তাঁহার পরিচিত নয়! অন্তরে কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হইল, আবার কৌতূহলও জাগিল।

কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গেলেন। দেখিলেন, অদূরে পর্বত গুহার দ্বারে তেজঃপুঞ্জকলেবর, জটাজূটসমন্বিত এক যোগী সন্ন্যাসী একাকী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি যেন শ্যামাচরণের জন্যই অপেক্ষমাণ।

আয়ত নয়ন দুইটিতে দিব্য আনন্দের দ্যুতি। যোগীবর নিকটে আসিয়া প্রসন্নমধুর কণ্ঠে কহিলেন, "শ্যামাচরণ, অব্ তুম আগয়া! ব্যয়ঠ্ যাও, বিশ্রাম কর্ লো। ম্যাঁয়হী তুমহে পুকার রাহা থা!" অর্থাৎ—শ্যামাচরণ, তুমি তাহলে এসে গিয়েছ! এবার বিশ্রাম করো। আমিই তোমায় এতক্ষণ ডাকছিলাম।

শঙ্কা ও সন্দেহ শ্যামাচরণের মনে ভিড় করিতেছে। তাড়াতাড়ি কোনোমতে একটি শুষ্ক প্রণাম জানাইয়া একপাশে দাঁড়াইলেন।

যোগী সাদরে আহ্বান জানাইলে কি হইবে, শ্যামাচরণের মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সহজে যাইতে চায় না। মনে মনে কেবলি ভাবিতেছেন, তাই তো, এ সাধু আমার নাম কি ক'রে জানলো? হয়তো কোনো পিয়ন বা পাহারাদারের কাছে জেনে নিয়েছে।

পরম আশ্চর্যের কথা, মনে এই চিন্তা খেলিয়া যাইবার সঙ্গে

সঙ্গেই যোগী অবলীলায় শ্যামাচরণের পিতৃপুরুষের নাম, ধাম, পরিচয়, সব কিছু একনিঃশ্বাসে বলিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নয়, ঘনিষ্ঠ লোকের মতো তাঁহার দিকে তাকাইয়া কেবলি তিনি মধুর হাসি হাসিতেছেন।

ক্ষণপরে কহিলেন, "বেটা, মন তোমার বৃথা সন্দেহে আলোড়িত হচ্ছে। জেনে রেখো, আমি তোমার নিতান্ত আপন জন—তোমারই প্রতীক্ষায় এ দুর্গম গিরিশিখরে বসে আছি। একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখ দেখি, এ পাহাড়ে আগে তুমি আর কখনো এসেছিলে কিনা।"

সস্নেহে হাতটি ধরিয়া শ্যামাচরণকে তিনি গুহার অভ্যন্তরে নিয়া গেলেন। স্বল্পালোকে দেখা গেল, এক কোণে পড়িয়া আছে একটা বাঘছাল, ধুনি, দণ্ড ও কমণ্ডলু।

রহস্যময় মহাপুরুষ শ্যামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখতো এগুলো চিনতে পারছো কিনা? এসব যে তোমারই পরিত্যক্ত জিনিস। এসব কথা কি একটুও তোমার স্মরণে আসছে না?"

বিস্ময়বিমূঢ় শ্যামাচরণ বার বার স্মৃতির দুয়ারে আঘাত করিতেছেন, কিন্তু কোনো কিছুই মনে করিতে পারিতেছেন না।

যোগীবর স্মিতহাস্যে আরো কাছে আসিলেন, হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন শ্যামাচরণের মেরুদণ্ড। এ কি ইন্দ্রজাল! শ্যামাচরণের মনোলোকের যবনিকাটি মুহূর্তমধ্যে কোথায় অপসৃত হইয়া গিয়াছে। তড়িৎসঞ্চালিত তন্ত্রীর মতো সারা দেহটি তাহার বার বার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, দেহে জাগিতেছে অলৌকিক আনন্দের শিহরণ।

পূর্বজন্মের অধ্যাত্ম-জীবনের চিত্রপট শ্যামাচরণের নয়ন সমক্ষে সহসা উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। জন্মান্তরের ব্যবধান শক্তিধর মহাযোগীর পুণ্যকরস্পর্শে এক নিমেষে আজ ঘুচিয়া গিয়াছে। তিনি চিনিলেন—এই দণ্ড, কমণ্ডলু, বাঘছাল ও পবিত্র ধুনি এসব তাঁহারই পূর্বজন্মের ব্যবহৃত বস্তু; সম্মুখে দণ্ডায়মান এ যোগীই তাঁহার পূর্বজন্মের গুরু—আর ইনিই তাঁহার ইহ-পরকালের পরমাশ্রয়।

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া শ্যামাচরণ যুক্তকরে দণ্ডায়মান রহিলেন।

যোগী সহাস্যে বলিলেন, "বেটা, এসব জিনিস তোমারই আগেকার ব্যবহার করা। তুমি পূর্বজন্মে আমার চেলা ছিলে। সাধনার উচ্চ মার্গে অবস্থান করার কালে তোমার দেহপাত হয়। এ জন্মে ঈশ্বরনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্য আবার তোমায় জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। তোমার সেই সাধনসম্পদকে গচ্ছিত বস্তুরূপে রক্ষা ক'রে আমি এ যাবৎ অপেক্ষা করছি। তোমায় দীক্ষা দেবার জন্যই আজ আমার এখানে আগমন।"

যোগীবরের নিকট শ্যামাচরণ আরও যেসব তথ্য শুনিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। যোগী বলিলেন, "বাবা, তোমায় এখানে আসতে আদেশ ক'রে যে টেলিগ্রাম তোমার কার্যস্থল দানাপুরে পাঠানো হয়, তা ঘটেছে ওপরওয়ালা সাহেবের ভ্রান্তির ফলে। এক স্থানের নাম করতে গিয়ে সে আর একস্থানের উল্লেখ করেছে। এ ভ্রান্তি আমিই ঘটিয়েছি। জেনে রেখো, আবার সাত দিন পরেই তোমার কাছে আদেশ আসছে দানাপুরে ফিরে যাবার জন্য। ততদিনে আমার কাজও শেষ হয়ে যাবে।"

সাধারণ সংসারী মানুষ শ্যামাচরণের জীবনে এ কি অলৌকিক কাণ্ড! অসামান্য যোগবিভূতিসম্পন্ন এই মহাপুরুষ তাঁহার গুরু? আর তাঁহারই প্রতীক্ষায় গুরু এমনিভাবে দিন গুণিতেছেন!

অস্তরাগরঞ্জিত দ্রোণগিরির বক্ষে, রহস্যময় এই গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া শ্যামাচরণের মনে হইল, জন্ম-জন্মান্তরে এই গুরু অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর জন, আত্মার পরমাত্মীয় জন, আর তাঁহার কেহই নাই। আত্মীয়, সুহৃদ ও বিশ্বসংসার সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব যেন অন্তর হইতে আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

বাষ্পাকুল কণ্ঠে, সকাতরে শ্যামাচরণ কহিলেন, "বাবা, আর আমায় সংসারে ফিরে যেতে বলবেন না, আপনার চরণসেবা ক'রেই আমি জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। হারানো অধ্যাত্ম-সম্পদের পুনরুদ্ধার করাই আজ থেকে হবে আমার জীবনের ব্রত।"

"না বাবা, সংসার তোমায় এখনি ত্যাগ করতে হবে না। সংসারে থেকেই আপন সাধন-বলে তুমি লাভ করবে যোগী জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। এই ঐশ বিধানই তোমার জন্য রয়েছে। যোগসাধন প্রচারের তুমি হবে এক চিহ্নিত আচার্য। পরম গোপ্য এই সাধনকে উপযুক্ত পাত্র বুঝে বিতরণ করার দায়িত্ব তোমায় গ্রহণ করতে হবে।"

বিদায় বেলায় যোগী বলিয়া দিলেন, "শ্যামাচরণ, স্মরণ রেখো, অফিস-ই তোমার জন্য আজ রানীক্ষেতে এসেছে—তুমি অফিসের জন্য এখানে আসো নি। পরমাত্মার ইচ্ছে অনুসারেই এসব ঘটেছে। যে ক'দিন তুমি এই অঞ্চলে থাকবে, রোজই আমার সাথে সাক্ষাৎ ক'রো।"

শ্যামাচরণ লাহিড়ীর জীবনে সেদিন এক পটপরিবর্তন ঘটিয়া গেল। এ পরিবর্তন যেমনই নাটকীয় তেমনই বিস্ময়কর। নদীয়ার এক অখ্যাত গ্রামে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। জীবন-পথের বাঁকে বাঁকে নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতোই এতদিন তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। তারপর কার্যব্যপদেশে রানীক্ষেত্রে আসিবার পর সমস্ত কিছু আজ ওলোট-পালোট হইয়া গেল—শিবকল্প মহাযোগীর আশ্রয় তিনি লাভ করিলেন। এ অপ্রত্যাশিত কৃপা তাঁহার জীবনে সূচনা করিল এক বিরল সৌভাগ্যের।

শ্যামাচরণের পিতা গৌরমোহন (সরকার) লাহিড়ীর বাস ছিল কৃষ্ণনগরের কাছে ঘূর্ণী নামক গ্রামে। এখানকার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গৌরমোহন ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ এবং যোগসাধনপরায়ণ। স্বগ্রামে মহাসমারোহে একটি শিবমন্দিরও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁহার এ মন্দির নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। পরবর্তীকালে শিবের প্রত্যাদেশ অনুসারে বিগ্রহটিকে নদীগর্ভ হইতে উদ্ধার করা হয়, নূতন একটি মন্দির নির্মিত হয়। আজিও সে স্থানটি ঘূর্ণীর শিবতলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই শিব পূজায় গৌরমোহনের পত্নী মুক্তকেশী দেবীর খুব উৎসাহ ছিল।

ধর্মনিষ্ঠ দম্পতির গৃহ আলো করিয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে

শ্যামাচরণ আবির্ভূত হন। শৈশবে শিশুর মাতৃবিয়োগ ঘটিবার পর হইতে পিতা গৌরমোহন তাঁহাকে নিয়া স্থায়ীভাবে কাশীতে বসবাস করিতে থাকেন।

নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণবংশের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা শ্যামাচরণের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই বহমান ছিল। তরুণ বয়সে মহাতীর্থ কাশীতে বসবাসের ফলে এ ধারা আরও বেগবতী হইয়া উঠে। অগণিত মন্দির এবং ভজনস্থল এ শহরের চারিদিকে সাধু-মহাত্মাদের আনাগোনাও যথেষ্ট। এই পরিবেশে মানুষ হওয়ায় শ্যামাচরণের মনে জাগিতে থাকে অধ্যাত্ম-জীবনের এক বিশেষ মূল্যবোধ।

পিতা গৌরমোহন শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মসাধনায় চির-বিশ্বাসী, নিষ্ঠাভরে ঋগ্বেদ পাঠ করা ছিল তাঁহার প্রতিদিনের অভ্যাস। কাশীতে তখন নাগভট্ট নামে এক বেদবিদ্ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের খুব প্রতিষ্ঠা, ইঁহারই কাছে বালক শ্যামাচরণকে কিছুদিনের জন্য বেদশিক্ষার্থীরূপে রাখা হইল।

গৌরমোহন প্রাচীন ভারতের ধর্ম সংস্কৃতির ভক্ত হইলেও পুত্রকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে আধুনিক ভাবধারাকে কখনো অগ্রাহ্য করেন নাই। পুত্রের জন্য তিনি উর্দু শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন। তাছাড়া রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের স্কুলে এবং সরকারী সংস্কৃত কলেজে পড়িয়া শ্যামাচরণ বাংলা, সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরেজী আয়ত্ত করেন। স্কুল ও কলেজের সহপাঠীরা এই গৌরকান্তি, সুদর্শন মেধাবী তরুণের প্রতি অতি সহজে আকৃষ্ট হইয়া পড়িত।

আঠারো বৎসর বয়সে শ্যামাচরণকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়, নববধূ কাশীমণির বয়স তখন ছিল মাত্র আট বৎসর। শালিখার এক পণ্ডিত-বংশে কাশীমণির জন্ম। ছোটবেলা হইতেই তিনি ছিলেন নানা সদ্‌গুণের আকর। পরবর্তীকালে সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণীরূপেই তাঁহাকে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। যোগাচার্য-রূপে শ্যামাচরণ যে ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাহা সার্থক করিয়া তুলিতে এই পত্নীর সহায়তা কম কার্যকরী হয় নাই।

তেইশ বৎসর বয়সে সরকারী পূর্ত দপ্তরের এক সাধারণ কর্মচারী

হিসাবে শ্যামাচরণ কর্ম আরম্ভ করেন। দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতার লোকান্তর ঘটে এবং সংসারের গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়াই তাঁহার কর্মজীবনের সূচনা হয়।

উত্তরকালে অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারী হইয়াও শ্যামাচরণ লাহিড়ী পরম নির্লিপ্তির সহিত সংসারাশ্রমের অনেক কিছু দায়িত্ব স্বচ্ছন্দে পালন করিয়া গিয়াছেন। বহিরঙ্গ জীবনের হাসিকান্না ও কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে যোগীজীবনের প্রশান্তিকে তিনি ধারণ করিয়া গিয়াছেন অবলীলায়।

উত্তরভারতের নানা স্থানে কাজ করিতে করিতে শ্যামাচরণ সেবার দানাপুরে বদলী হন। তখন তাঁহার বয়স তেত্রিশ বৎসরের বেশি নয়। এই সময়েই হঠাৎ রানীক্ষেতে কর্ম উপলক্ষে তাঁহাকে আসিতে হয়, আর ভগবৎ-কৃপার অমৃতভাণ্ডখানি হাতে নিয়া জন্মান্তরের গুরু আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হন তাঁহার সম্মুখে।

লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার গুরুজীকে 'বাবাজী' বলিয়া অভিহিত করিতেন। অপরিমেয় সাধনশক্তি ও যোগবিভূতির অধিকারীরূপে এই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের খ্যাতি ছিল। কোনো কোনো সাধক ইঁহাকে 'ত্র্যম্বক বাবা', কেহ বা 'শিব বাবা' বলিয়াও সম্বোধন করিতেন। এই মহাযোগীকে কেন্দ্র করিয়া হিমাচল অঞ্চলে ও সমগ্র উত্তর ভারতে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। বয়স শত বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও যোগবলে এই মহাত্মা স্থির-যৌবন মূর্তি রক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন, যোগেশ্বর মহাপুরুষরূপে উচ্চকোটির সাধক সমাজে ছিল তাঁহার অসামান্য প্রতিষ্ঠা।

লাহিড়ী মহাশয়ের গুরুকৃপা লাভের মূলে প্রধানত ছিল তাঁহার পূর্বজন্মের সঞ্চিত সাধনা ও জন্মান্তরের অর্জিত মহাসম্পদ। শিষ্যের পূর্বস্মৃতি উদ্বোধনের জন্য গুরুজী তাই বার বারই বলিতে লাগিলেন, "শ্যামাচরণ, ইয়ে তো তুমহারি আপনে চীজ হ্যায়"—অর্থাৎ, এ যে তোমারই নিজস্ব সম্পদ!

প্রথম সাক্ষাতের পরদিনই লাহিড়ী মহাশয় যোগীবরের পাহাড়ের

কাছে তাঁবু ফেলিলেন। অফিসের সামান্য যাহা কিছু কাজ থাকিত এখান হইতেই তাহা সারিতেন। তারপর রোজ উপস্থিত হইতেন বাবাজীর গুহায়। সারাদিন তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভের পর দিনান্তে তাঁহারই দেওয়া যৎসামান্য আহার্য সেখানে বসিয়া গ্রহণ করিতেন।

গুরু একদিন কহিলেন, "শ্যামাচরণ, দীক্ষাবীজ রোপণ না করলে পরম প্রাপ্তি ঘটে না। এবার সেই দীক্ষা আমি তোমায় দেবো। লগ্ন এসে গিয়েছে।"

দিন ক্ষণ স্থির করা হইল। তাহার আগের দিন লাহিড়ী মহাশয় দেখিলেন, গুহার এক-প্রান্তে একটি মাটির পাত্র ঢাকা অবস্থায় রহিয়াছে। যোগীবর কহিলেন, "বাবা, এর ভেতর যা আছে সবটা গলাধঃকরণ ক'রে ফেল।"

পাত্রটি খুলিয়া দেখা গেল, কোনো তৈলজাতীয় পদার্থে উহা পূর্ণ। লাহিড়ী মহাশয় ভাবিলেন, হয়তো ভুলবশত এই পাত্রে কেহ তেল রাখিয়া থাকিবে। তাঁহাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া বাবাজী হুকুম দিলেন, "আরে কেয়া দেখতে হো, সব পি ডালো।"

আর বিলম্ব না করিয়া লাহিড়ী মহাশয় সবটাই একেবারে উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন।

পাহাড়ের নিকটেই গগাস্ নদী। যোগীবর আদেশ দিলেন- "বাবা, এবারে তোমায় নদী সৈকতে গিয়ে পড়ে থাকতে হবে।"

আদেশ পালিত হইল। নদী তীরে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল অবিরাম ভেদ ও বমন। লাহিড়ী মহাশয় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন।

নদীতট কঙ্কর ও বালুকায় আচ্ছন্ন। এখানে শুইয়া থাকিয়াও নিস্তার নাই, হঠাৎ খরস্রোতা গিরি-নদীতে নামিয়া আসিল তীব্র প্লাবন। অসুস্থ শরীরে স্রোতের টানে তিনি অনেক দূর ভাসিয়া গেলেন এবং স্রোতের সহিত অবিরত যুঝিয়া হইলেন মৃতকল্প।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহখানি অতিকষ্টে টানিয়া নিয়া পরদিন প্রভাতে তিনি বাবাজীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। বাবাজী তাঁহাকে

দেখিয়াই পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "শ্যামাচরণ, ভালই হয়েছে। যত কিছু ময়লা ছিল সব এবার দূর হয়ে গেল।"

অতঃপর লাহিড়ী মহাশয়কে প্রচুর পরিমাণে গরম গরম পুরী হালুয়া ভোজন করানো হইল। ভোজন শেষে বাবাজী জানাইয়া দিলেন, "শ্যামাচরণ, আজ সন্ধ্যাকালে পবিত্র ও শুভলগ্ন রয়েছে। আজই তোমায় আমি দীক্ষা দেবো।"

যথাসময়ে দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। একদিকে উপযুক্ত অধিকারী শিষ্য, অপরদিকে কৃপাবর্ষণে উন্মুখ মহাশক্তিধর সদ্‌গুরু—এ যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত লাহিড়ী মহাশয় যোগসাধনার পদ্ধতিসমূহ আয়ত্ত করিলেন। নবীন সাধক গুরুশক্তিতে উদ্দীপিত—তাই গুরুর কৃপায় একের পর এক লাভ করিলেন অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বহুতর দুর্লভ অনুভূতি।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন গত হইয়াছে। বাবাজী মহারাজ সেদিন শিষ্যকে স্নেহালিঙ্গন দিয়া কহিলেন, "বেটা, তোমায় আরো বেশ কিছুকাল সংসারাশ্রমে বাস করতে হবে। মানব-কল্যাণের জন্য যোগ-সাধনার প্রচার আবশ্যক, আর এ কাজে বিশিষ্ট আচার্যরূপে তোমার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বেটা, এবার যে তোমার রানী-ক্ষেত্রে থাকা আর চলবে না, পূর্বেকার কর্মস্থলে ফিরে যেতে হবে।"

আসন্ন বিচ্ছেদের কথা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের দুই চোখে নামিয়া আসিল অশ্রুধারা। গুরু আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "শ্যামাচরণ, তুমি দুঃখ ক'রো না। প্রয়োজনমতো যখনি তুমি আমার স্মরণ করবে, তখনই আমার সাক্ষাৎ পাবে—একথা নিশ্চয় জেনো।"

নবীন যোগী সেদিন সদ্‌গুরুর চরণে নিবেদন করিলেন এক বিশেষ প্রার্থনা। আপন মোক্ষের স্বপ্নের সাথে জাগিল জগতের হিতের কথা। যুক্তকরে কহিলেন, "বাবা, আমার একান্ত অনুরোধ, ত্রিতাপক্লিষ্ট স্বল্পায়ু মানবের কাছে আপনার এই দুর্লভ যোগসাধনকে সহজলভ্য ক'রে দিন। দিব্য করুণার ধারাকে ছড়িয়ে দিন আমাদের জীবনমরুতে।"

উত্তরে বাবাজী কহিলেন, "বেটা, ঐশী কৃপা ধারণ করার জন্য চাই

ক্ষেত্রের প্রস্তুতি। বেশ তো, সমাজের ভেতরে থেকে এ প্রস্তুতিতে তুমি সাহায্য করো।"

উত্তরকালে যোগী শ্যামাচরণ লাহিড়ীর মাধ্যমে এই কৃপার ধারা বহু ভাগ্যবানের জীবনে বিস্তারিত হইয়াছিল।

বাবাজী মহারাজ একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্যামাচরণ, সময় হয়েছে, প্রস্তুত হও। এবার তোমার বদলীর নির্দেশ আসছে। তোমায় রানীক্ষেত ত্যাগ করতে হবে।"

বড় মর্মান্তিক এই কথা। গুরুদেবের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সারা অস্তিত্ব আজ তাঁহারই চরণে হইয়াছে কেন্দ্রীভূত। কোন্ প্রাণে আজ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবেন? তাছাড়া, সাধন-সম্পদই বা এমন কি ইতিমধ্যে লাভ করিয়াছেন? তেমন কিছু তো তিনি পান নাই। সম্মুখে রহিয়াছে মাত্র গুটিকয়েক দিন। ইহারই মধ্যে নূতন জীবনের পাথেয়টুকু সঞ্চয় করিয়া নেওয়া চাই।

শক্তিধর গুরু যোগসিদ্ধির অনেক কিছু ঐশ্বর্য এ সময়ে অকৃপণ করে ঢালিয়া দেন, আর আত্মনিবেদিত শ্যামাচরণ তাহা গ্রহণ করেন অপূর্ব নিষ্ঠায়।

রোজকার সাধনা ও যোগক্রিয়া শেষ হইলে লাহিড়ী মহাশয় গুরুর সান্নিধ্যে আসিয়া বসেন, যোগ-রাজ্যের নানা সাধনরহস্য শ্রবণ করেন। যোগীজীবনের বিচিত্র কাহিনী এক একদিন তাঁহাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। সিদ্ধযোগী মহাত্মাদের লীলাভূমি এই পবিত্র হিমালয়। প্রতি শৃঙ্গে, প্রতি কন্দরে ইহার অধ্যাত্মলোকের কত নিগূঢ় ধন সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার পরিমাপ কে করিবে!

বাবাজী মহারাজের মুখ হইতে শ্যামাচরণ এ সময়ে স্থানীয় এক মহাযোগীর কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হন—

দ্রোণগিরির এই জনমানবহীন গুহা হইতে মাইল পাঁচেক দূরে দেখা যায় এক সুপ্রাচীন জীর্ণ দেবালয়। স্থানটি এক সিদ্ধ মহাপুরুষের বিচরণক্ষেত্র। সাধু-সন্ন্যাসীদের মতে, এই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের বয়সের নাকি কোনো হিসাব নাই। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে—এই

মহাত্মা দ্রোণগিরির অভিভাবক, পৌরাণিক আমলের অমর মানুষ, 'অশ্বত্থমা' নামেও অনেকে এ রহস্যময় মহাপুরুষকে অভিহিত করে।

কাঠের খড়ম পায়ে, গভীর রাত্রে খট্ খট্ শব্দে ইনি একবার করিয়া পূর্বোক্ত ভগ্ন দেবালয়ে প্রবেশ করেন, দিব্য দেহ-জ্যোতিতে, চতুর্দিক তখন আলোকিত হইয়া উঠে।

যোগসাধন-পথের নূতন পথিক, লাহিড়ী মহাশয় কৌতূহলী হইয়া উঠেন এবং তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধে গুরুজী এক নিশীথে দূর হইতে তাঁহাকে এই মহাত্মার দেহজ্যোতি দর্শন করান।

বাবাজী মহারাজ বলিতেন, "ওখানকার অনেকে মৃতকল্প রোগীদের এই মহাত্মার কৃপার উপর নির্ভর করে পাহাড়ে ফেলে রেখে যায়। তাঁর কৃপা-দৃষ্টিপাতে তারা বেঁচে ওঠে।"

লাহিড়ী মহাশয় নিজেও একদিন ইহার কিছু পরিচয় পান—।

একদিন দুই তিনজন সাধুর সহিত তিনি ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; পথ চলিতে চলিতে একজন সঙ্গী হঠাৎ অরণ্যের এক বিষাক্ত ফল খাইয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। প্রবল ভেদবমি দেখা দেয়। এদিকে রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতে থাকে। এই আকস্মিক বিপদে সকলে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

সম্মুখেই মহাত্মা 'অশ্বত্থামা'র ভগ্ন দেউলের চূড়া। অপর কোনো উপায় না দেখিয়া তাঁহারা দ্রোণগিরির ঐ রহস্যময় মহাপুরুষের আশ্রয়েই সাধুটিকে রাখার সিদ্ধান্ত করিলেন। সে তখন মৃত্যুপথের যাত্রী। সকলে ধরাধরি করিয়া আনিয়া জরাজীর্ণ দেউলের একপাশে তাহাকে শোয়াইয়া রাখিলেন।

সাধুটি কিন্তু পরদিনই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসে। তাহার মুখে পর্বতশীর্ষচারী মহাত্মার কৃপা কাহিনী শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

মৃতকল্প সাধুটি জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়া আছে, এমন সময় রহস্যময় পুরুষ সেখানে আবির্ভূত হন, রোষকষায়িত নেত্রে গর্জন করিয়া বলেন, "এখানে কে রে তুই?"

সঙ্গে সঙ্গেই আসে প্রচণ্ড পদাঘাত। এ আঘাতের ফলে রোগী গড়াইতে গড়াইতে সন্নিহিত নিম্নভূমিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু পরম বিস্ময়ের কথা, কিছুকাল পরেই তাহার দেহে নব বলের সঞ্চার হইতে থাকে। তারপর পায়ে হাঁটিয়া সে নিচে চলিয়া আসে।

দ্রোণগিরি অঞ্চলের এইসব সিদ্ধ-যোগীদের লীলাকাহিনী নবীন সাধক লাহিড়ী মহাশয়ের চেতনায় প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়, অতীন্দ্রিয় রাজ্যের নানা কাহিনী, নানা অলৌকিক তথ্য শুনিয়া তিনি আরও উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠেন।

এ সময়ে চমকপ্রদ যোগবিভূতি দেখাইয়া দু-একজন গুরুভ্রাতাও তাঁহাকে কম বিস্মিত করেন নাই।

একদিন লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার এক গুরুভ্রাতা ও কয়েকটি সাধুসহ খরস্রোতা পার্বত্য নদী গগাস্-এর অপর পারে শৌচাদির জন্য গিয়েছেন। ফিরিতে সেদিন তাঁহাদের বেশ দেরি হইয়া গেল। ইতিমধ্যে প্রবলবেগে নদীতে হড়্কা বান আসিয়া পড়ে, দুই কূলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হইয়া যায়। তরুণ সাধকেরা তো প্রমাদ গণিলেন, তাই তো এ জলস্ফীতি অতিক্রম করা যে অসম্ভব!

গুরুভ্রাতাদের একজন ছিলেন অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী। মস্তক হইতে তাড়াতাড়ি পাগড়ীটি খুলিয়া নিয়া তিনি এ সময়ে এক অলৌকিক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। পাগড়ীটি জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সঙ্গীদের কহিলেন, "তোমরা এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে, এর ওপর হাত রেখে, একে একে অপর পারে চলে যাও।"

সঙ্গীরা অগোণে জলে নামিয়া পড়িলেন। শক্তি সঞ্চারিত এই ভাসমান বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিয়াই সেদিন সকলে নদীর অপর পারে আসিয়া পৌঁছিলেন।

উত্তরকালে লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে সেদিনকার এ ঘটনাটির চমকপ্রদ বর্ণনা মাঝে মাঝে শোনা যাইত।

ঐ অলৌকিক বস্ত্র-সেতুর রহস্য সম্বন্ধে তিনি গুরুদেবকে একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "বেটা, এতে

বিস্ময়ের কিছু তো নেই। অষ্টসিদ্ধি পেয়েছে বলেই তোমার ঐ গুরুভাই এ যোগসামর্থ্য অর্জন করেছে। আমার নির্দেশিত সাধন-পন্থা অনুসরণ করলে তুমিও অতি সহজে এ ধরনের যোগবিভূতি লাভ করতে পারবে। লাহিড়ী মহাশয় পরে বুঝিয়াছিলেন, গুরুভ্রাতার চমকপ্রদ বিভূতি প্রকাশের মধ্য দিয়া গুরুদেব সেদিন তাঁহারই অন্তরে উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে চাহিয়াছিলেন।

গুরুভ্রাতাদের কাছে বসিয়া নবীন যোগী এই সময়ে বাবাজী মহারাজের যোগবিভূতির নানা কাহিনী শুনিতেন। দ্রোণগিরিতে থাকিতে তিনি নিজেও ইহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন।

রানীক্ষেতের সন্নিহিত অঞ্চলের এক ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন বাবাজী মহারাজের ভক্ত। একদিন তিনি বাবাজী ও অন্যান্য বহু সংখ্যক সাধুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ জানান। এই শেঠজী বাবাজী মহারাজের স্নেহভাজন। কিন্তু তাঁহার ধনাভিমান বড় প্রবল ছিল। বাবাজী মহারাজ মনে মনে ঠিক করিয়াছেন, সেদিন তাঁহার গর্ব চূর্ণ না করিয়া ছাড়িবেন না। তিনি জানাইয়া দিলেন, নূতন শিষ্য লাহিড়ী মহাশয়কে সঙ্গে নিয়া তিনি এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছেন। কথা রহিল অন্যান্য অতিথিদের পূর্বেই তিনি সশিষ্য উপস্থিত হইবেন, এবং পৌছানো মাত্রই তাঁহাদের ভোজনে বসাইতে হইবে। বিলম্ব করা চলিবে না।

যথাসময়ে গুরু ও শিষ্য নিমন্ত্রণকারী শেঠের গৃহে পৌছিলেন। ভোজনে বসিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের তো চক্ষু স্থির! নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানেন, গুরুদেব খুবই মিতাহারী। কিন্তু আজ যেন তাঁহার জাগিয়াছে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। চাঙাড়ি ভর্তি পুরী, মালপোয়া, হালুয়া আসিতেছে আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহা গলাধঃকরণ করিতেছেন। সোৎসাহে বলিতেছেন, "অওর কুছ ?"

ক্রমে শেঠজীর মুখ শুকাইয়া উঠিল। অন্যান্য নিমন্ত্রিত সাধুসন্ত সবাই ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের সেবা কি দিয়া

চলিবে ? ভোজদ্রব্য পর্যাপ্ত পরিমাণেই প্রস্তুত করা হইয়াছে কিন্তু তাহার সবটাই যে প্রায় ফুরাইয়া আসিল।

শেঠজী কাতরভাবে এবার বাবাজী মহারাজের শরণ নিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ও বলিয়া উঠিলেন, "গুরুজী, আপনি কি লোকটার সর্বনাশ করতে চান ? এখন দয়া ক'রে উঠে পড়ুন তো।"

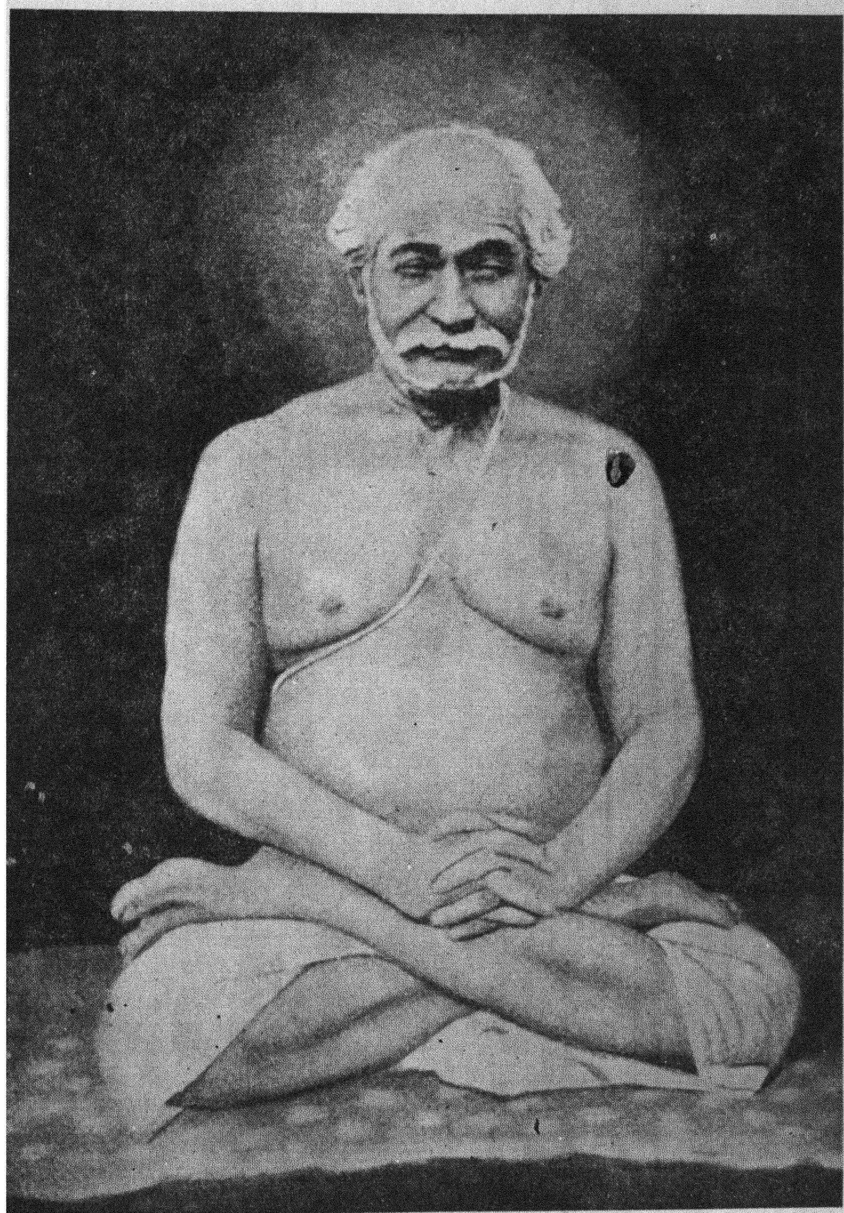
ভোজন শেষ হইলে, পাত্র ত্যাগ করিতে গিয়া বাবাজী বলিলেন, "ক্ষমতা তো এতটুকু, অথচ লোকটার দেমাক কম নয়। কি পরিমাণ খাবার সে যোগাড় করতে পারে, তা পরখ্ ক'রে দেখবার আজ আমার ইচ্ছে হয়েছিল।"

আশ্রিত শিষ্যদের শিক্ষা ও শাসনের ব্যাপারে বাবাজী মহারাজের সতর্কতার সীমা ছিল না। অনেক সময় অত্যন্ত কঠোরভাবে তাহাদের সাধন-জীবনকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করিতেন। সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য শিষ্যদের ধুনির জ্বলন্ত কাঠ দিয়া প্রহার করিতেও তাঁহার দ্বিধা ছিল না। দ্রোণগিরিতে থাকাকালে লাহিড়ী মহাশয় স্বচক্ষে গুরুজীর এই ধরনের রুদ্ররোষ দু-একবার দেখিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে সামরিক পূর্তবিভাগ হইতে সংবাদ আসিয়া গেল। কর্তৃপক্ষ ভ্রম সংশোধন করিয়া তার পাঠাইয়াছেন, শ্যামাচরণ লাহিড়ীর আর রানীক্ষেতে অবস্থানের প্রয়োজন নাই—অগৌণে তাঁহাকে দানাপুর অফিসে ফিরিতে হইবে।

গুরুর পদবন্দনা করিয়া শিষ্য এবার সাশ্রুনয়নে দ্রোণগিরি ত্যাগ করিলেন।

ফিরিবার পথে লাহিড়ী মহাশয় মোরাদাবাদ শহরে দুই-তিনদিন অতিবাহিত করেন। এই সময়ে এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটে। তিনি তাঁহার কয়েকটি বাঙালী বন্ধুর সঙ্গে বসিয়া নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করিতেছেন। হঠাৎ তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন—"তোমরা যাই বল, এযুগে কিন্তু আগের দিনের মতো অলৌকিক যোগবিভূতি-সম্পন্ন সাধুর দর্শন মেলে না।"



শ্যামাচরন লাহিড়ী

শ্যামাচরণ দৃঢ়স্বরে তখনি প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন, "এ আপনি কি বলছেন! এমন মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভ আজকের দিনেও মোটেই অসম্ভব নয়। ইচ্ছে করলে, ধ্যানবলে আকর্ষণ ক'রে আমিই এখানে এমন একজনকে এনে দেখাতে পারি।"

বন্ধুদের কৌতূহল ও আগ্রহের সীমা রহিল না। তাঁহারা লাহিড়ী মহাশয়কে চাপিয়া ধরিলেন। অনুরোধ এড়ানো বড় কঠিন, তাছাড়া, নিজের যোগবল ও গুরুদেবের করুণার কথা তিনি কথাপ্রসঙ্গে নিজেই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। মহাপুরুষের মর্য্যাদারক্ষার প্রশ্নটিও যে এখানে জড়িত।

অগত্যা বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, তোমরা আমায় একটা নির্জন ঘর দাও। এর দরজা-জানালা সব বাইরে থেকে বন্ধ থাকবে। ধ্যানের ফলে আমার শ্রীগুরুদেব অবশ্য আবির্ভূত হবেন।"

দ্রোণগিরিতে বাবাজী মহারাজের নিকট শ্যামাচরণ দীর্ঘদিন থাকিতে পারেন নাই। গুরুজীর বিচ্ছেদ তাঁহার পক্ষে অসহনীয়, তাই আসিবার সময় বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। এসময়ে বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, "বেটা, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। যেখানেই থাকো তুমি স্মরণ করলেই আমি তোমার কাছে আবির্ভূত হবো।"

গুরুজীর সেদিনকার এই প্রতিশ্রুতিই ছিল ·:ধান যোগী শ্যামাচরণের একমাত্র ভরসা।

নির্জন প্রকোষ্ঠে যোগাসনে বসিয়া বসিয়া সদ্‌গুরুকে তিনি জানাইলেন অন্তরের আকুল আহ্বান।

অচিরে ধ্যানযোগে আকর্ষিত হইয়া সেখানে আবির্ভূত হইল শুভ্র একটি জ্যোতির পুঞ্জ। তারপর ধীরে ধীরে উহা আকারিত হইল বাবাজী মহারাজের স্থুল দেহরূপে।

এবার আসন গ্রহণ করিয়া মহাযোগী প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "শ্যামাচরণ, তোমার ডাক শুনে আমি এসে পড়েছি। কিন্তু বেটা, সামান্য তর্কচ্ছলে, বন্ধুদের সাধু দেখাবার উৎসাহে তুমি আমায় এতদূর থেকে আহ্বান ক'রে আনলে? তামাশা দেখাবার জন্যই কি দীক্ষাদান

ক'রে তোমাতে আমি শক্তি সঞ্চারিত করেছি, তোমায় যোগবিভূতির অধিকারী ক'রে তুলেছি ?"

সাষ্টাঙ্গে শ্রীগুরুর চরণে প্রণিপাত করিয়া লাহিড়ী মহাশয় ভীত-ভাবে উপবেশন করিলেন। তিরস্কার শোনার পর মুখে তাঁহার কথা সরিতেছে না, নতমস্তকে সেখানে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। বুঝিলেন মহাযোগীর কৃপাদত্ত শক্তির এই অপব্যবহার নিতান্ত অমার্জনীয়। একাজ বড়ই গর্হিত। তাছাড়া, আরও বুঝিলেন, সদ্‌গুরুর সদাজাগ্রত দূরসন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিবার সাধ্য তাঁহার নাই ?

বাবাজী মহারাজ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "শোন শ্যামাচরণ, আমার নিজের প্রতিশ্রুতি রাখতে ও তোমার সম্মান রাখতে আজ আমি উপস্থিত হলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে তুমি নিজে স্মরণ করলে আমার সাক্ষাৎ পাবে না—আমিই প্রয়োজনবোধে স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হব।"

গুরুজীর চরণতলে পতিত হইয়া শ্যামাচরণ বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। নিজের কৌতূহল মেটাবার নয়, অবিশ্বাসীদের মনে বিশ্বাস জন্মানোর জন্যই এ কাজ তিনি করিয়াছেন।

মিনতি করিয়া বাবাজী মহারাজকে কহিলেন, "গুরুদেব, আমার আহ্বানে কৃপা ক'রে যদি এসেই পড়েছেন তো সকলকে একবার দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করুন।"

বাবাজী মহারাজের ইঙ্গিতে কক্ষের দ্বার এবার উন্মুক্ত করা হইল। বন্ধুরা বাহিরে তখনো অপেক্ষমাণ আছেন। যোগীবরের অলৌকিক আবির্ভাব দর্শনে তাঁহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সকলেই তখন তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন—এ আবির্ভাব যে ইন্দ্রজাল নয়, কোনো মায়িক দেহের উপস্থিতি নয়, এই সত্যটিও তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন।

এবার গুরু মহারাজকে ভোগ নিবেদন করিতে হইবে। শ্যামাচরণ শুদ্ধভাবে তখনি লুচি হালুয়া তৈয়ার করিয়া আনিলেন। বাবাজী মহারাজের ভোজনের পর সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হইল।

দানাপুরে ফিরিয়া আসিয়া লাহিড়ী মহাশয় অফিসের কাজে যোগদান করিলেন বটে, কিন্তু গুরুর প্রদত্ত যোগসাধনই এখন হইতে হইয়া উঠিল জীবনের প্রধান অবলম্বন। মহাযোগীর কৃপাস্পর্শে আজ জীবনে তাঁহার দেখা দিয়াছে নূতনতর আনন্দ, নূতনতর আলোকের সন্ধান। অধ্যাত্মজীবনের শতদলখানি এবার ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইয়া উঠিতেছে।

অফিসের দৈনন্দিন কাজকর্ম শেষ হইলেই নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি সরিয়া পড়েন, যোগসাধনায় নিমজ্জিত হন। সহ-কর্মীদের অনেকেই সেদিন তাঁহার এই সাধনোজ্জ্বল জীবনের প্রকৃত পরিচয় পান নাই, তাঁহার রূপান্তরের স্বরূপও তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে একজন প্রচ্ছন্ন সাধক, এ কথাটি তাহাদের অজানা ছিল না।

অফিসের উপরওয়ালা সাহেব তাঁহার এই উদাসীন প্রকৃতির কর্ম-চারীটিকে বলিতেন,—'পাগলাবাবু'।

সেবার একটি ঘটনায় শ্যামাচরণের অলৌকিক যোগবিভূতি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অফিসের সাহেবকে কয়েকদিন যাবৎ বড় বিষণ্ণ দেখা যাইতেছিল। শ্যামাচরণ তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে জানিলেন, মেমসাহেব ইংলণ্ডে খুব গুরুতর রোগে পীড়িতা, প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন। তাছাড়া, কয়েকদিন যাবৎ তাঁহার কোনো সংবাদ নাই, এজন্য সাহেব বড়ই চিন্তায় পড়িয়াছেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের অন্তর করুণায় ভরিয়া উঠিল। আশ্বাস দিলেন, সেইদিনই তিনি মেমসাহেবের সংবাদ আনিয়া দিবেন।

অধীনস্থ কর্মচারীটি এ কি অদ্ভুত কথা বলিতেছে? সাহেব সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন কেন? তবুও তাহার সমবেদনার সুরটুকু কি জানি কেন অন্তর স্পর্শ করিল। উদাস নেত্রে লাহিড়ী মহাশয়ের দিকে একবার তাকাইয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন।

তখনি অফিসের এক নির্জন কক্ষে শ্যামাচরণ ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে সাহেবকে কহিলেন, "স্যার,

আমি জেনেছি, মেমসাহেব রোগমুক্ত হয়েছেন। কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তিনি কয়েকদিনের ভেতরই নিজের হাতে আপনাকে চিঠি লিখছেন।” শুধু তাহাই নয়, তিনি এই পত্রের ভাষা ও বিষয়বস্তুও বলিয়া দিলেন।

ভারতীয় যোগীদের নানা অলৌকিক বিভূতির কথা সাহেব শুনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অফিসের ‘পাগলাবাবু’-ই যে সেই শক্তির অধিকারী তাহা সহজে মানিয়া নিতে মন সায় দিবে কেন? তবুও শ্যামাচরণের আন্তরিকতাপূর্ণ কথাবার্তায় তাঁহার মনের চাঞ্চল্য অনেকটা দূর হইয়া গেল।

কয়েকদিন পরেই মেমসাহেবের চিঠি আসিয়া উপস্থিত। লাহিড়ী মহাশয়ের বর্ণিত ভাষার সহিত ইহার আশ্চর্য মিল রহিয়াছে। সাহেবের মন বিস্ময়ে ও আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

কয়েক মাস পরের কথা। পূর্বোক্ত অফিসারের স্ত্রী ইংলণ্ড হইতে দানাপুরে আসিয়াছেন। হঠাৎ একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিয়া এই ইংরেজ মহিলার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। স্বামীকে কহিলেন, “ওগো, এ মহাত্মাকেই যে ইংলণ্ডে থাকতে আমি দর্শন করেছি, আমার রোগশয্যার পার্শ্বে ইনি দাঁড়িয়েছিলেন। জীবনের যখন কোনো আশাই ছিল না, তখন এঁরই কৃপায় অলৌকিকভাবে আমার রোগমুক্তি ঘটেছে—আমার জীবন আবার ফিরে পেয়েছি।”

‘পাগলাবাবু’র এ অপূর্ব যোগবিভূতির কথা শুনিয়া সাহেব স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

একের পর এক নিগূঢ় যোগসাধনার স্তরগুলি ভেদ করিয়া লাহিড়ী মহাশয় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। গুরুর কৃপায় উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও প্রচুর যোগৈশ্বর্যও তিনি লাভ করিতেছেন। গুরুশক্তিতে শক্তিমান্ সাধকের ঘটিতেছে দ্রুত রূপান্তর।

কিছুদিনের মধ্যে শীঘ্রই একবার প্রিয় শিষ্যের প্রয়োজনে বাবাজী মহারাজকে স্বেচ্ছায় আবির্ভূত হইতে হইল।

নিজগৃহের সম্মুখে লাহিড়ী মহাশয় সেদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এমন সময় দেখিলেন, নিকটেই এক বটবৃক্ষমূলে বসিয়া এক সাধু গঞ্জিকা সেবন করিতেছে। চেহারাটি তাহার মোটেই আকর্ষণীয় নয়, বহির্বাস ছিন্ন ও অপরিষ্কৃত। দেখিলে সহসা ভক্তির উদ্রেক তো হয়ই না, বরং মনে নানা প্রকার সন্দেহই জাগিয়া উঠে। আগেকার দিনে এ শ্রেণীর সাধু চোখে পড়িলে লাহিড়ী মহাশয় তাহাকে প্রবঞ্চক অথবা চোর বদমায়েস বলিয়াই মনে করিতেন।

নিকটে গিয়া দেখিলেন এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য! এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! তিনি কি জাগ্রত, না স্বপ্ন দেখিতেছেন! তাঁহার পূজ্যপাদ গুরুদেবই যে স্বয়ং সেখানে বসিয়া নিষ্ঠার সহিত ঐ কুদর্শন গঞ্জিকাসেবী সাধুটির লোটা মাজিতেছেন।

বাবাজী মহারাজ এখানে? দানাপুরে তিনি কবে, কি উপলক্ষে আসিলেন? এ শোচনীয় অবস্থাই বা তাঁহার কেন? নিকটে গিয়া শ্যামাচরণ সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন।

সখেদে বাবাজীকে প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, একি কাণ্ড! আপনি কেন এমনতর হীন কাজে লিপ্ত হয়েছেন? এ গঞ্জিকাসেবী সাধুটিই বা কে?"

হাতের লোটা ঘষিতে ঘষিতে গুরুজী প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "শ্যামাচরণ, আমি যে এখানে সাধু সেবা করছি। সকল ঘটেই আমার নারায়ণ বিরাজমান। তুমি তাঁর এই সর্বব্যাপী চৈতন্যময় রূপটি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছো না কেন, বলতো?"

সঙ্গে সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয় উপলব্ধি করিলেন, সর্বজীবে ও সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন পরমাত্মা। তাঁহার পরম অস্তিত্বটি শিষ্যের চেতনায় জাগাইয়া তুলিতেই সদ্‌গুরুর এই অপরূপ লীলা। যোগী-শিষ্যকে মহাপ্রেমিকরূপে রূপান্তরিত করিতে তিনি চাহিতেছেন। শ্যামাচরণের চেতনার গভীরে এবং আরও গভীরে, অবচেতন মনের সুগোপন স্তরে ভেদজ্ঞানটি যে এখনো সূক্ষ্মরূপে রহিয়া গিয়াছে। বাবাজী মহারাজ আজ তাহা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে চান। লাহিড়ী

মহাশয়ের সর্বসত্তায়, সর্বচৈতন্যে সেদিন তাই এক বিরাট আলোড়ন জাগিয়া উঠিল। ভাস্বর হইয়া উঠিল এক সর্বাতিশায়ী পরম বোধ।

বাবাজী মহারাজকে তখনি স্বগৃহে নিয়া তিনি তাঁহার অভ্যর্থনা ও সেবা পরিচর্যা করিলেন। প্রয়োজনীয় সাধন-নির্দেশাদি দিবার পর গুরুদেব সেই দিনই করিলেন অন্তর্ধান।

ইহার পর হইতেই লাহিড়ী মহাশয়ের দৃষ্টিভঙ্গিটি একেবারে বদলাইয়া যায়। এখন হইতে সর্বজীবে, সর্বভূতে তিনি নারায়ণ দর্শন করিতে থাকেন। দুষ্ট ও পাপিষ্ঠ লোকদেরও ঈশ্বরজ্ঞানে মনে মনে নমস্কার জানাইতে কখনো তিনি ভুলিতেন না। দর্শনার্থী ও ভক্তেরা প্রণাম করিলে অমনি তিনি জানাইতেন প্রত্যভিবাদন।

দানাপুরে থাকিতেই ধীরে ধীরে তিনি যোগাচার্যের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিতে থাকেন। দুই-চারিটি করিয়া মুমুক্ষু ভক্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে থাকে। ইহাদের মধ্যে বৃন্দা ভকত নামক এক সিপাহীই তাঁহার প্রথম দীক্ষিত শিষ্য। যোগসাধনায় লাহিড়ী মহাশয়ের এই নিরক্ষর শিষ্যটির কৃতিত্ব এ সময়ে অনেকের মনে বিস্ময় জাগাইয়া তুলিল।

সেবার বাঁকিপুরের এক জমিদার গৃহে বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বিতর্ক চলিতেছে। বৃন্দা ভকতও সেদিন তাহার কয়েকজন সঙ্গীসহ সেখানে শ্রোতারূপে উপস্থিত। পণ্ডিতদের দু'একটি ভ্রান্তিপূর্ণ উক্তির প্রতিবাদে বৃন্দা ভকত উঠিয়া দাঁড়ায় এবং পরম উৎসাহে ধর্মের মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে থাকে। তাহার এ ব্যাখ্যা ছিল সাধনলব্ধ অনুভূতিতে পূর্ণ, আর উপলব্ধ সত্যের দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল। নিরক্ষর সিপাহীর সেদিনকার এই প্রেরণা-দীপ্ত ভাষণ শুনিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী নির্বাক হইয়া যান।

লাহিড়ী মহাশয়ের আশ্রমে থাকিয়া বৃন্দা ভকত পরবর্তীকালে এক সার্থকনামা যোগীরূপে পরিচিত হইয়া উঠে। যোগীগুরুকে সে সময়ে প্রায়ই এই শিষ্য সম্বন্ধে সস্নেহে বলিতে শুনা যাইত, "বৃন্দার সাধনা সার্থক হয়েছে, সদাই সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভাসছে।"

রানীক্ষেতে যোগদীক্ষা গ্রহণের পর, গুরুর ইচ্ছা অনুযায়ী, প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল লাহিড়ী মহাশয়কে চাকুরীতে থাকিতে হয়। কর্মোপলক্ষে যখন সেখানে তিনি থাকিতেন, দুই-চারিজন প্রকৃত অধিকারী পুরুষকে গূঢ় যোগসাধন প্রদান করিতেন। এই সময়ে বিহারের মুঙ্গের ও ভাগলপুর, এবং বাংলার বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও কৃষ্ণনগর অঞ্চলে একদল সাধনকামী শিষ্য তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন।

কাশীধামে তখন তৈলঙ্গ স্বামীজীর যোগৈশ্বর্যের বিপুল খ্যাতি। স্থানীয় জনসাধারণ ও তীর্থচারীরা দলে দলে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে, শিবকল্প মহাপুরুষজ্ঞানে জ্ঞাপন করে তাহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা।

স্নান শেষে স্বভাবগম্ভীর স্বামীজী মহারাজ সেদিন গঙ্গার ঘাটে শয়ন করিয়া আছেন, একদল ভক্ত নীরবে সেখানে উপবিষ্ট। এই সময়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত এক বাঙালী ভদ্রলোক দুইজন সঙ্গীসহ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলেন।

আগন্তুকের চোখ-মুখ এক দিব্য আনন্দের আভায় ঝলমল। ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তৈলঙ্গ স্বামীজী সহর্ষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যোগ-সাধনার মূর্ত মৈনাক পাহাড়টি যেন কোন্ ইন্দ্রজাল বলে হঠাৎ সচল হইয়া উঠিল।

দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আগন্তুককে তিনি জড়াইয়া ধরিলেন তাঁহার বিশাল বক্ষে। মহাযোগীর চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে স্বর্গীয় আনন্দের আভা।

আগন্তুক বাঙালী ভদ্রলোকটি নীরবে করজোড়ে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তারপর শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিয়া সদলবলে বিদায় নিলেন।

তৈলঙ্গ স্বামীজীর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এতক্ষণ বিস্মত হইয়া এই অপূর্ব মিলন দৃশ্যটি দেখিতেছিলেন। এই গৃহী ভদ্রলোকটির অভ্যর্থনায় স্বামীজীর যেন উল্লাসের সীমা নাই, এমন আবেগভরে তো তাঁহাকে কখনও কাহাকেও প্রেমালিঙ্গন দিতে দেখা যায় নাই।

আগন্তুকেরা চলিয়া গেলে সকলে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বাবা, ইনি এমন কি বড় সাধক যে, আপনি এত উৎসাহের সঙ্গে সংবর্ধনা জানাচ্ছিলেন ?"

স্বামীজী প্রশান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "যোগ সাধনা কী জিস্ উন্নতি করনেকে লিয়ে সাধকোঁকো লঙোটিতক্ ছোড়নী পড়তী হ্যায়, গৃহস্থীমে রহ্তে হুয়েভী ইস্ পুরুষনে উস্ পদবীকো প্রাপ্ত কর্ লিয়া।"—অর্থাৎ, যে যোগসিদ্ধির জন্য সাধকদের লেঙটিখানাও ত্যাগ করতে হয়, এ সাধক গৃহস্থাশ্রমে থেকেই তা আয়ত্ত করেছেন।

ভক্তেরা অতঃপর জানিতে পারিলেন, অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারী এই সাধক, নাম, শ্যামাচরণ লাহিড়ী। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোগী। দ্রোণগিরির মনোহারী বাবা, বাবাজী মহারাজ নামে যিনি সর্বত্র খ্যাত, তিনিই ইহার গুরু। গুরুকৃপায় অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারী এই মহাসাধক। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রধানত গৃহস্থদের মধ্যে যোগসাধনার প্রচারই ইহার প্রধান ব্রত।

কাশীর অধ্যাত্ম-চক্রে সেদিন লাহিড়ী মহাশয়ের সম্বন্ধে গুঞ্জনধ্বনি উঠে এবং যোগীশ্রেষ্ঠ তৈলঙ্গ স্বামীজীর এ স্বীকৃতি তাঁহাকে সাধক-সমাজে অচিরে পরিচিত করাইয়া দেয়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লাহিড়ী মহাশয় কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই মহাসাধকের চরণোপান্তে দলে দলে বহু মুমুক্ষুর সমাগম হইতে থাকে। সিদ্ধযোগীর আচার্য জীবনের বৃহত্তর ভূমিকাটি এ সময় হইতে শুরু হয়।

প্রধানত সাধনেচ্ছু গৃহস্থদের মধ্যেই লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার গুরু-প্রদত্ত যোগসাধনা বিস্তারিত করিতে থাকেন। বাবাজী মহারাজের নির্দেশ ছিল, "শ্যামাচরণ, তুমি সংসারে ফিরে যাও। সেখান থেকে যোগযুক্ত সাধু-গৃহস্থদের প্রতিষ্ঠিত করো, প্রাচীন যোগসাধনার নিগূঢ় ধারাটিকে উজ্জ্বীবিত ক'রে তোল।" এ আদেশ লাহিড়ী মহাশয় পালন করিয়াছিলেন।

তিনি চাহিতেন, আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি সাধন করিয়া শিষ্যেরা প্রধানত যেন গৃহাশ্রমেই বাস করে। সন্ন্যাস নিতে সাধনার্থীদের প্রায়ই

তিনি বারণ করিতেন, সতর্ক করিয়া কহিতেন, "সন্ন্যাস জীবন বড় কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ। তোমরা মনে রেখো, সংসারাশ্রমীর ভুল-ভ্রান্তির কিছুটা হয়তো ক্ষমা আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর ভুলের কোনো ক্ষমা নেই।"

এই সব গৃহী ভক্ত ও শিষ্য ছাড়া লাহিড়ী মহাশয়ের সর্বত্যাগী ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী শিষ্যও কম ছিল না।

'কাশীর বাবা' বা 'যোগীরাজ'রূপে অতঃপর তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়া উঠেন। উচ্চ ও নীচ, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের মুমুক্ষু মানুষের জন্যই তাঁহার কৃপার দুয়ার থাকিত সদা উন্মুক্ত।

নিরক্ষর সিপাহী বৃন্দা ভকত যেমন তাঁহার পরমাশ্রয়ে আসিয়া যোগসিদ্ধ মহাপুরুষে রূপান্তরিত হয়, তেমনই আব্দুল গফুর খাঁ নামক এক দরিদ্র মুসলমান ভক্তও তাঁহার সাধন পাইয়া উন্নত অবস্থা লাভ করে। দীন দরিদ্র কাশীবাসীরা যেমন সাধনকামী হইয়া তাঁহার কাছে আশ্রয় নিত, তেমনি দেখা যাইত কাশীর নৃপতি ঈশ্বরীনারায়ণ সিংহের মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও দীনভাবে হইতেন তাঁহার শরণাগত।

গৃহস্থ ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট সন্ন্যাসী সাধকদের আনাগোনাও তাঁহার নিকট কম ছিল না। ত্যাগী সাধকদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে দেওঘরের শ্রীমৎ বালানন্দ ব্রহ্মচারী ও কাশীর ভাস্করানন্দ সরস্বতীর নাম উল্লেখযোগ্য।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বহু ধরনের শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া লাহিড়ী মহাশয় কাশীধামে বসবাস করিতে থাকেন এবং তুই মহা-জীবনের শেষ দশটি বৎসর ভরিয়া উঠে বিস্ময়কর যোগবিভূতি ও করুণার অপরূপ মাধুর্যে। ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম-কেন্দ্র কাশীধামের পটভূমিকায় যোগীরাজের বহুতর অলৌকিক লীলা দিকে দিকে বিস্তারিত হইতে থাকে। এ লীলার কাহিনী আজিও জনমানসে জাগরূক রহিয়াছে।

লাহিড়ী মহাশয় তখন কাশীর গরুড়েশ্বর মহল্লায় বাস করিতেছেন। অন্তরঙ্গ শিষ্য যুক্তেশ্বর প্রায় প্রত্যহই গুরুদেবকে দর্শন করিতে যান। রাম তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিনিও প্রায়ই তাঁহার সঙ্গী হন। যোগীরাজের সঙ্গলাভে ও উপদেশাদি শ্রবণে পরম আনন্দে তাঁহাদের দিন কাটে।

হঠাৎ একদিন রাম কলেরায় আক্রান্ত হন। রোগের ধরণটি বড় মারাত্মক—একেবারে এসিয়াটিক কলেরা। ভীত সন্ত্রস্ত যুক্তেশ্বর গুরুদেবের নিকট ছুটিয়া গেলেন। স্বাভাবিক ও সাংসারিক রীতি অনুযায়ী লাহিড়ী মহাশয় রোগের চিকিৎসায় সুদক্ষ ডাক্তারদেরই ডাকিতে বলিতেন। এক্ষেত্রেও তাহাই বলিলেন।

শহরের দুইজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত, কিন্তু চিকিৎসায় কোনো ফল হইতেছে না। ডাক্তারেরা শেষটায় হতাশ হইয়া জানাইয়া দিলেন, এ রোগী আর বড় জোর দুই ঘণ্টা বাঁচিতে পারে।

যুক্তেশ্বর আবার গুরুদেবের উদ্দেশে ছুটিলেন। রামের সংকটাপন্ন অবস্থার কথা তাঁহাকে জানানো হইল। কিন্তু আসনে উপবিষ্ট যোগীর প্রশান্ত আননে কোনো ভাবান্তরই দেখা গেল না।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে যুক্তেশ্বর তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় শুধু ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "যাও, ভয় কি ? ডাক্তারেরা তো দেখছেন।"

গৃহে ফিরিয়া যুক্তেশ্বর শুনিলেন, রোগীর আর কোনো আশা নাই, একথা বলিয়া ডাক্তারেরা বিদায় নিয়াছেন।

মৃত্যু আসন্ন। ভক্তপ্রবর রাম একবার ক্ষীণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ভাই, গুরুদেবকে বোলো—আমি চললুম। একটা প্রার্থনা আমার। দাহ করবার আগে আমার এ স্থূল শরীরকে তিনি যেন পায়ের ধুলো দিয়ে ধন্য করেন।"

মুহূর্তমধ্যে রামের শ্বাস বন্ধ হইয়া গেল। এবার নিষ্প্রাণ দেহটি ঘরের মেজেতে ফেলিয়া রাখিয়া যুক্তেশ্বর আবার গুরু সন্নিধানে ছুটিয়া গেলেন।

লাহিড়ী মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, "কি হে, কি খবর? রাম এখন কেমন আছে বলতো?"

শোকাতুর যুক্তেশ্বর এইবার একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। ক্রন্দনের বেগ আর বাঁধ মানিতে চায় না। ফোঁপাইয়া কহিলেন, "গুরুদেব! এবার স্বচক্ষে দেখবেন আসুন, সে কেমন আছে। তাকে শ্মশানে নেবার উদ্যোগ চলছে।"

"শান্ত হও!" প্রশান্ত কণ্ঠে একথা বলিয়া যোগীবর নয়ন নিমীলিত করিলেন। ধ্যানাবিষ্ট মূর্তিটি বহুক্ষণ আসনের উপর নিস্পন্দ হইয়া রহিল। তারপর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে একটি শিশিতে নিকটস্থ প্রদীপের কিছুটা রেড়ীর তেল ঢালিয়া নিলেন। এটুকু যুক্তেশ্বরের হাতে দিয়া বলিলেন, "যাও, এখনি রামকে পান করিয়ে দাও!"

যুক্তেশ্বরের মুখে কোনো কথা সরিতেছে না। কাহাকে ইহা পান করাইবেন? রামের মৃত্যু যে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানসপটে ফুটিয়া উঠিল—গুরুদেব ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ, তাঁহার তো কখনো কোনো ভুল হয় না! তবে?

নির্দেশমতো কাজ অবশ্যই করিতে হইবে। তখনি পাগলের মতো ঘরের দিকে ছুটিলেন। কিন্তু রামের দেহ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই। তবুও কোনোমতে মুখটি ফাঁক করিয়া কয়েক ফোঁটা তেল ঢালিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর যে অলৌকিক ঘটনা ঘটিল তাহাতে উপস্থিত সকলে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া গেলেন।

সর্বসমক্ষে রামের নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহটি ধীরে ধীরে নড়িয়া উঠিল, ক্রমে তিনি চেতনা লাভ করিলেন।

সুস্থ হইবার পর রাম এদিনকার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন।—সে সময়ে তিনি দেখিতেছিলেন, এক জ্যোতির্ময় পুরুষরূপে লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার শিয়রে দণ্ডায়মান। আননে স্নিগ্ধ মধুর হাসি ছড়াইয়া শান্ত স্বরে সস্নেহে যোগীরাজ বলিতেছেন, "রাম, আর কত ঘুমোবে? জেগে ওঠো, তারপর যত শিগ্‌গীর পারো আমার কাছে এসে উপস্থিত হও।"

যুক্তেশ্বর বলিয়াছেন, পুনর্জীবন লাভের এ ঘটনাটি স্বচক্ষে না দেখিলে ইহা তাঁহার নিকট নিতান্তই এক আষাঢ়ে গল্প বলিয়া প্রতীয়মান। তিনি সবিস্ময়ে সেদিন আরো দেখিলেন, রাম ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়াছেন, শুধু তাহাই নয়, জামা-কাপড় পরিয়া নিয়া গুরুদেবের নিকট যাইতেও তিনি উদ্যত।

উভয় বন্ধু অতঃপর একযোগে গাড়ি করিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট উপনীত হন।

কৌতুকোজ্জ্বল হাসি ছড়াইয়া যোগীরাজ বলিলেন, "যুক্তেশ্বর, এখন থেকে মৃতদেহ দেখলেই তাড়াতাড়ি এক বোতল রেড়ীর তেল তুমি সংগ্রহ ক'রে ফেলবে। স্বচক্ষে দেখলে তো, এর কয়েক ফোঁটা যমকেও পরাস্ত করতে পারে!"

লাহিড়ী মহাশয়ের এই পরিহাস শুনিয়া উপস্থিত সকলেই হাস্য করিতেছেন। কিন্তু যুক্তেশ্বরের তখন আসল ব্যাপারটি বুঝিতে বাকি নাই। যোগীরাজ লৌকিক রীতি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ব্যাঘাত জন্মাইতে চাহেন নাই—ডাক্তারদেরও যথেষ্ট সুযোগ তিনি দিয়াছেন। আর একথাও সত্য যে, তাঁহার ঐ রেড়ীর তেলের গুরুত্ব কিছু নাই, উহা একটি উপলক্ষ মাত্র।

যুক্তেশ্বরের অন্তরে ছিল রোগনাশক ঔষধ পাইবার জন্য একটা প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা। ঐ ইচ্ছাটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গুরুদেব সেদিন তাঁহাকে ঐ তেলটুকু প্রদান করেন। হাতের কাছে এ বস্তুই তাড়াতাড়ি তখন পাওয়া গিয়াছিল, এবং অবলীলায় তাহাই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে তাঁহার অসামান্য যোগবিভূতির বলে।

আশ্রিত শিষ্যদের জন্য যোগীরাজের করুণা ছিল অপরিসীম। সর্বদা তাহাদের রক্ষার জন্য তিনি সজাগ ও সক্রিয় থাকিতেন। অভয়া নামে তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্যা ছিলেন। তাঁহার স্বামী কলিকাতার এক বিশিষ্ট উকিল। এই দম্পতির আটটি সন্তান একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অভয়া একদিন গুরুর চরণ ধরিয়া মিনতি

করিতে থাকেন, নবম সন্তানটির যেন জীবন রক্ষা হয়—এ কৃপা বাবাকে করিতেই হইবে।

আশ্রিত-বৎসল লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা—তাই হবে। এবার তোমার একটি মেয়ে হবে এবং সে ভালভাবে বেঁচেও থাকবে। কিন্তু আমার একটা বিশেষ নির্দেশ পালন করতে তোমাদের যেন ভুল না হয়। শিশুটির জন্ম হবে রাত্রির প্রথম ভাগে। তখন থেকে সূর্যোদয় অবধি ঘরের ভিতর একটি তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু সাবধান! সূতিকাগারের কেউ যেন ঘুমিয়ে না পড়ে, বাতিটি কখনো যেন নিভে না যায়।"

বৎসরখানেক পরে এই শিষ্যার একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। গুরুদেবের কথাটি কেউ ভুলেন নাই, ঘরে একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা হইল। কিন্তু শেষ রাত্রে প্রসূতি ও ধাত্রী উভয়েই কখন ঘুমাইয়া পড়িলেন। দীপাধারের তেল ক্রমে ফুরাইয়া আসিয়াছে। শিখাটি নির্বাণোন্মুখ।

হঠাৎ এসময়ে সূতিকাগারে ঘটে এক অলৌকিক কাণ্ড! হাওয়ার ঝট্‌কায় বন্ধ দ্বারটি খুলিয়া যায় এবং নিদ্রোত্থিতা অভয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখেন, গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয় স্বয়ং কক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

স্তিমিত দীপশিখার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যোগীরাজ বলিতেছেন, "অভয়া, করছো কি? তাড়াতাড়ি ঐ দিকে চেয়ে ছাখো, বাতি কিন্তু নিবে যাচ্ছে।"

ত্রস্তব্যস্তে উঠিয়া শিষ্যা দীপাধারে তেল ঢালিয়া দিলেন। ততক্ষণে গুরুদেবের করুণাঘন মূর্তি অদৃশ্য হইয়াছে!

এই মহিলাটি একবার লাহিড়ী মহাশয়কে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া কলিকাতা হইতে কাশী যাইতেছেন। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই বেনারস এক্সপ্রেস ছাড়িয়া দিল, গাড়িতে ওঠা আর সম্ভব হইল না। শিষ্যার অন্তর বেদনায় গুমরিয়া উঠিল, যোগীরাজের পবিত্র মূর্তিখানি স্মরণ করিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

হঠাৎ দেখা গেল, প্ল্যাটফর্মের অনতিদূরে ট্রেনটি কেন যেন থামিয়া

গিয়াছে, চালক এবং ইঞ্জিনীয়ার যান্ত্রিক গোলযোগের কোনো কারণই খুঁজিয়া পাইতেছে না। অভয়া তখনি ছুটিয়া গিয়া মালপত্রসহ কামরায় উঠিয়া বসিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তিনি স্থির হইয়া বসার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটি চলিতে আরম্ভ করিল।

কাশীধামে পেঁ ৌছিয়া লাহিড়ী মহাশয়কে প্রণাম করা মাত্র তিনি স্মিত হাস্যে শিষ্যাকে বলিলেন, "দ্যাখো আর একটু আগে রওনা হয়ে গাড়ি ধরতে হয়। কত ঝঞ্ঝাটেই যে তোমরা আমায় ফেলতে পার! বলো দেখি, পরের ট্রেনে কাশীতে পেঁ ৌছলে তোমাদের কি এমন ক্ষতি হত? আর এত কাঁদতেও তোমরা পারো।"

স্বামী কেবলানন্দজী লাহিড়ী মহাশয়ের এক দীক্ষিত শিষ্য, প্রায়ই তিনি ভাস্করানন্দ সরস্বতীর কাছে গিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেন। ভাস্করনন্দজী কি রূপে যোগীরাজ শ্যামাচরণের নিকট হইতে কয়েকটি বিশেষ যোগসাধন প্রাপ্ত হন, কেবলানন্দ তাহার বিবরণ দিয়াছেন। শ্যামাচরণ মহাযোগী বাবাজী মহারাজের শিষ্য, তাঁহার নিগূঢ়সাধনের তিনি অধিকারী—এ কথাটি ভাস্করানন্দজীর জানা ছিল। তাঁহার নিকট হইতে উচ্চতর কয়েকটি যোগক্রিয়া শিক্ষা করার জন্য এ সময়ে তিনি উদ্‌গ্রীব হন। তাঁহার আশ্রমে আসিবার জন্য যোগীরাজকে একদিন আমন্ত্রণও জানান।

কেবলানন্দজীর কাছে এ আমন্ত্রণের কথা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় রহস্যভরে বলেন, "দ্যাখো হে, পিপাসা পেলে তৃষ্ণার্ত লোকই তো কুয়োর কাছে ছুটে যায়। কুয়ো কি কখনো এজন্য তার স্থান থেকে এগিয়ে আসে?"

কিছুদিন পরে এক নির্জন বাগানে বেড়াইতে গিয়া হঠাৎ উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। কৃপালু লাহিড়ী মহাশয় এ সময়ে ভাস্করানন্দ স্বামীকে আলিঙ্গন দেন, কয়েকটি নিগূঢ় যোগসাধনও তাঁহাকে প্রদান করেন।

যোগীরাজের পত্নী কাশীমণি দেবীর নিকট তাঁহার স্বামীর অত্যাশ্চর্য

যোগবিভূতি সম্বন্ধে নানা কাহিনী শুনা যাইত। উত্তরকালে আচার্য যোগানন্দ মহারাজ এগুলি সংকলন করিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মজীবনীতে তাহার কিছু কিছু তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে।

হঠাৎ একদিন গভীর রাতে কাশীমণি দেবীর ঘুম ভাঙিয়া যায়। চাহিয়া দেখেন, সমস্ত কক্ষটি উজ্জ্বল আলোকে ভরিয়া গিয়াছে, আর গৃহের এক কোণে পদ্মাসনযুক্ত যোগীরাজ ভূমি হইতে উর্ধ্বে উত্থিত হইয়া শূন্যে অবস্থান করিতেছেন।

কাশীমণি তো বিস্ময়ে হতবাক্। ভাবিতে লাগিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন না তো!

যোগীরাজ এবার পত্নীকে আরও বিস্মিত করিয়া মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "না গো না। এ তোমার ভ্রম নয়, আর স্বপ্নে দেখা কোনো দৃশ্যও নয়। অনেকদিন তো কেটে গেল। এবার তোমার এ তামস নিদ্রা থেকে জেগে ওঠো—চিরকালের জন্য তুমি জাগো!"

লাহিড়ী মহাশয়ের দেহটি অতঃপর ধীরে ধীরে শূন্য হইতে নিম্নস্থ আসনে অবতরণ করে। স্বামীর চরণতলে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া কাশীমণি সেদিন সাধন প্রার্থিনী হন এবং যোগীরাজও সানন্দে তাঁহাকে দান করেন দীক্ষা ও যোগসাধনা।

কোনো এক ভক্তিমতী শিষ্যা সেবার লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার একখানি ফটো চাহিয়া নেন। এটি তাঁহাকে দিবার সময় লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, "যদি সত্যই ভক্তি-বিশ্বাস করো ও মানো তো এটাই হবে এক পরমাশ্রয়, আর না মানো তো নেহাত সাধারণ ছবি মাত্র।"

কিছুদিন পরের কথা। একদিন সন্ধ্যায় মহিলাটি অপর এক গুরুভগ্নার সহিত বসিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। সম্মুখের টেবিলে লাহিড়ী মহাশয়ের ছবিটি স্থাপিত রহিয়াছে। হঠাৎ এ সময়ে সেদিন প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হয় এবং ঐ গৃহে বজ্রপাত ঘটে।

যে গ্রন্থটি পাঠ করা হইতেছিল তাহা বিদ্যুৎ-এর আগুনে দগ্ধ হয়,

কিন্তু মহিলা দুইটি বড় অদ্ভুতভাবে গুরুকৃপায় বাঁচিয়া যান। দুর্ঘটনার সময়ে বিচিত্র এক অনুভূতি তাঁহাদের হয়। গুরুদেবের কল্যাণশক্তি যেন তাঁহার ফটো হইতে নির্গত হয় এবং বরফের একটি প্রাচীর তুলিয়া তড়িৎ-বজ্রের আঘাত হইতে তাঁহাদের রক্ষা করে।

লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য কালীকুমার রায় মহাশয় তাঁহার গুরু সম্বন্ধে নানা মনোজ্ঞ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি ঠাকুরের কাশীধামস্থ গৃহে গিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাইয়া আসিতাম। তখন দেখিতাম—বহু সাধু-সন্ত, দণ্ডী সন্ন্যাসী গভীর রজনীতে নিঃশব্দে তাঁহার চরণোপান্তে উপনীত হইতেন। উচ্চতম জ্ঞানতত্ত্ব ও দুরূহ যোগসাধনের নানা প্রণালী তাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত গুরুদেবের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছেন, ইহাও দেখিতাম। এই আগন্তুকের দল আবার প্রত্যূষ হইলেই গোপনে কোথায় সরিয়া পড়িতেন। অনেক সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহ শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিদ্রিত হইতে আমরা দেখি নাই।"

এক বিরাট অধ্যাত্মশক্তির উৎসরূপে যোগীরাজ লাহিড়ী মহাশয় তখন অধিষ্ঠিত। অধ্যাত্ম-সাধন ও যোগশক্তির অমৃত ভাণ্ডখানি তিনি জনকল্যাণের জন্য ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। ভক্ত, মুমুক্ষু ও যোগসাধনপ্রাপ্ত সাধকদের যে কেহ এ মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিত, অপার্থিব পুণ্যধারায় হইত সে অভিসিঞ্চিত। শুধু তাহাই নয় তাঁহার দর্শন ও স্পর্শন তৎকালে অগণিত নরনারীর আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধন করিয়া দিত।

এইসব দর্শনার্থীর মধ্যে অবিশ্বাসী লোকও হয়তো কিছু কিছু আসিত। কিন্তু তাহাতে লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যবহারে প্রায়ই কোনো তারতম্য ঘটিত না। তবে মাঝে মাঝে দুষ্টপ্রকৃতির অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের মাঝে মাঝে তিনি শাস্তি দিতে ছাড়িতেন না। যোগপন্থার মর্যাদা রক্ষার জন্য সদা নির্লিপ্ত, ধ্যানতন্ময়, যোগীবরকে মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া উঠিতে দেখা যাইত। তাঁহার শিষ্য কালীকুমার রায় ইহার এক কাহিনী শুনাইয়াছেন :

কালীকুমারবাবু অল্প কিছুদিন হয় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন এবং গুরু-নির্দেশিত সাধনপথে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার অফিসের মনিবটি কিন্তু এসব তেমন পছন্দ করেন না। তাই লাহিড়ী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রায়ই নানা ঠাট্টা বিদ্রূপ তিনি করিতেন।

কালীকুমারবাবুর পিছনে পিছনে ভদ্রলোকটি একদিন লাহিড়ী মহাশয়ের গরুড়েশ্বর মহল্লার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। আগমনের উদ্দেশ্য, যোগীরাজের সাধনপ্রণালীকে অসার প্রতিপন্ন করা এবং তাঁহাকে কিছুটা অপমান করিয়া যাওয়া।

লাহিড়ী মহাশয়কে ঘিরিয়া কক্ষমধ্যে দশ-বারজন ভক্ত বসিয়া আছেন। আগন্তুক তাঁহাদের সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

তিনি আসন গ্রহণ করা মাত্রই যোগীরাজ নয়ন উন্মীলন করিলেন, ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তোমরা কি আজ একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে চাও ?"

প্রস্তাব শুনিয়া সবাই মহা উৎসাহী। ঘরটি তখনই অন্ধকার করা হইল এবং লাহিড়ী মহাশয়ের যোগশক্তির বলে ভক্তদের নয়ন সমক্ষে এবার ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল একটি অলৌকিক দৃশ্য।

সকলে দেখিতে লাগিলেন—একটি সুন্দরী তরুণী লালপাড় শাড়ি পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কালীকুমারবাবুর মনিবকে ডাকিয়া লাহিড়ী মহাশয় এবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "দেখুন তো, মশাই, এই রমণীকে আপনি চিনতে পারছেন কিনা ?"

আগন্তুকের যত কিছু বীরত্ব ও বিদ্রূপের উৎসাহ ততক্ষণে নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে। ভীত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এটি আমার পরিচিত।" সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যটি অন্তর্হিত হইল।

ভয়ে, লজ্জায় ভদ্রলোকটি ইতিমধ্যে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন। সকলের সমক্ষে এবার তিনি সব কিছু অকপটে স্বীকার করিলেন। তরুণীটি তাঁহার উপপত্নী। নিজের স্ত্রী-পুত্র রহিয়াছে, অথচ এই নারীর পিছনে মূর্খের মতো তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চলিয়াছেন।

যোগীরাজের অধ্যাত্মপ্রভাব এবং যোগবিভূতির এই বিচিত্র প্রকাশ

তাঁহার অন্তরে তুলিয়া দিয়াছে এক তীব্র আলোড়ন। সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপের জালাও কম হয় নাই। জোড়হস্তে, অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "বাবা, আপনি আমায় ক্ষমা করুন, এ পাপমোহ থেকে আমায় রক্ষা করুন। দয়া ক'রে দীক্ষা দিয়ে শ্রীচরণে আমায় চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিন।"

অন্তর্যামী যোগীবর কিন্তু বুঝিয়াছেন, ভদ্রলোকটির এই আর্তি ও অনুশোচনা সাময়িক মাত্র। দীক্ষার প্রস্তুতি ও অধিকার যাঁহার নাই তাঁহাকে কি করিয়া তিনি গ্রহণ করিবেন ?

উত্তরে শুধু কহিলেন, "বেশ তো, আগামী ছয় মাস কাল যদি আপনি সংযত হয়ে থাকতে পারেন, তবে আপনার আশা পূর্ণ হবে, আপনাকে আমি সাধন দেবো।"

উচ্ছৃঙ্খল লোকটির সে সৌভাগ্য আর হয় নাই। কোনোক্রমে প্রায় তিন মাস কাল সংযত জীবনযাপন করার পর ঐ রমণীটির সহিত আবার তিনি মিলিত হন এবং ইহার দুই মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। যোগীরাজ কেন সেদিন তাঁহার অনুরোধ এড়াইয়া গিয়া ছয় মাস পরে তাঁহাকে দীক্ষা দানের কথা বলিয়াছিলেন, সে কথার তাৎপর্য তখন বুঝা গেল।

বিপুল যোগবিভূতির ঐশ্বর্য লাহিড়ী মহাশয় লাভ করেন, কিন্তু এ ঐশ্বর্য তিনি বহন করিয়া চলিতেন নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে ও সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত সচরাচর তাঁহাকে ইহা প্রকাশ করিতে দেখা যাইত না। কখনো দুষ্টের দমনে, আবার কখনো বা নিতান্ত লীলাচ্ছলে তাঁহার যোগসামর্থ্য লোকলোচনের সম্মুখে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিত। মুমুক্ষু ভক্তদের প্রত্যয়কে দৃঢ় করার জন্যও অনেক সময় বিভূতিলীলা তিনি প্রদর্শন করিতেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিবেশী এক যুবক সেদিন তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। ইহার নাম চন্দ্রমোহন দে, সবেমাত্র ডাক্তারী পাস করিয়া বাহির হইয়াছেন। যোগীরাজ তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন,

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আলোচনায় বসিয়া নূতন ডাক্তার চন্দ্রমোহনের উৎসাহের অন্ত নাই— আধুনিক দেহ-বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব তিনি বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

যোগীবর কহিলেন, "আচ্ছা, চন্দ্রমোহন, তোমাদের এই ডাক্তারী শাস্ত্র মতে মৃতের কি সংজ্ঞা রয়েছে, বলতো ?" তারপর কৌতুকভরে বলিয়া বসিলেন, "আচ্ছা, তুমি আমায় পরীক্ষা ক'রে বল দেখি, আমি সত্য সত্যই মৃত—না জীবিত ?"

চন্দ্রমোহন তো তাঁহার দেহটি পরীক্ষা করিয়া একেবারে হতবাক্। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার কোনো লক্ষণই নাই, হৃৎপিণ্ড নিঃশব্দ নিশ্চল! সারা দেহে তাঁহার কোথাও প্রাণের কোনো চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

কিছুক্ষণ পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া লাহিড়ী মহাশয় তরুণ ডাক্তারকে বলিলেন, "দ্যাখো চন্দ্রমোহন, একটা কথা স্মরণ রাখবে। দৃশ্যমান জগতের জ্ঞানের বাইরে, অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মলোকের অনেক তত্ত্ব ও তথ্যই আমাদের জানবার রয়েছে। তোমাদের আধুনিক বিজ্ঞান তার সীমিত জ্ঞান নিয়ে যেখানে যেতে পারে না, ভারতীয় সাধকদের যোগ-শক্তি কিন্তু অবলীলায়ই সেখানে পৌঁছাতে পারে।"

চন্দ্রমোহনের সেদিনকার এ বিস্ময় চিরদিনের শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। উত্তরকালে তিনি এক যশস্বী চিকিৎসকরূপে পরিচিত হইয়া উঠেন আর লাহিড়ী মহাশয়ের সেদিনকার এই লীলার সূত্রটি ধরিয়া তাঁহার জীবন ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইয়া যায়। অধ্যাত্ম-সাধনার পথে তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।

যোগীরাজ কখনো নিজের প্রতিচ্ছবি উঠাইতে সম্মত হইতেন না। একবার শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী গুরুদেবের ফটো উঠাইতে বড় ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কাশীর সুদক্ষ ফটোগ্রাফার গঙ্গাধরবাবুকে আহ্বান করা হয় এবং বহু অনুনয়ে যোগীরাজকে সম্মত করানো যায়।

ক্যামেরার সম্মুখে গিয়াই লাহিড়ী মহাশয় বালকের মতো যন্ত্রটির নির্মাণ-কৌশল ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। ফটো-

গ্রাফারও মহা উৎসাহী, তাঁহাকে যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝাইতে লাগিলেন।

ছবি গ্রহণের সময় ফটোগ্রাফার কিন্তু মহাবিপদে পড়িলেন। যোগীরাজের ছবিটি কি জানি কেন, তাঁহার ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডারে এতটুকুও প্রতিফলিত হইতেছে না। বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, কোনো যান্ত্রিক গোলযোগের চিহ্নমাত্র নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয়—অপর কোনো লোক ক্যামেরার সম্মুখে বসামাত্র তাঁহার ছবি ঠিকমতোই প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু যোগীরাজের প্রতিরূপ কেন দেখা যাইতেছে না ?

সম্ভাব্য কোনো কারণের সন্ধান না পাইয়া ফটোগ্রাফার একেবারে মুষড়িয়া পড়িয়াছেন।

কৌতুকী লাহিড়ী মহাশয় এতক্ষণ নীরবে বসিয়া চতুর হাসি হাসিতেছিলেন। এবার প্রশ্ন করিলেন, "কিগো, এ বিষয়ে তোমাদের বিজ্ঞানের কি বক্তব্য আছে, বল দেখি ?"

সুদক্ষ, অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার একেবারে হতাশ হইয়া গিয়াছেন। কাতরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দূর হোক আমাদের বিজ্ঞান! আমি এবার আপনার চরণেই শরণ নিচ্ছি। আপনি ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন, আর ছবিটা তুলে নিয়ে আমিও আমার মান বাঁচাই। আপনি একবার দয়া করুন!"

লাহিড়ী মহাশয় মুচকি হাসিয়া আবার ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। অমনি দেখা গেল, তাঁহার ছবি ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডার-এ নিখুঁতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে ছবিটি সেদিত গৃহীত হয়, সেটি হইতেই লাহিড়ী মহাশয়ের বহুলপ্রচারিত তৈল চিত্রখানি অঙ্কিত হইয়াছিল।

সাধনহীন লোকদের শূন্যগর্ভ ধর্মালোচনায় যোগীরাজ কোনোদিন উৎসাহ প্রদান করিতেন না। আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম ও ধ্যান-ধারণার নিগূঢ় যৌগিক ক্রিয়াদির উপরই তিনি গুরুত্ব দিতেন বেশী।

"ধ্যান-লোকের প্রত্যক্ষ অনুভূতি আস্বাদন করো ও পরমাত্মার দর্শন লাভে উদ্‌বুদ্ধ হও"—দর্শনার্থীদের কাছে ইহাই ছিল তাঁহার উপদেশের মূল কথা।

যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে তিনি নিজে বিচরণ করিতেন, শিষ্য-ভক্তদের মধ্যে তাহারই তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। যোগীরাজের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বর্ণনা ছিল জীবন্ত। তাই অতি সহজে ইহা অন্তরঙ্গ ভক্তদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগাইয়া তুলিত।

লাহিড়ী মহাশয় সেদিন ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। কথাপ্রসঙ্গে ভগবদ্‌গীতার দুই চারিটি শ্লোক তিনি মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ কেন যেন তিনি থামিয়া গেলেন। তারপর বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা সকলে একটু চুপ ক'রে ব'স। আমি অনুভব করছি, বহু সংখ্যক নর-নারীর জীবন ও চেতনার সঙ্গে জড়িত হয়ে আমি নিজে জাপানের এক সমুদ্রাঞ্চলে ডুবে মরছি।"

কক্ষস্থ সকলে ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে দেখা গেল, লাহিড়ী মহাশয় ধীরে ধীরে পুনরায় তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পরদিন শিষ্যগণ সংবাদপত্রে পড়িলেন, জাপান[illegible]ী যাত্রীবাহী একটি জাহাজ উপকূলের নিকটে আসিয়া নিমজ্জিত হয়। এই দুর্ঘটনায় বহু আরোহীর প্রাণনাশ ঘটে।

সকলেই বুঝিলেন, ঐ নিমজ্জমান সমুদ্রযাত্রীদের মর্মবিদারী আর্তনাদই গতকাল যোগীরাজের অন্তর-সত্তায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। সর্বজীব ও সর্বভূতের অস্তিত্ব যে মহাচৈতন্যে বিধৃত, তাহারই সহিত যে যোগীরাজের অন্বয় সাধিত হইয়া গিয়াছে। সেদিনকার অলৌকিক দর্শনের মধ্য দিয়া লাহিড়ী মহাশয় শিষ্যদের মধ্যে এ সত্যকেই পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের প্রচারিত যোগসাধনা কোনোদিনই মানুষকে সংসারের কর্ম হইতে বিচ্যুত করিতে চাহে নাই। তাঁহার গুরুদেব বিশেষ করিয়া গৃহস্থ-জীবনের ক্ষেত্রেই যোগসাধনার বীজ বপনের

নির্দেশ দেন। তাই দেখা যাইত, লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে আসিয়া গৃহস্থ শিষ্যগণ সাধন-পথের বাধাবিঘ্নের কথা বলিলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। অবসরের অভাব, জীবনযুদ্ধের তীব্রতা—কোনো কিছু অসুবিধার কথাই তাঁহার নিকট গ্রাহ্য হইত না। সংসারাশ্রমে বাস করিয়া, দীর্ঘ চাকুরী জীবনে তিনি নিজেই তাঁহার এ আদর্শটি দেখাইয়া গিয়াছেন।

স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণের জন্যে তিনি যেমন কর্ম করিতেন তেমনি বারাণসীতে লোক-কল্যাণকর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের জন্যও তাঁহার তৎপরতা কম ছিল না। এ ধরনের ব্যক্তিগত বা সমাজগত দায়িত্বও তিনি কোনোদিন এড়াইয়া যান নাই।

বর্তমান যুগের পরিবেশে, গার্হস্থ্য জীবনকে অব্যাহত রাখিয়া, গোপনভাবে যোগসাধন করিতেই তিনি নির্দেশ দিতেন। তাঁহার নির্দেশিত পন্থায় অগ্রসর হইয়া বহুতর সাধক অপূর্ব যোগসামর্থ্য লাভ করিয়াছে, সমাজের স্তরে স্তরে অগণিত নীরব সাধনকামী মানুষের জীবন ভরিয়া উঠিয়াছে সার্থকতায়।

যোগীরাজের সাধন-পন্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য—তিনি কাহাকেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে দিতেন না। যে কোনো ধর্মের, যে কোনো শ্রেণীর সাধক তাঁহার সাধন ও আশ্রয় গ্রহণে সমর্থ ছিলেন। এজন্য কাহাকেও নিজের আচরিত ধর্ম বা সামাজিক আচার-আচরণ ত্যাগ করিতে হইত না। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকৃত পথিপ্রদর্শকের ভূমিকাটিই তিনি গ্রহণ করিতেন।

ঐশী করুণা ও লোক-কল্যাণের দীপশিখাটি দীর্ঘদিন জ্বালাইয়া রাখিবার পর আচার্য-জীবনের শেষ অঙ্কটি ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল। মহাপ্রয়াণের নির্ধারিত লগ্ন নিজে তিনি জানিয়াছেন, এবার সবাইকে প্রস্তুত করিতে হইবে। পত্নী কাশীমণিকে সেদিন বলিলেন, "ওগো ছাখো, আমার দেহত্যাগের সময় নিকটবর্তী হয়ে আসছে। কিন্তু তোমরা কেউ যেন আমার জন্য শোক ক'রো না।"

কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকটও তিন মাস পূর্বে তিনি তাঁহার

আসন্ন বিদায়ের কথা প্রকাশ করেন। এক ধরনের বিষাক্ত পৃষ্ঠব্রণ দ্বারা অতঃপর তিনি আক্রান্ত হন, আর এই রোগ উপলক্ষ করিয়াই মরদেহ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠেন।

যোগীরাজের দেহরক্ষার পূর্বে তাঁহার অন্যতম প্রিয় শিষ্য, স্বামী প্রণবানন্দজী কাশীধামের বাইরে অবস্থান করিতেছিলেন। গুরুদেবের অন্তিম অবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহার উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না। ত্রস্তব্যস্তে তিনি কাশী যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় লাহিড়ী মহাশয় এক অলৌকিক মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন।

কহিলেন, "প্রণবানন্দ, এত হুড়োহুড়ি ক'রে কাশীতে ছুটে যাবার কি প্রয়োজন : সেখানে আমার সঙ্গে তো তোমার সাক্ষাৎ হবে না! তুমি পৌঁছিবার পূর্বেই যে আমি এ দেহ ত্যাগ করবো

প্রণবানন্দজী শোকাভিভূত হইয়া কাঁদিতেছিলেন, যোগীরাজ তাঁহাকে অভয় দিয়া কহিতে লাগিলেন, "একি? ভয় কি? কাঁদছো কেন। আমি যে সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি। দেহ বিসর্জিত হলেও সদ্‌গুরুসত্তাকে তোমরা পাবে— প্রয়োজন মতোই পাবে।"

লাহিড়ী মহাশয়ের আর এক শিষ্য, স্বামী কেশবানন্দজীও এই সময়কার একটি অলৌকিক কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। গুরুদেবের তিরোধানের কয়েকদিন পূর্বে একদিন তিনি হরিদ্বারের এক কুটিরে বসিয়া আছেন। হঠাৎ এ সময়ে লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যোতির্ময় মূর্তিটি তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়।

দিব্যমূর্তি তাঁহাকে বলিয়া উঠেন, "বৎস, তুমি অবিলম্বে কাশীতে চলে এসো।" কথা কয়টি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এ মূর্তি অদৃশ্য হইয়া যায়।

কেশবানন্দ অবিলম্বে কাশীধামে চলিয়া আসিলেন। দেখিলেন, গুরুদেবের লীলা সংবরণের আর বেশী দেরি নাই, সেবানিষ্ঠ ভক্ত শিষ্যগণ দিবারাত্র তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন।

১৮৯৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর। লাহিড়ী মহাশয়ের কক্ষে কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত উপবিষ্ট। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, এ অবস্থায়ও ভগবদ্‌গীতার কয়েকটি প্রিয় শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মৃদু স্বরে তিনি ব্যাখ্যা করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ শিষ্যদের দিকে তাকাইয়া প্রশান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তাইতো, আমাকে যে এবার স্বস্থানে ফিরতে হবে!"

শোকাভিভূত শিষ্য ও ভক্তদের অশ্রুসজল দৃষ্টির সম্মুখে, ধীরে ধীরে উঠিয়া, পদ্মাসনে যোগীরাজ উপবিষ্ট হইলেন। এই আসনেই সমাধিমগ্ন অবস্থায় ঘটিল তাঁহার মহাপ্রয়াণ।

সমারোহের সহিত মরদেহটিকে গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকার ঘাটে আনিয়া সৎকার করা হইল। গুরুবিয়োগবিধুর শত শত ভক্ত শিষ্যের নয়নে বহিয়া গেল শোকাশ্রুর ধারা।

মরলোকের পরপারে অমৃতময় জ্যোতির্লোকে চলিয়া গিয়াছেন যোগীরাজ। সেই পরমধাম হইতেই এ সময়ে বিস্তারিত হয় তাঁহার অলৌকিক লীলা। একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার তিনজন বিশিষ্ট শিষ্য গুরুদেবের দিব্যদেহের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। জীবন ও মৃত্যুর দুরতিক্রম্য ব্যবধানকে ঘুচাইয়া দিয়া, শক্তিধর মহাযোগী এমনি করিয়াই অমৃতলোকের পরম তত্ত্বটি সেদিন উদ্‌ঘাটন করেন তাঁহার আত্মজনদের কাছে।

দ্রোণগিরির পর্বত কন্দরে, অলৌকিক কৃপার মধ্য দিয়া বাবাজী মহারাজ তাঁহার এই চিহ্নিত শিষ্যের সাধনজীবনে রোপণ করেন নিগূঢ় যোগসাধনার বীজ। শিবকল্প মহাপুরুষের উত্তর-সাধকরূপে মহাযোগী লাহিড়ী মহাশয়ও সমাজ ও গার্হস্থ্য-জীবনের স্তরে স্তরে ঐ বীজ ছড়াইয়া দিয়া যান। উদ্‌যাপন করেন, ঈশ্বরনির্দিষ্ট এক সুমহান্ ব্রত।

যোগীবর গম্ভীরনাথজী

নর্মদার বালুতট ধরিয়া সন্ন্যাসী হাঁটিয়া চলিয়াছেন। শিরে দীর্ঘ জটার ভার নামিয়া আসিলেও বয়সে তিনি তরুণ। দেহখানি সুঠাম সমুন্নত, অঙ্গকান্তি স্বর্ণাভ, আননে অপূর্ব মহিমার ব্যঞ্জনা। নয়ন দুইটি আনন্দের দ্যুতিতে ঝলমল করিতেছে। সহস্র সহস্র সাধু-সন্তের ভিড়ের মধ্যেও দিব্যশ্রীমণ্ডিত এ সাধককে হারানোর উপায় নাই।

প্রায় চার বৎসর পূর্বে এ পাদ-পরিক্রমার ব্রত তিনি গ্রহণ করেন। নর্মদার উৎসমুখে বিরাজিত অমরকণ্টকের মহাতীর্থ; সেখান হইতে যে যাত্রা শুরু হইয়াছে, সমুদ্রসঙ্গম ঘুরিয়া আবার সেই পুণ্যস্থলীতেই ঘটিবে তাহার পরিসমাপ্তি।

এ পথে তীর্থযাত্রী ও সাধুসন্তের চলার যেন বিরাম নাই। কখনো সাধু জমায়েতের মধ্যে, কখনো বা একাকী তরুণ সাধক অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। আপন আনন্দে নিরন্তর তিনি ভরপুর।

পুণ্যতোয়া তটিনীর নানা তীর্থে, নানা ঘাটে তাঁহাকে অবগাহন করিতে হয়। কখনো বা নদীতীরের বালুকা-গোফায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করেন ধ্যান ভজনে। মাঝে মাঝে পথে পড়ে দুর্গম সুদীর্ঘ অরণ্য। কোনো বিশেষ স্থানটি হঠাৎ কখনো ভাল লাগিলে সাধক সেখানে ঝুপড়ি বাঁধিয়া ফেলেন, আত্মসমাহিত হইয়া দু-দশদিন হয়তো কাটাইয়া দেন।

বেলা সেদিন প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে, সায়ংসন্ধ্যার আর বেশী দেরি নাই। তরুণ সন্ন্যাসীর চোখে পড়িল অনতিদূরে নদীতীরের কাছাকাছি এক ক্ষুদ্র পর্ণকুটির। নিতান্ত নির্জন পরিবেশ, নিকটে জনমানব কোথাও নাই। কোনো সাধু তপস্বী হয়তো এখানে সাধনভজনের জন্য কুটির বাঁধিয়া আছেন, আপাতত কার্যান্তরে গিয়া থাকিবেন।

কুটির-অঙ্গনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর তাঁহার ভরিয়া উঠে

এক অজ্ঞাত আনন্দে। এ কি স্থান-মাহাত্ম্য? না, তাঁহার নিজেরই সাধনজীবনের কোনো বিশেষ ধরনের অনুভূতি? কারণ যাহাই হোক, স্থির করিলেন, দু-চারদিন এখানে কাটাইয়া যাইবেন।

কিছুকাল বিশ্রামের পর কুটিরের এক কোণে আসন বিছাইয়া সন্ন্যাসী ধ্যানে বসিয়াছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে ঘটিল এক বিস্ময়কর কাণ্ড। হঠাৎ চোখ মেলিয়া দেখিলেন, এক বৃহদাকার সর্প, রাজ-গোখুরা ফণা বিস্তার করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সর্পটির পরবর্তী আচরণও বড় অদ্ভুত। নিস্পন্দ দেহে, স্থির দৃষ্টিতে, অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তরুণ সাধককে তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিল। তারপরেই ঘন অরণ্যের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল!

কোন্ দিব্যলোকের বার্তাবহ এই নাগরাজ? তাহার আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে দিব্য অনুভূতির তরঙ্গে আলোড়িত হইয়া উঠে সন্ন্যাসীর সর্বসত্তা।

উপর্যুপরি তিন দিন এখানে তিনি ধ্যান ও ভজনে অতিবাহিত করিতে থাকেন। আর আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিদিনই আসনে বসিবার সময় সর্পরাজ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। তারপর উহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়েন।

কুটিরের অধিকারী এবার কার্যান্তর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ইনি এক দুশ্চর তপস্যারত ব্রহ্মচারী, দীর্ঘদিন নর্মদাতীরে আপন সাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন।

অতিথি-সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সোৎসাহে জানাইলেন তিনি অভ্যর্থনা। কুশল প্রশ্নাদির শেষে, কথাপ্রসঙ্গে ঐ সর্পটির আচরণের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

নির্বাকভাবে কিছুক্ষণ তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, "ভাই, সাধক হিসাবে সত্যই আপনার ভাগ্যের সীমা নেই। গত বারো বৎসর যাবৎ এই নাগপ্রবরের দর্শনের আশায় আমি বসে রয়েছি, কুটির বেঁধে এখানে তাঁর জন্য দিন গুণছি। হয়তো পূর্বজন্মের তেমন সুকৃতি নেই, তাই এ দুর্লভ বস্তুর দর্শন আজ অবধি

ঘটে ওঠে নি। আসলে ইনি হচ্ছেন এক অসামান্য মহাপুরুষ, স্বেচ্ছায় সর্পাকৃতি ধরে বিচরণ করছেন সাধকদের কৃপা করবার জন্য। আপনি তিন দিনের ভিতর কি ক'রে এঁর কৃপালাভ করলেন, আমার কাছে তা সত্যিই এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য।"

নাগরূপী এই ছদ্মবেশী মহাপুরুষের আশীর্বাদ-ধন্য তরুণ সন্ন্যাসীটিই উত্তরকালের গম্ভীরনাথ বাবা। শুধু নাথ-যোগপন্থীদের নায়করূপেই নয়, সর্ব ভারতের এক সার্থকনামা যোগী ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষরূপেও এই মহাত্মার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সীমা ছিল না।

নাথযোগী সম্প্রদায় এ দেশে এক সুপ্রাচীন যোগসাধনার ধারাকে বহন করিয়া চলিয়াছেন। মহাযোগী গোরখ্‌নাথ হইতে এই বিশিষ্ট সাধনপ্রণালীর সূচনা। উত্তরকালে পরম্পরাক্রমে এই সম্প্রদায়টিতে বহু স্বনামধন্য যোগীর অভ্যুদয় ঘটে, এবং এই সব শক্তিধর মহা-পুরুষদের মাধ্যমে যোগসাধনার ধারাটি দিকে দিকে বিস্তারিত হয়। আজিও ভারতের দূর-দূরান্তে নাথপন্থী সাধকদের স্থাপিত মঠ, আশ্রম এবং যোগগুহা কম দেখা যায় না।

গোরখ্‌পুরের প্রসিদ্ধ গোরখ্‌নাথ মঠ এই সাধন-কেন্দ্রগুলির মধ্যে বিশিষ্টতম। বিশেষ করিয়া শিবকল্প যোগীবর গোরখ্‌নাথজীর স্মৃতি-বিজড়িত থাকায় ইহার মাহাত্ম্য অপরিসীম।

সুদূর অতীতে এক সময়ে গোরখ্‌নাথজী এ অঞ্চলে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। সে সময়ে এ স্থান ছিল গহন অরণ্য। উত্তরকালে তাঁহার তপঃক্ষেত্রটিকে কেন্দ্র করিয়াই মঠ ও মন্দির ইত্যাদি গড়িয়া উঠে। আজিকার দিনের গোরখ্‌পুর নগরী সেই পবিত্র সাধনস্থলীর চারিদিকেই ছড়াইয়া আছে।

গোরখ্‌পুর মঠের পূর্বেকার সে প্রসিদ্ধি আজ আর তেমন নাই। তপোনিষ্ঠ যোগপন্থী সাধকদের উপযোগী পবিত্র নির্জন পরিবেশও সেখানে আর পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও গোরখ্‌নাথ মঠ গুরুপরম্পরাক্রমে তাহার পূর্বতন গৌরব ও সাধন-ঐতিহ্য বহন

করিয়া চলিয়াছে। বৎসরের সব সময়েই তাই এখানে তীর্থকামী যাত্রী ও সাধুসন্তদের আনাগোনা। নাথযোগীদের কেন্দ্রস্থলরূপেও গোরখ্‌পুর মঠ সারা ভারতে সুপরিচিত।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের কথা। ভারতীয় যোগীসমাজে গোরখ্‌পুর মঠের প্রবীণ মোহান্ত বাবা গোপালনাথজীর তখন খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নাই। দূর-দূরান্ত হইতে আগত কত ভক্ত ও মুমুক্ষু তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া যোগসাধন করিয়া চলিয়াছেন।

আশ্রমের চারিদিকে ছড়ানো রহিয়াছে নির্জন বাগবাগিচা ও অরণ্য। মধ্যস্থলে বিরাজিত সুপ্রসিদ্ধ নাথজীর মন্দির। এই মন্দিরটি ঘিরিয়া কতকগুলি ছোট ছোট সাধনকুটির। যোগসাধনব্রতী সন্ন্যাসীরা এখানে আসন স্থাপন করিয়া বসিয়াছেন।

সেদিন এক সৌম্য সুদর্শন যুবক মঠের চত্বরে আসিয়া উপস্থিত। পরিধানে তাঁহার মূল্যবান সিল্কের শেরওয়ানি ও পায়জামা, চোখে মুখে অনন্যসুলভ মর্যাদার ছাপ। একবার দেখার পর চারুদর্শন, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, এই তরুণকে কোনোমতে বিস্মৃত হইবার উপায় নাই। আশ্রমের অনেকেরই উৎসুক দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল।

প্রথমে ভক্তেরা ভাবিয়াছিলেন, যুবক কোনো ধনী গৃহের সন্তান, পুণ্যকামী বা কৌতূহলী দর্শকরূপে এই মঠে বেড়াইতে আসিয়াছেন। দর্শনাদি শেষ হইলেও আবার স্বস্থানে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু তাঁহার ভাবভঙ্গী ও আচরণে তেমন কিছু বুঝা গেল না। নীরবে তিনি মোহান্ত-নিবাসে ঢুকিলেন ভাবতন্ময় হইয়া বহুক্ষণ বাবা গোপাল-নাথজীর-চরণোপান্তে রহিলেন উপবিষ্ট। তারপর যখন প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইলেন, জানা গেল, যোগীগুরুর চরণে চিরতরে তিনি করিয়াছেন আত্মসমর্পণ।

মুক্তির হাতছানি এই তরুণকে ঘরের বাহির করিয়া আনিয়াছে, আর সেখানে ফিরিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। গার্হস্থ্য জীবন তাঁহার

ধনজনে পূর্ণ, অভাব-অনটন এবং অশান্তি কিছুই নাই। অথচ চরম বৈরাগ্যময় জীবনকেই তিনি আজ গ্রহণ করিয়া বসিলেন। প্রবীণ সাধকদের সতর্কবাণী, কৃচ্ছ্রব্রত ও যোগসাধনার দুর্গম পথের কথা—সব কিছুই তাঁহার কানে পৌঁছিল, কিন্তু মর্মে প্রবেশ করিল না।

ঈশ্বর দর্শনের জন্য এই তরুণ ব্যাকুল হইয়াছেন, তাহাকেই বুঝিয়াছেন জীবনের চরম সার্থকতারূপে। এ লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হওয়ার কোনো প্রশ্নই তাঁহার কাছে নাই।

অতি অল্পকালের সান্নিধ্য ও কথাবার্তা, কিন্তু ইহারই মধ্য দিয়া বাবা গোপালনাথ সেদিন যুবদেকর অন্তর্লোকে কোন্ মহাবস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন তাহা কে বলিবে? কার্যত দেখা গেল, মুমুক্ষু তরুণের আত্মসমর্পণে যেমন বিলম্ব হয় নাই, যোগী গোপালনাথও তেমনি দ্বিধা করেন নাই তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে।

নাথ-যোগসাধনায় দীক্ষাদানের পর গুরু এই সৌম্য-দর্শন সাধকের নামকরণ করিলেন—গম্ভীরনাথ। নাম এবং নামীর একার্থ-বাচকতা খুব কম সাধকের জীবনেই এমন সার্থকভাবে, এমন অপরূপ মহিমায় ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে।

কাশ্মীর-জম্মুর একটি ক্ষুদ্র গ্রামে গম্ভীরনাথজী আবির্ভূত হন। বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি লালিত। ঐ দূর পল্লী অঞ্চলে তখনও শিক্ষার বিস্তার ঘটে নাই, তাই গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

বালক কিন্তু বড় প্রতিভাবান্। মোটামুটি লেখাপড়া ও খেলাধুলার সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ্যার চর্চাও তিনি কিছু কিছু করিতে থাকেন। ভজন গান ও সেতার বাদনে তাঁহার বেশ দক্ষতা ফুটিয়া উঠে। দেহখানিও তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্যের আধার—সুঠাম ও সুদৃঢ়। প্রিয়দর্শিতা ও পারদর্শিতার এক বিচিত্র সমাহার তাঁহার মধ্যে।

গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার ভালবাসা তাঁহার উপর বর্ষিত হইত, তেমনই তিনি নিজেও এক অনাবিল প্রেমের সম্বন্ধে সকলের সঙ্গে নিজেকে বাঁধিয়া নিয়াছিলেন। গ্রামের দুঃখী ও বিপন্নদের জন্য

তাঁহার সমবেদনার অন্ত ছিল না। তাহাদের সেবায় ও সাহায্যদানে কোনো দিনই তাঁহার তৎপরতার অভাব দেখা যায় নাই।

গম্ভীরনাথের সংসারে প্রাচুর্য যথেষ্ট, তাই জীবনের সুখসম্ভোগের নানা দ্বারই ছিল তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত। কিন্তু সেদিকে তাঁহার যেন কোনো আকর্ষণই নাই। এক স্বাভাবিক বৈরাগ্যের স্রোত ফল্গুধারার মতো নীরবে জীবনের অন্তস্তলে বহিয়া যাইতেছে। সহজাত অনাসক্তি এই বালক বয়স হইতেই যেন পরিপার্শ্ব হইতে তাঁহাকে একেবারে পৃথক করিয়া দিয়াছে। সমবয়স্ক বিদ্যার্থী ও খেলার সাথীরা তাই তাঁহাকে দেখে সম্ভ্রমের চোখে।

গ্রামের অদূরে এক মহাশ্মশান। কিশোর গম্ভীরনাথের বৈরাগ্য-প্রবণ মন প্রায়ই তাঁহাকে সেখানে টানিয়া আনে। চিতাধূম সমাচ্ছন্ন শ্মশানক্ষেত্রের এক প্রান্তে আত্মভোলা হইয়া তিনি নীরবে প্রহরের পর প্রহর বসিয়া থাকেন।

জটাজূটমণ্ডিত, ত্রিশূল-করোটিধারী সন্ন্যাসীর দল প্রায়ই শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হন। গম্ভীরনাথ পরম আনন্দে তাঁহাদের সেবায় তৎপর হইয়া উঠেন। আটা, ঘি ও ধুনির কাষ্ঠ সংগ্রহ প্রভৃতি কাজে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না। অবসর পাইলেই সাধকদের পদ-প্রান্তে ভাবতন্ময় হইয়া বসিয়া পড়েন। মন তাঁহার কোন্ অজানা লোকের সন্ধানে উধাও হইয়া পড়ে।

সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে একবার গিয়া বসিলে ভাবগম্ভীর গম্ভীরনাথের কোনো হুঁশই থাকে না। এক-একদিন সমস্ত রাতই নানা ধর্ম প্রসঙ্গে কাটিয়া যায়। বাড়ির লোকের তিরস্কার ও গঞ্জনা এজন্য কম সহ্য করিতে হয় না। কিন্তু তবুও অভ্যাসের পরিবর্তন হয় কই?

এই ভয়াল নির্জন শ্মশানে মন তাঁহার কি এক অজানা আকর্ষণে ছুটিয়া আসে। শ্মশানচারী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঘুরিবার ফলে জীবনের মূল্যবোধটি বদলাইয়া যায়—বৈরাগ্যময় জীবনের সহিত ধীরে ধীরে স্থাপিত হয় যোগাযোগ। সমর্থ সাধকপুরুষ দেখিলেই শ্রদ্ধাভরে

তিনি তাঁহার পরিচর্যায় রত হন, সাধনরহস্য শেখার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন।

মুক্তির নেশা ক্রমে তাঁহার কিশোর জীবনকে চঞ্চল, অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। মনে মনে স্থির করেন, যোগসাধনার মধ্য দিয়াই পরমসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু কিশোর মনে কেবলই প্রশ্ন জাগে, তপস্যার দুর্গম পথে কৃপাময় গুরুর আবির্ভাব তাঁহার জীবনে কবে হইবে ? কোথায় পাইবেন তাঁহার সন্ধান ?

তীব্র ব্যাকুলতা ও ঐশী কৃপা সদ্‌গুরুর সন্ধান অচিরেই আনিয়া দিল। গ্রামের ঐ শ্মশানে মাঝে মাঝে এক বৃদ্ধ যোগীর আগমন ঘটিত, গম্ভীরনাথও আন্তরিকভাবে ইঁহার সেবায় লাগিয়া যাইতেন। এই সর্বত্যাগী, সদা অন্তর্মুখীন সাধকের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। মহাত্মাটিও কৃপাপরবশ হইয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে কিছু কিছু সাধন-উপদেশ দান করিতেন।

গম্ভীরনাথ অবশেষে একদিন ইঁহার নিকটে দীক্ষা চাহিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, "বেটা, আমা হতে তোর দীক্ষা লাভ হবে না। তোর গুরু হচ্ছেন গোরখ্‌নাথ মঠের মোহান্ত, বাবা গোপালনাথ। সেই সিদ্ধ যোগীবরের চরণে তুই আশ্রয় গ্রহণ কর।"

মুক্তিসন্ধানী গম্ভীরনাথের জীবনের পরম লগ্নটি সেদিন নিকটে আসিয়া গিয়াছে। তাই বুঝি ঈশ্বর-প্রেরিত দূতরূপে যোগী সেদিন সেই ইঙ্গিতটি দিয়া গেলেন।

হৃদয়মধ্যে এক অব্যক্ত বেদনা কেবলই গুমরিয়া মরিতেছে। এই বেদনা সেদিন উদাসী গম্ভীরনাথকে সংসার হইতে টানিয়া বাহির করিল। গৃহের স্নেহনীড়, পল্লীজীবনের আনন্দময় পরিবেশ, সবকিছু তাঁহার কাছে সেদিন শুধু তুচ্ছ নয়, দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে।

বাবা গোপালনাথ উত্তর ভারতের এক মহাসমর্থ যোগী। অসামান্য ঋদ্ধি ও সিদ্ধিরই শুধু অধিকারী তিনি নন, বহু মুমুক্ষুরও তিনি পরমাশ্রয়। তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণের জন্য গম্ভীরনাথ সেদিন চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া আসেন।

মহাযোগী গোপালনাথের কৃপা তাঁহার তরুণ জীবনে নূতনতর অধ্যায় উন্মোচিত করিয়া দিল। নাথপন্থের নিগূঢ় যোগসাধনকে আশ্রয় করিয়া গম্ভীরনাথজী অগ্রসর হইয়া পড়িলেন তাঁহার পরম প্রাপ্তির পথে।

কিশোর সাধনার্থী যে একজন উত্তম অধিকারী, প্রথম সাক্ষাতেই তাহা বুঝিয়া নিতে বাবা গোপালনাথের ভুল হয় নাই। শুধু তাহাই নয়, দেহ ও মনের প্রস্তুতির দিক দিয়া এই তরুণ সাধক যে অনন্যসাধারণ, ইহাও তাঁহার দিব্যদৃষ্টির অগোচর রহে নাই। এবার যোগপন্থার সাধন ও সিদ্ধির ক্রমগুলি একের পর এক সযত্নে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে থাকেন। নবীন শিষ্যের সাধন নিষ্ঠাও ছিল অসাধারণ, এই নিষ্ঠার সহিত মিলিত হয় গুরুকৃপার সঞ্জীবনীধারা। প্রাক্তন যোগসংস্কারটি সাধকের অন্তরসত্তায় অতিসত্বর উজ্জীবিত হইয়া উঠে।

দীক্ষা গ্রহণের পর গম্ভীরনাথজী সোৎসাহে গুরু-প্রদত্ত, যোগসাধন আয়ত্ত করিতে থাকেন। কিছুদিন পরেই বাবা গোপালনাথজী তাঁহার শিষ্যের চুটিকাটা বা শিখা ছেদনের পবিত্র অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেন। নাথযোগীদের রীতি অনুযায়ী নবীন সাধককে 'অওঘর' শ্রেণীভুক্ত করিয়াও নেওয়া হয়। 'নাদ, সেলি ও কৌপীন' পরিধান করিয়া তিনি গ্রহণ করেন পূর্ণ সন্ন্যাসাশ্রম। নিষ্ঠাবান্ তরুণ সাধকের জীবনে এ সন্ন্যাস এক নূতনতর তাৎপর্য নিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

প্রিয়দর্শন, তপোনিষ্ঠ গম্ভীরনাথজীকে এ সময়ে যে দেখিত সে-ই আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। তাঁহার পূর্বাশ্রমের পরিচয় জানিতে অনেকেরই কৌতূহলের সীমা ছিল না। কিন্তু সব কিছু প্রশ্নের উত্তরে নবীন যোগীকে স্মিতহাস্যে শুধু বলিতে শুনা যাইত—"প্রপঞ্চ্ সে ক্যা হোগা ?" অর্থাৎ, মায়াময় সংসারের কথা জানবার কি প্রয়োজন ?

সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এবার সর্বময়কে পাইতে হইবে,—এই সংকল্পের দীপশিখাটিই গম্ভীরনাথজীর অন্তরে জ্বলিতেছে অহরহ।

কিন্তু সাধনভজন ও ধ্যানের গভীরে একান্তভাবে তিনি নিজেকে

ডুবাইয়া রাখিতে চাহিলে কি হইবে, গুরুজী তাঁহাকে কিছুকালের জন্য সেবাধর্মের কাজেই নিয়োজিত করিলেন। আশ্রমের নাথজীর অর্চনা, গুরু মহারাজের সেবাশুশ্রূষা ও অতিথি সাধু-সন্তদের আপ্যায়ন তাঁহাকে করিতে হয়। গো-মহিষের তত্ত্বাবধান ও আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশের ভারও তাঁহার উপর। মঠের নানা বৈষয়িক কাজকর্মেও এ সময়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইত। স্বল্পবাক্, গম্ভীরমূর্তি এ তরুণ সাধককে এতটুকু সময়ের অপব্যয় করিতে কেহ কখনো দেখে নাই। দৈনন্দিন কাজগুলি নীরবে ও নিষ্ঠা সহকারে সম্পন্ন করার পর গুরু-উপদিষ্ট সাধনায় তিনি নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন।

মঠ-মন্দিরের জনবহুল পরিবেশে, সেবা-পরিচর্যা প্রভৃতি কর্মের মধ্যে জড়িত এই তরুণ যোগী কিন্তু সদাই থাকিতেন অন্তর্মুখীন। বহিরঙ্গ জীবনের নানা চঞ্চলতার মধ্যে থাকিয়াও নির্লিপ্তি ও প্রশান্তি তিনি লাভ করিবেন—ইহাই ছিল গুরু গোপালনাথের কাম্য।

গম্ভীরনাথের এ সময়কার সাধননিষ্ঠা ও অগ্রগতি গোরখ্‌পুর মঠের নবীন প্রবীণ সব সাধুকেই বিস্মিত করিত।

নাথযোগীদের সাম্প্রদায়িক রীতিনীতি অনুযায়ী [illegible]কদের শেষ আনুষ্ঠানিক কাজ হইতেছে 'কর্ণবেধ'। যোগীশ্বর মহাদেবের প্রতীক-রূপে গুরু মহারাজ এই সময়ে শিষ্যের কর্ণে দুইটি কুণ্ডল পরাইয়া দেন। এই ধরনের কুণ্ডলকে বলা হয় 'দর্শনী'। নাথ সন্ন্যাসীদের কর্ণে ছিদ্র করিয়া এটি প্রবেশ করানো হয় বলিয়া তাঁহাদের 'দর্শন-যোগী'ও বলা হয়। তবে পশ্চিম অঞ্চলের সাধারণ লোকের কাছে ইহারা 'কানফাট্টা যোগী' নামেই বেশী পরিচিত।

গুরু গোপালনাথ এবার গম্ভীরনাথজীর কর্ণবেধ দীক্ষার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার ব্যবস্থাক্রমে প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ নাথযোগী বাবা শিবনাথজী কর্তৃক এ দীক্ষাকার্য সম্পন্ন হইল।

সাম্প্রদায়িক আচার অনুষ্ঠানাদি সবই তো ক্রমে শেষ হইয়া গেল। কিন্তু গম্ভীরনাথজীর অন্তরের দুর্নিবার সাধন-পিপাসা নিবৃত্ত হয় কই?

নিগূঢ় যোগের যে উচ্চতম স্তরে উঠিতে তিনি অভিলাষী, যে চরম অধ্যাত্ম-অনুভূতির আস্বাদ তিনি পাইতে চান, তাহা কোথায়? এই জনবহুল মঠে, এত কর্মব্যস্ততার মধ্যে বসিয়া, এ বস্তু কি করিয়া তিনি লাভ করিবেন?

শিবকল্প গোরখ্‌নাথজীর সাধনজীবনটি ছিল গম্ভীরনাথের আদর্শ। সংসার-আবেষ্টনীর বাহিরে, গহন অরণ্যে বসিয়া মহাযোগী গোরখ্‌নাথ দীর্ঘকাল রহিয়াছেন তপস্যায় মগ্ন, লাভ করিয়াছেন অসামান্য যোগৈশ্চর্য ও ব্রহ্মজ্ঞান। সেই পরম প্রাপ্তির আশায় তরুণ সাধক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তীব্রতর তপস্যার জন্য প্রস্তুত হইতে আর তাঁহার বিলম্ব সহিল না।

উচ্চতর অধ্যাত্ম-অনুভূতির দ্বারগুলি একটির পর একটি খুলিয়া যাইতেছে, সাধক তাই সুদূর নির্জন স্থানে গিয়া নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় ব্রতী হইতে চাহিতেছেন। গুরু গোপালনাথজী এবার তাঁহাকে আর বাধা দেন নাই। তিন বৎসর নিজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রাখিবার পর স্নেহভাজন শিষ্যকে তিনি আশ্রম ত্যাগের অনুমতি দিলেন।

অতঃপর গোরখ্‌পুর হইতে দক্ষিণ দিকে গম্ভীরনাথজী অগ্রসর হন, বিশ্বনাথধাম বারাণসী হয় তাঁহার প্রথম গন্তব্যস্থল। যুগ-যুগান্তের সাধকদের চির অভিলষিত এই তপঃক্ষেত্র। কিছুদিন এখানে থাকিয়া সাধনভজন করিবেন ইহাই তাহার অভিলাষ।

নিষ্কিঞ্চন যোগী শুধু একখানি কৌপীন ও কম্বল মাত্র সম্বল করিয়া পথ হাঁটিতেছেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা ও আশ্রয়ের জন্য তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, গ্রহণ করিয়াছেন চরম বৈরাগ্য অযাচক বৃত্তি।

পথ চলিতে চলিতে গম্ভীরনাথ একদিন বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, ক্ষুৎপিপাসায়ও তিনি অত্যন্ত কাতর। এমন সময় দেখা গেল, এক পূর্বপরিচিত ব্রাহ্মণ তাঁহার দিকে দ্রুত ছুটিয়া আসিতেছেন।

নিকটে আসিয়া গম্ভীরনাথকে তিনি অতি যত্নে এক বৃক্ষছায়ায় বসাইলেন। তারপর সবিনয়ে কহিলেন, গত রাত্রে শ্রীনাথজী তাঁহাকে

স্বপ্নাদেশ দিয়াছেন, 'এ স্থানে এক শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত পরিব্রাজকের আগমন হবে, তুমি তাঁর ভোজন ও সেবা-পরিচর্যার ব্যবস্থা ক'রো।'

ব্রাহ্মণ তাই এমন ত্রস্তপদে ছুটিয়া আসিয়াছেন। বড় অযাচিত-ভাবে পাওয়া গেল এই আহার্য। ভোজনপর্ব শেষ হইলে গম্ভীরনাথ আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন।

কাশীতে পৌঁছিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা নাই। এই পরম পবিত্র ভূমি, তাঁহার মতে, সর্বতীর্থের রাজা। গঙ্গাস্নান ও প্রভু বিশ্বনাথজীর অর্চনার পর দূরে নদীতীরে একটি নির্জন স্থান তিনি বাছিয়া নেন এবং ক্রমান্বয়ে তিন বৎসরকাল এখানে কঠোর যোগ সাধনায় ব্রতী হন। এ-সময়ে নানা উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতি তিনি অর্জন করিতে থাকেন, শক্তিমান্ সাধক বলিয়াও এ অঞ্চলে তাঁহার খ্যাতি রটিয়া যায়। ইহার পর কৌতূহলী মানুষের ভিড়কে আর বাধা দেওয়া গেল না। যোগসাধনার নির্জন পরিবেশটি এভাবে নষ্ট হওয়ায় গম্ভীরনাথজী কাশীধাম ত্যাগ করিলেন।

এবার তাঁহার সাধনস্থল হয় পবিত্র প্রয়াগধাম। নদীর অপর তীরে, ঝুঁসির চড়ায়, জনবিরল স্থানে, এক বালুকা-গুম্ফায় বসিয়া শুরু হয় তাঁহার কঠোর তপশ্চর্যা।

দৈবানুগ্রহে এ সময়ে মুকুটনাথ নামক এক তরুণ সাধু যেন কোথা হইতে এখানে আসিয়া উপনীত হন। অধ্যাত্মসাধনার দিক দিয়া নাথপন্থেরই তিনি অনুবর্তী। সাধক গম্ভীরনাথ তখন নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান-জপ ও যোগসাধনায় ডুবিয়া রহিয়াছেন। শীতাতপ তাঁহার মাথার উপর দিয়া চলিয়াছে, দেহের কোনো প্রয়োজনের দিকেই দৃষ্টি দিবার তাঁহার অবসর নাই। কি জানি কেন, তরুণ সাধক মুকুটনাথ এই ত্যাগ-তিতিক্ষাময় যোগীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এখন হইতে গম্ভীরনাথজীর সমস্ত পরিচর্যার ভার তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন।

গম্ভীরনাথ ধীরে ধীরে এবার তাঁহার যোগসাধনার গভীরতর স্তরে ডুবিয়া যাইতেছেন। অন্তরে এখন তাঁহার তীব্র ব্যাকুলতা ও

দুর্বার সংকল্প—যোগসিদ্ধি করায়ত্ত তাঁহাকে আরোহণ করিতেই হইবে। সাধনগুহার বাহিরে এ সময়ে তিনি কদাচিৎ আত্মপ্রকাশ করিতেন। বাহিরের লোকের সাথে বাক্যালাপ দূরের কথা, একান্ত সেবক মুকুটনাথের সহিতও দিনান্তে তাঁহার খুব কম কথাবার্তা হইত। যে দৃঢ় সংকল্প ও একাগ্রতা নিয়া তিনি সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন, এই সময়ে তাহা অনেকাংশে সফল হইয়া উঠে। একনিষ্ঠ তপস্যার ফলে সাধনসত্তায় দেখা দেয় অসামান্য যোগশক্তির বিকাশ।

প্রয়াগের ঝুঁসি-সৈকতের এই বালুকা-গুহায় তরুণ সাধক গম্ভীরনাথ একাদিক্রমে তিন বৎসর সাধনা করিয়াছিলেন। তারপর এ অঞ্চল তিনি ত্যাগ করেন ও নর্মদা পরিক্রমায় ব্রতী হন।

কঠোর তপস্যার ফলে গম্ভীরনাথজী সাধনার স্থিরভূমি লাভ করিয়াছেন। এবার সাধকজীবনে শুরু হয় ব্যাপক পর্যটনের পালা। ভারতের সমতল ও পার্বত্য প্রদেশের সর্বত্র সহজগম্য ও দুর্গম যা কিছু তীর্থ আছে, কোনোটির দর্শনই তিনি বাদ দেন নাই।

উত্তরকালে পরিব্রাজক-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলিতে গিয়া তিনি ইহার কল্যাণকারিতার উপর জোর দিতেন। শিষ্যদের বলিতেন—"মনে রেখো, প্রাত্যহিক জীবনের অভাব-অভিযোগ ও সুখ-দুঃখের স্পর্শে এসে পরিব্রাজনরত সাধকের ভ্রম ও সংশয় ছুটে যায়—বৈরাগ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার ফলে তাঁর দেহাত্মবুদ্ধিও ক্রমে নষ্ট হয়। এইটেই হচ্ছে পর্যটনের সব চাইতে বড় লাভ।"

পরিব্রাজনরত গম্ভীরনাথজী এবার কিছু সময়ের জন্য গুরুধাম গোরখ্‌পুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যেই সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জনসমাজে তাঁহার বেশ খ্যাতি রটিয়া গিয়াছে, তাঁহার ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা সাধুসন্তদের মধ্যেও আলোচিত হইতেছে।

প্রিয় শিষ্যকে আবার কাছে পাইয়া মোহান্ত গোপালনাথজী যেমন অপার সন্তোষ লাভ করিলেন, আশ্রমিকদেরও তেমনি আনন্দের অবধি রহিল না। কিন্তু জনবহুল মঠের আবেষ্টনী গম্ভীরনাথজীকে বেশীদিন ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। পরম প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা

আজিও তাঁহার জীবনে পূর্ণ হয় নাই, নিভৃত তপস্যার জন্য তাই আবার তিনি ব্যগ্রভাবে বাহির হইয়া পড়িলেন।

গয়ার নিকটেই ব্রহ্মযোনী পাহাড়। এ পাহাড়ের সানুদেশে রহিয়াছে কপিলধারা নামে এক মনোরম জনবিরল স্থান। পরিব্রাজক সেদিন এখানে আসিয়া থামিয়া পড়িলেন।

এই স্থানই কি তাঁহার অভিষ্টসিদ্ধির চিহ্নিত ভূমি? হঠাৎ তাঁহার মর্মমূলে কে যেন এ স্থানের ঘনিষ্ঠ যোগবন্ধনটির কথা জানাইয়া দিয়া গেল। এক অপূর্ব প্রেরণায় তিনি তখন উদ্বুদ্ধ। স্থির করিলেন, সিদ্ধির জন্য এখানেই আসন পাতিবেন।

যুগ যুগ সঞ্চিত তপস্যার আগে যেন ওতপ্রোত রহিয়াছে এখানকার ধূলিকণায় ও আকাশে বাতাসে। তিন দিকে তরুলতামণ্ডিত সবুজ পাহাড়ের শ্রেণী, আর একদিকে লোকালয়মুখী সর্পিল অরণ্যপথ। নিম্নে অদূরে জঙ্গলাকীর্ণ কপিলেশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দির দণ্ডায়মান। সমগ্র অঞ্চলটিতে এক বিস্ময়কর নৈঃশব্দ ও নিভৃতি। দু-একটি সন্ন্যাসী ছাড়া সাধারণত এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে কেহ বসবাস করিতে আসে না।

এ অঞ্চলের সাধন-ঐতিহ্যও নিতান্ত কম নয়। বিষ্ণুপাদপূত গয়ার অবস্থিতি অতি নিকটে। সেখানেই সাধিত হইয়াছিল বুদ্ধ ও চৈতন্যের পরম রূপান্তর। এই পুণ্যময় পরিবেশেই গম্ভীরনাথ তাঁহার পূর্ণতর সিদ্ধির জন্য তৎপর হইলেন।

কপিলধারার এই চরিত্র পার্বত্য অঞ্চলে তাঁহার তপস্যার ধারাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে বহিয়া চলে। কখনো উদার উন্মুক্ত আকাশের তলে, কখনো ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের গহ্বরে থাকেন তিনি আত্ম-সমাহিত। শীত বর্ষা গ্রীষ্ম—ঋতুর পর ঋতুর আবর্তন মাথার উপর দিয়া কখন চলিয়া যায়, কোনো দিকেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। অবিচল নিষ্ঠায় অধ্যাত্ম-জীবনের সার্থকতর অধ্যায়গুলি একের পর এক তিনি উন্মোচন করিয়া যাইতেছেন।

বহিরঙ্গ জীবনের অনেক কিছু গম্ভীরনাথজী এ সময়ে বর্জন করিয়া চলিতেন। কৃচ্ছ্রব্রতী কৌপীনবন্ত সন্ন্যাসীর সম্বলের মধ্যে মাত্র একখানি কম্বল, নারিকেলের খর্পর ও ফৌরী বা যোগদণ্ড। সাহায্যকারী সঙ্গী বা সেবক কেহ কোথাও নাই। অন্তর্মুখী হইয়া দিনের পর দিন কেবলই ধ্যানের গভীরে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছেন।

যোগক্ষেম বহনের ব্যবস্থাটিও যেন এ সময়ে ভগবানের অদৃশ্য ইঙ্গিতে সম্পন্ন হইয়া গেল। আক্কু কুরমী গয়ার উপকণ্ঠবাসী এক দরিদ্র ব্যক্তি, কাষ্ঠ আহরণ করিয়া সে তাহার জীবিকা অর্জন করে। এজন্য মাঝে মাঝে তাহাকে কপিলধারার অরণ্যে যাইতে হয়। হঠাৎ সেদিন সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে ধ্যানমগ্ন যোগী গম্ভীরনাথের দিব্যমূর্তি তাহার দৃষ্টিপথে পড়িয়া গেল।

দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই আক্কুর জীবনে এক পরিবর্তন ঘটিয়া যায়, নবীন তপস্বীর চরণে সে আত্মসমর্পণ করিয়া বসে। কি এক অমোঘ আকর্ষণ এই সন্ন্যাসীর মধ্যে রহিয়াছে, তাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার সে তাঁহার চরণতলে আসিয়া উপবেশন করে।

ধুনির কাঠ ও আগুন সংগ্রহের ভার আক্কু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করে। প্রতিদিন সাধুবাবার জন্যে কিছু ফলমূল ও দুগ্ধ না আনিলেও মন তাহার তৃপ্ত হয় না।

কে এই কঠোরব্রতী সাধক, কি তাঁহার স্বরূপ আক্কু তাহা জানে না, কিন্তু তাঁহার সেবা-পরিচর্যার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতার অন্ত নাই। পরে তাহার ভাই মুন্নিও গম্ভীরনাথজীর অনুরক্ত হইয়া উঠে এবং ক্রমে সারা কুরমী পরিবারটিই এই সাধুর সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

সরলহৃদয় আক্কু ও তাহার পরিবারবর্গ, সাধুবাবাকেই তাহাদের অভিভাবক ও সুহৃদ্‌রূপে সেদিন হইতে গ্রহণ করে। দুঃখ দুর্দৈবে কোনোক্রমে বাবার নিকট অন্তরের আবেদনটি পৌঁছাইয়া দিলেই যেন তাহাদের হৃদয়ের ভার মুহূর্তে লাঘব হইয়া যাইত।

আক্কুর পরিবারের এই নিবিড় সৌহার্দ্য ও নির্ভরতা, এই সেবা ও আত্মত্যাগ গম্ভীরনাথজীকে এক নিবিড় আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধিয়া

দিয়াছিল। শুধু এ সময়েই নয়, উত্তরকালেও দেখা যাইত, মহাযোগীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি এই দুঃস্থ অন্ত্যজ পরিবারটিকে সতত ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার মনোভাবে ও আচরণে সকলের মনে হইত, এই দরিদ্র কুরমী পরিবারের কাছে তিনি যেন চিরঋণে আবদ্ধ হইয়া আছেন।

ইহার পর গম্ভীরনাথজীর একান্ত-সেবকরূপে পর পর দেখা দেন নবীন সাধকদ্বয়—নৃপৎনাথ ও সিদ্ধনাথ। গৃহত্যাগ করার পর নৃপৎনাথ সদ্‌গুরুর সন্ধানে নানা স্থানে ঘোরাফেরা করিতেছিলেন। এ সময়ে হঠাৎ একদিন গয়ার কপিলধারায় তিনি গম্ভীরনাথজীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এই সৌম্যদর্শন যোগীর চরণাশ্রয় গ্রহণ করিতে হন কৃতসংকল্প।

গম্ভীরনাথজী সহসা কাহাকেও দীক্ষা দিতে রাজী হইতেন না। নৃপৎনাথকে সেদিন তাই প্রত্যাখ্যানই করিলেন। তৎসত্ত্বেও নৃপৎনাথ তাঁহাকেই গুরুজ্ঞানে একান্ত নিষ্ঠায় তাঁহার সেবা-পরিচর্যা করিয়া যাইতে থাকেন। ধ্যানসমাহিত যোগীর দৈনন্দিন পরিচর্যার ভার এখন হইতে প্রধানত তাঁহার উপরই ন্যস্ত হয়।

শুধু গম্ভীরনাথের দেহের রক্ষণাবেক্ষণই নয়, তাঁহার সাধনার পথে যাহাতে কোনো প্রকার বাধা বিঘ্ন না আসে, সেদিকেও তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন নৃপৎনাথ। যোগীবরের সাধনভজনের প্রয়োজন অনুযায়ী সমস্ত কিছু ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না, রাত্রি জাগিয়া রোজ তাঁহার চতুর্দিকে তিনি পাহারাও দিতেন।

ভয়ঙ্কর ভৈরবের বেশে সজ্জিত, সেবক নৃপৎনাথকে ত্রিশূল হস্তে প্রায়ই হিংস্র জীবজন্তু তাড়াইতে দেখা যাইত। তাছাড়া, কৌতূহলী আগন্তুকেরা যাহাতে গম্ভীরনাথজীর কাছে ভিড় না জমায় সেদিকেও তাঁহার সতর্কতার অন্ত ছিল না। অনেকেই সে সময়ে ভৈরববেশী নৃপৎনাথের ভয়ে ধ্যানমগ্ন যোগীর সম্মুখে সহসা উপস্থিত হইতে সাহসী হইতেন না।

গম্ভীরনাথের সাধনক্ষেত্রের কিছুটা নিম্নভূমিতে খর্পর-ভৈরব নামক স্থানে নৃপৎনাথ ও সিদ্ধনাথ বাস করিতেন। যোগীবরের সেবা-

পরিচর্যার শেষে উভয়ে কপিলধারা হইতে নামিয়া আসিতেন এবং নিজেদের পর্ণকুটিরে বিশ্রাম নিতেন। এই ব্যবস্থার ফলে গম্ভীরনাথজীর কঠোর তপস্যা একান্ত নিভৃতে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়।

ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের স্থানে স্থানে জনবিরল গুহায় দুই-একটি করিয়া তপস্বীর আস্তানা। ক্রমে ক্রমে ইঁহাদের মধ্যে গম্ভীরনাথজীর তপঃপ্রভাবের কথা প্রচারিত হইয়া যায়। এই উচ্চকোটি যোগীবরের আসনের সম্মুখে তাঁহারা মাঝে মাঝে আসিয়া জুটিতেন। বাবা গম্ভীরনাথের সান্নিধ্যে বসিয়া সাধনরত হইলে তাঁহারা নাকি অতি সহজে ধ্যানের গভীরে ডুবিয়া যাইতেন।

শুধু ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের চারিপাশেই নয়, গয়া অঞ্চলেও এই সময়ে ধীরে ধীরে এই স্নিগ্ধ সাধকের যোগৈশ্বর্যের খ্যাতি রটিয়া যায়। কপিলধারার দিব্যদর্শন শক্তিমান্ মহাত্মার কথা তখন সাধু মহাত্মা ও ভক্ত নরনারী সবাইর মধ্যে প্রচারিত হয়।

গয়ার মাধোলাল পাণ্ডা এক ধনী ও প্রতাপশালী লোক। হঠাৎ একটা জটিল, বিপজ্জনক মামলায় তিনি একবার জড়াইয়া পড়েন। এ মামলায় হারিলে পথের ভিখারী হওয়া ছাড়া তাঁহার আর গত্যন্তর নাই। অথচ মোকদ্দমার যে অবস্থা তাহাতে জয়ী হবার ক্ষীণতম আশাও দেখা যাইতেছে না। আসন্ন সংকটের সম্মুখে দুই চোখে তিনি সেদিন অন্ধকার দেখিতেছেন।

মাধোলাল অবশেষে নিরুপায় হইয়া গম্ভীরনাথজীর চরণে আশ্রয় নেন, সাশ্রুনয়নে যোগীবরের কাছে আপন দুঃখের কথা নিবেদন করিতে থাকেন।

আর্তের নয়নাশ্রু বাবা গম্ভীরনাথের অন্তর স্পর্শ করিল। সান্ত্বনা দিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বেটা, চিন্তা মত্ করো। তুম্হারা ভালাই হোগা।"

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই মাধোলাল এ মামলায় জয়ী হন, ভরাডুবি হইতে তিনি রক্ষা পান। আর্ত ভক্তরূপে গম্ভীরনাথজীর

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনি এক প্রকৃত ভক্তে রূপান্তরিত হন। এখন হইতে যোগীবরের সেবায় তাঁহাকেই আত্মনিয়োগ করিতে দেখা যায়। এই একনিষ্ঠ ভক্তের সনির্বন্ধ অনুরোধে গম্ভীরনাথজী তাঁহাকে কপিলধারার সাধনস্থলীতে একটি যোগগুহা ও বেদী নির্মাণে অনুমতি দিয়াছিলেন। প্রায় বার বৎসরের উপর যোগীবর একাদিক্রমে সেইখানেই সাধনভজন করিয়া গিয়াছেন।

যোগগুহার অন্তঃপ্রকোষ্ঠে গম্ভীরনাথ দিনের পর দিন ধ্যানমগ্ন ও সমাধিস্থ থাকিতেন। সেবকগণ এই কক্ষের বাহিরে সামান্য পরিমাণ দুগ্ধ তাঁহার জন্য রাখিয়া আসিত। ধ্যানাবেশ কাটিবার পর, প্রয়োজন বোধ করিলে গম্ভীরনাথজী উহা পান করিতেন। এভাবে অবস্থান করার সময় মহাসাধক তাঁহার গুহ্য যোগসাধনার উচ্চতর স্তরগুলি পর পর অতিক্রম করিয়া যান।

প্রথম প্রথম সপ্তাহান্তে বা পক্ষান্তে যোগীবর তাঁহার যোগগুহার বাহিরে আসিতেন। দূর-দূরান্ত হইতে ভক্ত, মুমুক্ষু আর্তের দল সেখানে উপস্থিত হইত, দর্শনের নির্দিষ্ট সময়টির জন্য অপেক্ষা করিত। গম্ভীরনাথজী তখন প্রায়ই থাকিত অন্তর্মুখীন। সমাধি ভাঙিলে নীরবে সমাগত জনমণ্ডলীকে আশীর্বাদ জানাইয়া আবার তিনি ঢুকিয়া পড়িতেন যোগ-প্রকোষ্ঠে।

মৌনী হইয়া একবার তিনি এ যোগগুহার মধ্যে একাদিক্রমে তিনমাস অবস্থান করেন। এ সময়কার অত্যুগ্র সাধনার ফলে অভীপ্সিত পরম বস্তু তিনি প্রাপ্ত হন, এক শক্তিমান্ ব্রহ্মজ্ঞপুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

গম্ভীরনাথজীর সাধনসত্তায় দেখা যাইত যোগৈশ্বর্য, জ্ঞান ও প্রেম-মাধুর্যের এক অপরূপ সমাহার। বিপুল সাধন-ঐশ্বর্যকে তিনি এমন সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে, এমন মধুর ভঙ্গিমায় বহন করিয়া চলিতেন যে, অসামান্য যোগীরূপে তাঁহাকে চিনিয়া লওয়া সাধারণের পক্ষে প্রায়ই সম্ভব হইত না।

কিন্তু সমসাময়িক কালের বিশিষ্ট সাধক ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের কাছে গম্ভীরনাথ-বাবার লোকোত্তর সত্তার এই বিশেষ পরিচয়টি অজানা ছিল না। বরাবার পাহাড়ের প্রবীণ নাথযোগীদ্বয়, ধনিয়া পাহাড়ের নানকপন্থী মহাপুরুষ ঠাকুরদাস-বাবা প্রভৃতি গম্ভীরনাথজীকে অসামান্য মর্যাদা প্রদর্শন করিতেন। পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের স্বনামধন্য ব্রহ্মজ্ঞ-পুরুষ রামদাস কাঠিয়াবাবার মুখেও এই মহাযোগীর সাধনৈশ্বর্যের সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যাইত।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গম্ভীরনাথজীকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। যোগীবরের নিকট নানা নিগূঢ় সাধন লাভ করিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কোনো কিছু বলিতে গেলে গোস্বামীজীর উৎসাহের অন্ত থাকিত না। অন্তরঙ্গ শিষ্যদের নিকট প্রায়ই তিনি বলিতেন, "বাবা গম্ভীরনাথজী পলকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে সমর্থ। ঐশ্বর্য-ভাবে সিদ্ধিলাভ করবার পর এখন তিনি মাধুর্যে ডুবে গিয়েছেন।"

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের অন্যতম শিষ্য নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় যোগীবর গম্ভীরনাথ ও গোস্বামীজী সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন,—"আকাশগঙ্গার আশ্রমে আমরা শয়ন করিয়া আছি। সমস্ত নিস্তব্ধ নীরব—জ্যোৎস্নাময় রাত্রি। মাঝে মাঝে আমরা শুনিতে পাইতাম, কে পাহাড়ের শৃঙ্গে একটা দুইটার সময় সেতার বাজাইয়া ভজন করিতেছেন। গোঁসাইজী আমাদিগকে বলিতেন, 'ঐ শুনুন, বাবা গম্ভীরনাজী কি মিষ্ট ভজন করিতেছেন।' কোনো কোনোদিন ঐ ভজন শুনিয়া তিনি একাকী নিশীথ সময়ে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেন। দুই এক ঘণ্টা পরে আবার ফিরিয়া আসিতেন। একদিন ঠাকুর বলিলেন, বাবা বড় প্রেমিক এবং শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা। হিমালয়ের নিচে এরূপ আর দেখা যায় না। পাহাড়ে কত বাঘ, সাপ, হিংস্র জন্তু রয়েছে, কিন্তু বাবার শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে কেউ তাঁর অনিষ্ট করে না।"

বাবা গম্ভীরনাথ ও গোস্বামীজার মিলনের মধুর আলেখ্য আঁকিতে গিয়া শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা লিখিয়াছেন,—"শ্বাপদসংকুল

গয়ার পাহাড়ে নির্জন কপিলধারার শৃঙ্গে বসিয়া গম্ভীরনাথজী গভীর রাত্রে সেতার বাজাইয়া ভজন গান করিতেন, আর আকাশগঙ্গার পাহাড় হইতে গোঁসাইজী সঙ্গিগণকে ফেলিয়া বন-জঙ্গল কাঁটাকাঁকর অগ্রাহ্য করিয়া উন্মত্ত মনে ছুটিয়া আসিতেন। এ কিসের প্রেম! কিসের টান! কোন্ প্রেমে ইহারা বাঁধা পড়িয়াছেন? এ বন্ধনের সূত্র কোথায়? কোন্ মালাকার মাঝখানে আসিয়া দুইটি হৃদয় এমন করিয়া বাঁধিয়াছেন? এ পুণ্যকাহিনী শুনিলেও জীবের ধর্ম হয়, পলকের জন্য হৃদয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়।"

উত্তর ভারতের বহু মহাত্মা ও সার্থকনামা যোগী গম্ভীরনাথজীর সঙ্গ এবং সৌহার্দ্য কামনা করিতেন। গঙ্গোত্রীর বাবা সুন্দরনাথ ইহাদের অন্যতম। এই শক্তিমান্ মহাপুরুষ যোগবলে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে সশরীরে উপস্থিত হইতে পারিতেন। বাবা গম্ভীরনাথের সহিত ইহার নিবিড় সখ্য ছিল, তাঁহাকে দর্শনের জন্য এই মহাপুরুষ মাঝে মাঝে গোরখ্পুরেও উপনীত হইতেন।

আপন যোগৈশ্বর্যকে গম্ভীরনাথজী সচরাচর প্রকাশ করিতেন না। তত্ত্বদর্শী মহাযোগী এ সকল শক্তি-বিভূতিকে বলিতেন—প্রপঞ্চ। কিন্তু নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই যেন যোগীবরের যোগবিভূতি-লীলা স্থান-বিশেষে মাঝে মাঝে প্রকট হইয়া পড়িত। সূর্যালোকের মতোই নিতান্ত সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে যোগৈশ্বর্যের এ দীপ্তি ঝলমল করিয়া তুলিত মহাপুরুষের সমগ্র পরিপার্শ্বকে।

কুরমী ভ্রাতৃদ্বয়, আক্কু ও মুন্নি দীর্ঘদিন বাবা গম্ভীরনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। তাহাদের সমগ্র পরিবারটিই প্রাপ্ত হয় এই কৃপালু মহাপুরুষের চরণাশ্রয়।

একবার বাবার প্রিয় ভক্ত আক্কু কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, বাঁচিবার কোনো আশাই থাকে না। অবশেষে একদিন দেখা যায়, রোগীর দেহে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আত্মীয়স্বজনেরা এবার সৎকারের ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইয়া

পড়িল। আক্কুর ছোট ভাই মুন্নি কিন্তু শোকার্ত হইয়া আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিল না, উন্মাদের মতো ছুটিতে ছুটিতে সে গম্ভীরনাথজীর আসনের সম্মুখে গিয়া পতিত হইল।

মহাপুরুষের চরণ দুইটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল, "বাবা, তোমার একান্ত সেবক আক্কু মারা গিয়েছে। বাবা, তুমি কি তাঁকে আর ভালবাসো না? আমরা তো জানি, তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। কৃপা ক'রে তুমি তাকে আবার বাঁচিয়ে তোল।"

ধ্যানমগ্ন মহাযোগী এবার নয়ন উন্মীলন করিলেন। আর্তের আকুল ক্রন্দনে মুহূর্ত মধ্যে ফুটিয়া উঠিল এক করুণাঘন মূর্তি। শব সংকার থামাইতে আদেশ দিয়া মুন্নিকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও চলিয়া গেলেন আক্কুর শয্যাপার্শ্বে।

ভক্তের দেহটি স্পর্শ করিবার পর গম্ভীরনাথজী কমণ্ডলু হইতে কয়েক ফোঁটা জল তাহার মুখে ঢালিয়া দিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, আক্কুর প্রাণ-স্পন্দন আবার ফিরিয়া আসিতেছে। অতঃপর ধীরে ধীরে সে চক্ষু মেলিয়া শয্যায় পাশ ফিরিল।

সেদিনের এ চিকিৎসাটির মতো পথ্যদানের ব্যবস্থাও বড় বিচিত্র। আক্কুর জন্য তখনই খিচুড়ি পথ্যের নির্দেশ দিয়া যোগীবর গম্ভীরনাথ কপিলধারার আসনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই কৃপালীলার পর আক্কু আরও বহুদিন বাঁচিয়াছিল।

কপিলধারায় গম্ভীরনাথজীর আসনের সম্মুখে একটি ব্যাঘ্র মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে মহাযোগীকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া উহা যে কোথায় চলিয়া যায় তাহা কেহ জানে না। সাধারণত এটির আগমন ঘটে একান্ত নিভৃতে।

একদিন কিন্তু এই ব্যাঘ্রপুঙ্গব বহুজন সমক্ষেই আসিয়া হাজির। গম্ভীরনাথজী সেদিন ভক্ত ও সাধুজন পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন, এই হিংস্র বাঘের আগমন সকলকে ভীতত্রস্ত করিয়া তুলিল। বাবা তৎক্ষণাৎ সকলকে আশ্বাস দিয়া শান্তস্বরে কহিলেন, "আপনারা শঙ্কিত হবেন না। স্থানত্যাগের জন্য ব্যস্ত হবারও কোনো প্রয়োজন

নেই। ইনি ব্যাঘ্ররূপী এক মহাপুরুষ। সকলে কিছুক্ষণ একটু চুপ ক'রে বসে থাকুন।"

নিজ নিজ আসনে বসিয়া সবাই ভীত-বিস্ময়মিশ্রিত নয়নে এই ভয়ঙ্কর জীবটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। অতঃপর ব্যাঘ্রটি একদৃষ্টিতে কিছুকাল যোগীবরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অরণ্যের ব্যাঘ্রের সহিত গম্ভীরনাথজীর বরাবরই এ ধরনের সখ্য অন্তরঙ্গতা ছিল। এ ঘটনার পরও মাঝে মাঝে তাঁহার সান্নিধ্যে এক একটি ব্যাঘ্র আসিয়া জুটিত, উহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া তখন বুঝা যাইত না যে, নরখাদক পশুর হিংস্র প্রবৃত্তি একটুও অবশিষ্ট রহিয়াছে। মনে হইত উহারা বাবার পোষা জীব।

উত্তরকালেও গোরখ্‌পুর মঠের পিঞ্জরে গম্ভীরনাথজীর এক পোষা ও অনুগত বাঘকে দেখা যাইত। উহার সেবা-পরিচর্যার ব্যবস্থা সম্পর্কে মহাপুরুষের সতর্কতার অন্ত ছিল না। পরিচারকদের অসাবধানতার জন্য এক একদিন উহা পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া পড়িত। গম্ভীর-নাথজীর সঙ্গে এই বাঘটির গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল, ছুটিয়া আসিয়া তিনি কহিতেন, "ওরে, তোর ভয়ে যে আশ্রমের সাধুরা চারিদিকে ছুটে পালাচ্ছে! এবার তুই শান্ত হয়ে খাঁচার ভেতর ঢুকে পড়তো দেখি।"

অতঃপর সস্নেহে ব্যাঘ্রের কানটি ধরিয়া তিনি উহাকে লৌহ পিঞ্জরের দিকে টানিয়া নিতেন। আনন্দে লাঙ্গুল নাড়িতে নাড়িতে সে তখন প্রবিষ্ট হইত তাহার নির্দিষ্ট স্থানে।

সন্নুলাল ধাড়ীওয়ালা নামক এক গয়ালার পাগলামীতে সকলে একবার অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে সাধুদের উপরও সে অত্যাচার করিতে ছাড়িত না।

একদিন সে কপিলধারায় আসিয়া সাধু মহাত্মাদের উপর উপদ্রব করিতেছে, এ সময়ে বাবার কৃপাদৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল।

হঠাৎ সন্নুলালের গালে সজোরে তিনি দুইটি চপেটাঘাত করিলেন ইহার ফলে পাগলের সেদিনকার অত্যাচারই শুধু নিবারিত হইল না, চিরতরেই সে একেবারে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়া গেল। অতঃপর বহু বৎসর ব্যাপিয়া স্বাভাবিকভাবে সংসারের কাজকর্ম ও ব্যবসাবাণিজ্য চালাইয়া যাইতে সন্নুলালের কোনো অসুবিধা হয় নাই।

প্রয়াগের কুম্ভমেলায় একবার দাঙ্গা বাধিয়া যায়। কি এক কারণে উত্তেজিত হইয়া বৈষ্ণব নাগা সাধুর দল যোগী এবং সন্ন্যাসীদের উপর আক্রমণ শুরু করে। মেলাক্ষেত্রে সেদিন এক রক্তারক্তি কাণ্ড শুরু হয়, যোগীদের অনেকে আহত হইতে থাকেন।

যোগী সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা বাবা গম্ভীরনাথজী তখন সেই অঞ্চলেই ছাউনি করিয়া আছেন। ধ্যানাসনে উপবিষ্ট মহাপুরুষের কানে এই উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কোনো সংবাদই প্রবেশ করে নাই। লাঠি ও চিম্‌টাধারী নাগার দল যখন একেবারে তাঁহার ছাউনির ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তখনও তিনি নীরব নিস্পন্দ হইয়াই বসিয়া আছেন।

এ সময়ে একজন ভক্ত তাঁহার আসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "মহারার্জ, চেয়ে দেখুন কি বিপদ! ওরা সবাই মারমুখো হয়ে ছাউনিতে ঢুকেছে।"

গম্ভীরনাথজীর ধ্যান এবার ভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া উচ্চ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বৎস! শান্তি করো, শান্তি করো।"

মুহূর্তে কি যেন এক ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। আক্রমণকারী নাগাদের উপর কে যেন হঠাৎ এক অঞ্জলি অলৌকিক শান্তিবারি ছিটাইয়া দিয়াছে। গম্ভীরনাথজীর কথা কয়টি শোনা মাত্র তাহাদের উত্তেজনা একেবারে অন্তর্হিত হয়। লাঠি, চিম্‌টা প্রভৃতি নামাইয়া নত মস্তকে ধীরে ধীরে তাহারা স্থান ত্যাগ করে।

যোগবিভূতি ও অলৌকিক শক্তির যতটুকু প্রকাশ গম্ভীরনাথজীর জীবনে দেখা গিয়াছে, তাহা একান্তভাবে কৃপারূপেই তাঁহার আশে-

পাশে ঝরিয়া পড়িয়াছে। সাধারণত এসব কিন্তু তিনি নিতান্ত সতর্কতার সহিতই আবরিত করিয়া রাখিতেন। অলৌকিক শক্তির পরিচয় লাভেচ্ছু ভক্তদের কাছে যোগীবর নিজের সহজ ও লৌকিক পরিচয়টিই বেশী করিয়া তুলিয়া ধরিতে চাহিতেন।

একটি গৃহস্থ শিষ্য ত্যাগ ও সেবানিষ্ঠার দিক দিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। গুরু গম্ভীরনাথজীর জন্য অকাতরে তিনি পরিশ্রম করিতেন, তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য অর্থব্যয়ও তাঁহাকে কম করিতে হয় নাই। এই দীর্ঘ সেবা-পরিচর্যার মধ্যে একদিনের জন্যও ঐশ্বর্য-গোপনপ্রয়াসী গম্ভীরনাথজীর অলৌকিকত্ব তাঁহার চোখে পড়ে নাই। এ জন্য শিষ্যটির মনে বড় খেদ ছিল।

একদিন তিনি বাবার যোগবিভূতির লীলা দর্শনের জন্য তাঁহাকে খুব ধরিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে এই বিশ্বাস আছে, ত্যাগ-তিতিক্ষা নিয়া এতদিন যেভাবে বাবার সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কখনই তাঁহার এ অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করিবেন না। গম্ভীরনাথজী দেখিলেন, শিষ্যের মধ্যে সেবার অভিমান দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, সংশোধন দরকার। তাই ইচ্ছা করিয়াই সেদিন তিনি নাথসম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন কাহিনী তাঁহার কাছে বর্ণনা করিতে থাকেন। কাহিনীটি এইরূপ :

মহাযোগী গোরখ্‌নাথজী একবার দীর্ঘকাল তপস্যারত ছিলেন। এ সময়ে এক ভক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এবং তাঁহাকে রোজ পায়সান্ন রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। বহুদিন পরিচর্যার পর এই সেবক ব্রাহ্মণটির কৌতূহল জন্মে. তিনি যোগীবরের যোগবিভূতিসমূহ প্রত্যক্ষ করিবেন। তাঁহার ধারণা একনিষ্ঠ সেবাদ্বারা গোরখ্‌নাথজীর তিনি প্রীতিভাজন হইয়াছেন, তাই তাঁহার এই অনুরোধ তিনি অবশ্যই রক্ষা করিবেন।

গোরখ্‌নাথ দেখিলেন, ভক্তের মনের মধ্যে সেবার 'অহং' জাগ্রত হইয়াছে, অবিলম্বে ইহা উৎপাটন করা দরকার। তখনই তিনি বিপুল পরিমাণ দুগ্ধ, চাল ও চিনি উদ্‌গীরণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন।

তারপর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এত বৎসর ধরে যে পায়সান্ন তুমি আমায় ভোজন করিয়েছো—দ্যাখো, তার সমস্ত কিছু উপকরণই পৃথক পৃথক এখানে উঠে এসেছে।"

বলা বাহুল্য, এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া ভক্ত ব্রাহ্মণটি ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যান। সেবানিষ্ঠার যে অহমিকা তাঁর মধ্যে উদগ্র হইয়াছিল সেদিন তাহা চূর্ণ হয়।

নিজের শিষ্য ও ভক্তদের কল্যাণের জন্য গম্ভীরনাথজী উপরোক্ত আখ্যায়িকাটি অনেক সময় বিবৃত করিতেন। গুরুজীর যোগবিভূতি দর্শনের কৌতূহল যাহাদের মধ্যে দেখা দিত, অতঃপর আর তাঁহারা সাহস করিয়া অগ্রসর হইতেন না।

কপিলধারার শান্ত সমাহিত জীবন ছাড়িয়া গম্ভীরনাথজী মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িতেন। যত দূর, দুর্গম বা বিপদসংকুলই হোক না কেন, ভারতের কোনো তীর্থই তাঁহার অজানা ছিল না। এক এক বারের পর্যটন সাঙ্গ করিয়া আবার তিনি গয়া অঞ্চলেই প্রত্যাবর্তন করিতেন।

তাঁহার আশ্রমটিতে অতঃপর নানা কারণে ভক্তজনের সমাগম বৃদ্ধি পায়। নিভৃত তপস্যাস্থলীতে ক্রমে মন্দির ও বাসভবন প্রভৃতি নির্মিত হইতে থাকে। এ সময়ে কপিলধারার পরিবেশটিকে তিনি আর তেমন নির্জনবাসের উপযুক্ত মনে করিতেন না। ভক্ত মাধোলাল তাই যোগীবরের জন্যে বামনীঘাটে একটি নির্জন বাগানবাড়ি নির্মাণ করিয়া দেন। তীর্থাঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিয়া যোগীবর বেশীর ভাগ সময় এই উদ্যানেই আসন বিছাইতেন।

নিতান্ত সাধারণভাবে সাধু ও তীর্থযাত্রীদের মধ্যে চলাফেরা করিলে কি হয়, গম্ভীরনাথজীর অলৌকিক শক্তির পরিচয় মাঝে মাঝে প্রকট হইয়া পড়িত। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি কোন্ ফাঁকে সহসা জনতার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিত, তাহার ঠিক ছিল না।

একবার গম্ভীরনাথজী আট-দশজন সঙ্গী সন্ন্যাসীসহ উদয়পুরে

গিয়াছেন। একটি জনবিরল মাঠের প্রান্তে পৌঁছিয়া সকলে ধুনি জ্বালাইয়া ধ্যানে বসিলেন।

তখন ঘোর বর্ষাকাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা আকাশ জুড়িয়া ঝড়ের মাতামাতি শুরু হইয়া যায়। প্রবল বর্ষণের ফলে চারিদিক একেবারে জলে জলময় হইয়া গেল। কিন্তু নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয়, বাবা গম্ভীরনাথ ময়দানের যে অঞ্চলে উপবিষ্ট সেখানে এক বিন্দু বারিও পড়িতে দেখা যায় নাই। সঙ্গী সন্ন্যাসীরা গম্ভীরনাথজীর মাহাত্ম্য জানিতেন। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, এ অলৌকিক কাণ্ডটি ঘটিয়াছে এই শক্তিধর মহাপুরুষেরই যোগশক্তির প্রভাবে।

এ ঘটনার পর যোগীবরের খ্যাতি সে অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং জনসমাগমের ফলে সন্ন্যাসীদের সেখানে তিষ্ঠানো দায় হয়।

ইহার উপর আর এক বিপদ উপস্থিত। উদয়পুরের মহারানার কানে এই যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষের কথাটি পৌঁছিয়াছে। নিজ প্রাসাদে গম্ভীরনাথজীকে নিবার জন্য বার বার তিনি লোক পাঠাইতেছেন। রাজদূতকে যোগীবর জানাইয়া দিলেন, কোনো গৃহস্থের আবাসে আজকাল আর তিনি পদার্পণ করেন না।

আক্কু কুরমীর গৃহে একবার তাঁহাকে বাধ্য হইয়া যাইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা করিতে হইয়াছিল ভক্তের প্রাণদানের তাগিতে।

মহারাজের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াও বিপদ এড়ানো গেল না, শোনা গেল, তিনি নিজেই যোগীবরের নিকটে আসিতেছেন। এ সংবাদ শুনিবামাত্র বৈরাগ্যবান্ মহাপুরুষ উদয়পুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অগণিত সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যেও গম্ভীরনাথকে পৃথক করিয়া না দেখিবার উপায় ছিল না। যে কোনো সাধুসন্তের মেলা ও পঙ্গতে তিনি উপস্থিত হইতেন, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই যেন তাঁহার নেতৃত্বটি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইত।

প্রসিদ্ধ সাধক, বাবা গোকুলনাথজী তাঁহার জীবনের স্মৃতিকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "আমার পূর্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে সারঙ্গকোটের

যোগীদের শিষ্য ছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আমার পিতার সঙ্গে সারঙ্গ-কোটের পীর এলাচীনাথের ভাণ্ডারায় গিয়া শুনিলাম যে, একজন 'রাজা যোগী' অমরনাথ হইতে আসিয়াছেন। আমিও পিতার সঙ্গে এই রাজা যোগীকে দেখিতে গেলাম। সেই ভাণ্ডারায় বারো শত জন সাধু উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গম্ভীরনাথ বাবাকে এক রাজা যোগীর মতোই সেদিন আমার মনে হইতেছিল।"

গৃহস্থ, তীর্থযাত্রী অথবা সাধু-সন্ন্যাসী যাঁহার কাছেই যোগীবর যাইতেন, তাঁহারই অন্তস্তলে প্রবাহিত হইত এক দিব্য আনন্দের স্রোত। তাঁহার সদা-প্রসন্ন, দিব্য মূর্তিটি হইতে সতত ঝরিতে থাকিত অপার মাধুর্য ও শান্তির ধারা।

একবার পুরীধামে জটিয়া বাবার আশ্রমে বাবা গম্ভীরনাথ কয়েক দিন অতিবাহিত করেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যগণ বাবার বড় প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের আমন্ত্রণেই তিনি উপস্থিত হন এবং তাহাদের সেবায় অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন।

এ সময়ে গম্ভীরনাথজীর সান্নিধ্য আশ্রমিকদের মধ্যে যে কল্যাণ-ধারা উৎসারিত করে তাহা সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"তখন যে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি, ইহা তাঁহারই কৃপায় চিরদিনের তরে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আশ্রমের সেবাকার্য সম্পন্ন করিয়া মাঝে মাঝে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহার নিকট যাইয়া বসিতাম। তাঁহার নিকট বসিলেই অনুভব হইত, আমার গুরু প্রদত্ত 'নাম' আপনা-আপনি স্রোতোবেগে চলিতেছে। কিছুক্ষণ পরে বাবা বলিতেন—যাও, এখন সেবার কার্যে যাও।"

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রয়াগের কুম্ভমেলার (১৮৯৩) কথাপ্রসঙ্গে মহাযোগী গম্ভীরনাথজীর এক মনোজ্ঞ আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যেরূপ তাকাইয়া একটু মাথা নাড়িয়া ইনি ইঙ্গিতে প্রাণ ভিজাইয়া দেন, তাহার বর্ণনা সম্ভব হয় না। ইনি অত্যন্ত স্বল্পভাষী। সাধুরা ইঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানেন। ইঁনি বহু শিষ্য সঙ্গে মেলাস্থলে উপস্থিত

ছিলেন। একদিন একজন ধনী ইঁহার আসনের নিকট পাঁচশত খণ্ড কম্বল রাখিয়া যান। বাবা গম্ভীরনাথ তখন ধ্যানস্থ ছিলেন, কিছু পরে নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, রাশীকৃত কম্বল। বাঁ হাতের অঙ্গুলি ঈষৎ নাড়িয়া বলিলেন—যাহাদের দরকার আছে, তাহাদিগকে এ সকল দিয়া দাও। তখনই সমস্ত বিতরণ করা হইয়া গেল।"

শক্তিধর মহাযোগী হইয়াও গম্ভীরনাথজী ব্যবহারিক জীবনে ছিলেন এক সহজ সুন্দর প্রেমিক পুরুষ। জাগতিক জীবনের নানা সমস্যা ও দ্বন্দ্ব বিক্ষোভের মধ্যে তাঁহার করুণাঘন রূপটিকেই সর্বাগ্রে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যাইত।

এক সময়ে গয়ার পাহাড়ে তাঁহার ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লোকসমাগমের ফলে এখানে মাঝে মাঝে তস্করের উপদ্রবও দেখা দেয়। একদিন নিশীথ রাত্রে একদল দুর্বৃত্ত ঢিল নিক্ষেপ করিতে থাকে। ভক্তেরা সকলেই বড় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বাবা গম্ভীরনাথের কানে এ সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। নির্বিকার মহাপুরুষ ধীর পদক্ষেপে দুর্বৃত্তদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। স্নেহমাখা স্বরে কহিলেন, "আচ্ছা, তোমরা এমন ক'রে ঢিল ছুঁড়ছো কেন? এসো, তোমাদের যা খুশী তা-ই আশ্রম থেকে নিয়ে যাও। কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।"

সেবক-শিষ্য নৃপৎনাথ গুরুজীর আদেশে ঘরের দরজা খুলিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, তস্করের দল ব্যাপার দেখিয়া ততক্ষণে কিছুটা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু লোভ তাহাদের প্রবল—অপহরণের এমন সুযোগই বা হঠাৎ কি করিয়া ছাড়ে? ধীরে ধীরে তাহারা আশ্রমে প্রবেশ করিল। অতিথিদের সেবার জন্য যাহা কিছু তৈজস-পত্র, ঘি-আটা ফলমূল ও কম্বল প্রভৃতি ছিল তাহা তড়িৎগতিতে সংগ্রহ করিয়া তাহারা ফিরিয়া চলিল। সদলবলে প্রস্থানের পূর্বে বহুলখ্যাত সিদ্ধ মহাত্মা গম্ভীরনাথজীকে প্রণাম করিতে এবং তাঁহার আশীর্বাদ নিতে কিন্তু তাহাদের ভুল হয় নাই।"

তস্করদের প্রতি করুণা ও সমবেদনায় মহাপুরুষের অন্তর তখন

ভরিয়া উঠিয়াছে। স্নেহাদ্র কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "বেটা, তোমরা সত্যিই অভাবগ্রস্ত, দুঃখে পড়েই এসব দুষ্কর্ম করছো, সবই বুঝতে পাচ্ছি। আবার দশ-পনের দিন পরে এসো, আজকের মতোই কিছু কিছু জিনিসপত্র সেদিনও মিলবে। কিন্তু লোকের ওপর অযথা দৌরাত্ম্য কখনো ক'রো না।"

দিব্য করুণার এই স্পর্শ দুর্বৃত্তদের অভিভূত করে এবং সেস্থান হইতে নত শিরে ধীরে ধীরে তাহারা প্রস্থান করে।

ভক্ত মাধোলাল বাবার আশ্রমের অধিকাংশ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাইয়া থাকেন। পরদিনই ব্যস্তসমস্ত হইয়া তিনি নূতন তৈজসপত্র এবং চাল-ডাল-ঘি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিলেন। এবার হইতে ঐ চোরের দল কিন্তু অভাবে পড়িলেই মাঝে মাঝে বাবা গম্ভীরনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। যোগীবর যেমনি তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করিতেন, ভক্তপ্রবর মাধোলালেরও তেমনি আশ্রম ভাণ্ডারের ক্ষতি পূরণ করিতে দেরি হইত না।

মাধোলালকে বার বারই এরূপ অনাবশ্যক ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে। একদিন গম্ভীরনাথজীর এ বিষয়ে হুঁশ হইল। কহিলেন, তিনি নিজে স্থানান্তরে না গেলে তো এ ব্যয়বাহুল্য কমানো কখনো সম্ভব হইবে না—তাই এবার গয়া অঞ্চল ত্যাগেরই সিদ্ধান্ত তিনি স্থির করিয়াছেন।

ভক্ত মাধোলালের নয়ন দুটি এবার অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। যুক্তকরে যোগীবরকে কহিলেন, "বাবা, শুধু এজন্যই আপনি আসন ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যাবেন! তাও কি কখনো হয়? তাছাড়া, চোরের দল আর কতই বা নেবে? আপনি এ নিয়ে মোটেই ভাববেন না।"

আর একদল তস্কর সেবার আশ্রমে উপস্থিত হয়। দুঃখের বিষয়, সেদিন তাহাদের দিবার মতো কোনো কিছু জিনিসপত্র সাধুদের কাছে একেবারেই ছিল না। অগত্যা নিজের ব্যবহারের কম্বলটি তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া গম্ভীরনাথ মহারাজ কহিলেন, "ছাখো, আজ তো এদের

দেবার মতো বিশেষ কিছুই নেই, তোমরা বরং আমার এই কম্বলটিই নিয়ে যাও।"

তস্করের দল, কি জানি কেন, মহাপুরুষের ব্যবহৃত কম্বলটি গ্রহণ করিতে তেমন উৎসাহ দেখায় নাই, নীরবে তাহারা আশ্রম ত্যাগ করিয়া যায়।

সবেমাত্র কিছুটা দূরে তাহারা চলিয়া গিয়াছে, এমন সময় একটি নূতন সাধু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "যাক, ভাগ্য খুব ভালো। আমাদের কাছে যে কয়টা টাকা রয়েছে, তার সন্ধান ওরা পায় নি। বেঁচে গিয়েছি বাবা।"

এ সাধুটি ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী নবাগত অতিথি, তাঁহারা গম্ভীরনাথের আশ্রিত বা ভক্তদের মধ্যে কেহ নহেন। তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে বাহির হইয়া কয়েক দিনের জন্য এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। গম্ভীরনাথজী কিন্তু এই অতিথিদেরও ছাড়িবার পাত্র নহেন। কথা কয়টি শোনামাত্র দৃঢ় স্বরে আদেশ দিলেন, "যাও এখনি ছুটে যাও। সব কয়টা টাকা ওদের দিয়ে এসো।"

এ আদেশ অমান্য করিবার সাহস সাধুদের নাই। ইহাদের একজন তখনই ছুটিয়া গিয়া ঐ তস্করদের হাতে টাকা পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন।

গুরু গোপালনাথজীর মহাপ্রয়াণের পর গম্ভীরনাথজীর জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা বলভদ্রনাথজী আশ্রমের মোহান্তের পদে বৃত হন। ইহার পর ক্রমান্বয়ে তাঁহার দুই শিষ্য দিলবরনাথজী ও সুন্দরনাথজী গদীতে আরোহণ করেন।

ইতিমধ্যে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে বাবা গম্ভীরনাথের খ্যাতি সাধুসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। কুম্ভমেলায় সমাগত প্রবীণ যোগী ও সন্ন্যাসীদের মধ্যেও তিনি কম স্বীকৃতি লাভ করেন নাই। তাই নাথযোগীদের মধ্যে অনেকেই ভাবিতেছিলেন, মোহান্ত পদ গ্রহণে তাঁহাকে কোনোক্রমে সম্মত করাইতে পারিলে ভাল হয়। ইহার ফলে

শুধু সম্প্রদায়ের মর্যাদাই বাড়িবে না, গোরখ্‌নাথজীর সাধনপীঠের কাজও সুষ্ঠুভাবে চলিবে।

কিন্তু এই বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসীকে গদী আরোহণে সম্মত করাইবে কে? বিশিষ্ট নাথপন্থী সাধকেরা প্রায়ই তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব নিয়া উপস্থিত হইতেন, নানা যুক্তি দেখাইয়া মিনতিও করিতেন।

কিন্তু সব কিছু শুনিবার পর যোগীবর গম্ভীর বদনে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেন—"নহী !"

ক্ষুণ্ণমনে সবাইকে নিরস্ত হইতে হইত।

গম্ভীরনাথের আশ্রয়লাভের জন্য প্রায়ই ভারতের দূর-দূরান্ত হইতে বহু সাধকের আগমন ঘটিত। কিন্তু তাঁহার কাছ হইতে দীক্ষা পাওয়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। কখনো কেহ বেশী অনুরোধ উপরোধ করিতে থাকিলে ভৎসনার সুরে তিনি বলিয়া উঠিতেন, "ক্যা, মঁয় এক পল্টন বনায়েঙ্গে ?"—অর্থাৎ, তোমাদের কি ইচ্ছা যে এবার আমি একটা ফৌজ গঠন শুরু করি ?

কিন্তু ঈশ্বরীয় বিধান উত্তরকালে তাঁহাকে এই 'পল্টন' গঠনে কিছুটা নিয়োজিত করে। কপিলধারার অরণ্য পরিবেশে সাধন-সমাহিত না থাকিয়া গম্ভীরনাথজী গোরখ্‌পুর মঠে স্থায়ীভাবে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। তাঁহার আশ্রয় পাইয়া বহু লোক তখন কৃতার্থ হয়।

গোরখ্‌পুর মঠের মোহান্ত সুন্দরনাথ ছিলেন তরুণ ও অব্যবস্থিত-চিত্ত। সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব, মন্দিরের পূজা ও অতিথিসৎকার প্রভৃতি দায়িত্বভার সবই ন্যস্ত ছিল তাঁহার উপর। কিন্তু এ দায়িত্ব বহনের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। মঠের সম্পত্তি পরিচালনায়ও নানা বিশৃঙ্খলা তখন ঘটিতেছিল। সকলে মিলিয়া এ দুরবস্থার কথা বার বার তাঁহারা গম্ভীরনাথের কানে তুলিতে লাগিলেন।

গুরুধামের এই সংকটের কথা শুনিয়া আর তাঁহার দূরে থাকা চলিল না। সুন্দরনাথজীকে মোহান্ত পদে রাখিয়া তিনিই তাঁহার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। মঠের কাজ এখন হইতে তাঁহার নিজ তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে আরম্ভ করিল।

১৯০৬ সাল হইতে স্থায়ীভাবে গম্ভীরনাথজী গোরখ্‌পুর মঠে আসিয়া বাস করিতে থাকেন এবং গোরখ্‌নাথজীর মন্দিরেই তাঁহার সাধন আসনটি স্থাপিত হয়। ফলে, উত্তর ভারতের বহু সাধক ও মুমুক্ষুর জীবনে তাঁহার কৃপার ধারা বিস্তারিত হইবার সুযোগ পায়।

মোহান্ত না হইয়াও বাবা গম্ভীরনাথ মঠের অধ্যক্ষরূপে সমস্ত কিছু কাজকর্ম নির্বাহ করিতেন। মঠের দৈনন্দিন পরিচালনায় চাঞ্চল্য ও বৈষয়িক জটিলতার অবধি নাই, অথচ নির্বিকার মহাপুরুষ নিতান্ত অবলীলায়ই সমস্ত কিছু দেখাশুনা ও পরিচালনা করিতেন। সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব, গৃহস্থদের উপদেশ দান, সাধু-মহাত্মাদের সেবা প্রভৃতি কর্তব্য যেমন অনায়াসে করিতেন, তেমনই প্রজাদের দুঃখকষ্ট ও নানাপ্রকার খুঁটিনাটি অভিযোগের সমাধানেও তাঁহাকে কম তৎপর দেখা যাইত না। এত কিছু কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যেও তাঁহার নির্বিকার সদাপ্রসন্ন রূপটি ফুটিয়া উঠিত এক অপরূপ মহিমায়।

মহাযোগীর দ্বৈতসত্তার এই রূপটি তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "যাঁহার নেতৃত্বাধীনে এত বড় একটা বিরাট সংসার এরূপ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতে লাগিল, তাঁহার দিকে যখনই দৃষ্টিপাত করা যাইত তখনই দেখা যাইত তিনি আত্মস্থ, তাঁহার দৃষ্টি বাহিরের দিকে মোটেই নাই। তিনি যেন একটি নির্বিকার শান্তির এবং তরঙ্গবিহীন পরিপূর্ণ আনন্দের এক প্রতিমূর্তিরূপে এই বিকারময় সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। কর্মচারিগণ বৈষয়িক কাজকর্মের নিবেদন করিতেছে—মনে হইত যেন ভক্ত নিজ মনে দেবপ্রতিমার নিকটে তাহার বক্তব্য বিষয় বলিয়া যাইতেছে। বলা শেষ হইল, তিনি সব কথা শুনিয়াছেন কিনা তিনিই জানেন। তিনি শুধু একটি 'হাঁ' বা 'নহী' কিংবা 'আচ্ছা' অথবা প্রয়োজনানুরূপ দু-একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদের কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দিলেন।

"এইরূপ—কখনও ভৃত্য আসিয়া হয়তো আদেশের প্রতীক্ষা

করিতেছে, কখনও কোনো কোনো দরিদ্র ভিক্ষুক সাহায্যের প্রতীক্ষা করিতেছে, কখনও কোনো আগন্তুক আশ্রমে অতিথি হইয়াছে, কখনও সাধুগণ বাদবিসংবাদ করিয়া মীমাংসার জন্য তাঁহার শরণ লইয়াছে, একই সময়ে হয়তো বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন প্রকার দরবার লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। তিনি কিন্তু অর্ধবাহ্য অবস্থাতেই মৃদুভাবে দু-একটি কথায়—যাহাকে যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়া, যাহাকে যাহা দেয় তাহা দিয়া, অতিথি-অভ্যাগতদিগের যথোচিত সেবার ব্যবস্থা করিয়া, আবার আত্মস্থ হইতেন। অথচ ইহাতেই সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত হইয়া যাইত। তাঁহার প্রদত্ত আদেশ বা উপদেশ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপারই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতেছে না, সকলের প্রতি, সকল কর্তব্যের প্রতি তাঁহার চক্ষু যেন অনবরত ধাবিত হইতেছে—অথচ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রায় সর্বদাই দেখা যাইত যে, সে চক্ষু নিমীলিত বা অর্ধনিমীলিত।”

মঠাধ্যক্ষরূপে গম্ভীরনাথজীর জীবন ছিল নিতান্ত সহজ ও অনাড়ম্বর। পরিধানে তাঁহার থাকিত কৌপীন ও তাহার উপর একখণ্ড শুভ্রবস্ত্র। গায়েও শুধু আর একখণ্ড বস্ত্র জড়ানো। পাদুকারূপে সর্বদা তিনি একজোড়া কাঠের খড়মই ব্যবহার করিতেন।

বর্ণ ছিল তাঁহার চম্পকের মতো, সারা দেহে অপূর্ব লাবণ্যের শ্রী। সুঠাম, সমুন্নত যোগীদেহে এক অপূর্ব ঋজুতা। স্কন্ধ বাহিয়া গুচ্ছ গুচ্ছ কেশভার নামিয়া আসিয়াছে। প্রশান্ত, দিব্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল গুম্ফ ও শ্মশ্রুরাজিতে শোভিত। হঠাৎ দেখিয়া কে বলিবে, ইনিই মহাশক্তিধর যোগীবর বাবা গম্ভীরনাথ? নূতন দর্শনার্থীদের মনে হইত, ইনি হয়তো সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ঘরের এক বর্ষীয়ান্ ভদ্রলোক।

তরুণ মোহান্ত যে দোতলা ভবনটিতে অবস্থান করেন, তাহারই নিম্নতলের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বাবা গম্ভীরনাথের বাস। সম্মুখের তক্তাপোশের উপর বিস্তারিত রহিয়াছে শুধু একটি কম্বলের শয্যা। ঐ প্রকোষ্ঠটিতে তিনি সমাধিস্থ অথবা অর্ধবাহ্য অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান করেন। আবার এটিই এক এক সময় হইয়া দাঁড়ায় তাঁহার

মঠ পরিচালনার অফিস। এখানেই নানা দিগ্‌দেশাগত ভক্তবৃন্দকে যোগীবর দর্শন ও উপদেশ দান করেন।

নিজের ভোজনব্যবস্থার মধ্যে কোনোপ্রকার পার্থক্য বা বিশিষ্টতা রাখিতে গম্ভীরনাথ সম্মত হইতেন না। নাথজীর ভাণ্ডারা প্রস্তুতের পর সাধারণ সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য যে আহার্য তৈরি হইত, তাহাই তিনি প্রতিদিন গ্রহণ করিতেন।

সন্ধ্যারতির শেষে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি গুরু গোপাল-নাথজীর সমাধি মন্দিরের বারান্দায় আসিয়া উপবেশন করিতেন। ভক্ত, মুমুক্ষু এবং অভ্যাগতেরা প্রধানত এই সময়েই লাভ করিত তাঁহার পুণ্যময় সান্নিধ্য। সারা দেহ মন তাঁহাদের অভিসিঞ্চিত হইত মহাপুরুষের কৃপাপ্রসাদ ও কল্যাণধারায়।

মঠের অতিথিসেবার দিক দিয়া গম্ভীরনাথজীর ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি ধরিবার উপায় ছিল না। সাধু ও গৃহী নানাশ্রেণীর অভ্যাগতই সর্বদা মঠে আগমন করিতেন, ইহাদের ভোজন ও শয়নের যে কোনো খুঁটিনাটি ব্যাপারের তত্ত্বাবধানে কোনোদিন তাঁহার ভুল হইতে দেখা যায় নাই। আশ্রমের এক কোণে কোনো নবাগত ভক্ত বা অতিথি হয়তো দুখানি শুষ্ক কাষ্ঠের অভাবে রন্ধন করিতে পারিতেছে না, সর্বজ্ঞ বাবার দৃষ্টি তাহা এড়ায় নাই। দেখা গেল, সেবক শিষ্যকে দিয়া অবিলম্বে তিনি জ্বালানি পাঠাইয়া দিয়াছেন।

অতিথি বা আশ্রিতদের যখন যে কোনো বস্তুর প্রয়োজন হইত, অর্ধবাহ্যজ্ঞানের অবস্থায়ও সে সব বুঝিয়া নিতে তাঁহার অসুবিধা হইত না। এমনই ছিল তাঁহার সর্বাত্মক দৃষ্টি।

অতিথিসেবার ব্যাপারে মাঝে মাঝে গম্ভীরনাথজীকে অলৌকিক শক্তির ব্যবহারও করিতে দেখা যাইত। বিভিন্ন ঋতুতে এবং মঠের নানা উৎসবে সাধুসন্ত ও ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোর রীতি ছিল। এ সময়ে নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতদের পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকিত না।

একবার মন্দিরে বহুসংখ্যক ব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইয়াছে। ভোজনের

সময় কিন্তু দেখা গেল, প্রায় দ্বিগুণ লোক আসিয়া উপস্থিত। আশ্রম-কর্মীদের তো চক্ষুস্থির। অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা ছুটিয়া গিয়া বাবার শরণাপন্ন হইলেন।

পবিত্র গুরুধাম ও গোরখ্‌নাথজীর মঠের মর্যাদার প্রশ্নটি এক্ষেত্রে জড়িত। গম্ভীরনাথজীর ধ্যানস্তিমিত নয়ন তাই তৎক্ষণাৎ সজাগ হইয়া উঠিল। প্রশান্ত ভঙ্গিতে নিজস্ব আসনটি ছাড়িয়া ধীর পদক্ষেপে তিনি তাঁহার পেটিকার নিকট গেলেন।

একখানি নূতন চাদর বাহির করিয়া সেবকের হস্তে দিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "ভোজনের সব কিছু সামগ্রী এ চাদরটি দিয়ে ঢেকে ফেল। তারপর এক এক প্রান্ত থেকে পরিবেশন করতে থাকো। কোনো ভয় নেই, নাথজীর কৃপায় কিছুরই অনটন হবে না।"

বাবার নির্দেশ অনুযায়ী আহার্য পরিবেশিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, দ্বিগুণ সংখ্যক লোক তৃপ্তি সহকারে আহার করার পরও যথেষ্ট খাদ্য উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

গ্রীষ্মকালে আশ্রমের বাগানগুলিতে আম পাকিতে শুরু করিলেই গম্ভীরনাথজী প্রতি বৎসর সাধুদের এক ভোজের আয়োজন করিতেন। অতিথিদের এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে আম এবং পুরি মালপোয়া পরিবেশন করা হইত। একবারকার নিমন্ত্রণে অপ্রত্যাশিতরূপে বহু অভ্যাগতের সমাগম হয়। হঠাৎ এত লোকের আগমনে আশ্রমিকেরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। বাজার হইতে আম কিনিয়া আনিবারও তখন আর সময় নাই। কর্মকর্তারা বাবার নিকটে গিয়া তাঁহাদের এ সংকটের কথা নিবেদন করিলেন।

তিনি কহিলেন, "কোনো ভয় নেই। সবগুলি আমের ঝুড়ি এখনি আমার তক্তাপোশের নিচে রেখে দাও। তারপর ঝুড়িগুলিকে একখণ্ড শুভ্র চাদর দিয়ে কিছুক্ষণ ঢেকে রাখো।"

অতঃপর সেবকেরা বাবার নির্দেশ অনুযায়ী ঢাকা-দেওয়া ঝুড়িগুলির একদিক হইতে আম তুলিয়া নিয়া পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, মহাপুরুষের যোগবিভূতির প্রভাবে ফলগুলি

নিঃশেষিত হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। অজস্র লোককে সেদিন ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করা হইল।

গোরখ্‌নাথজীর দোহাই দিয়াও কোনো কোনো সময়ে আর্ত ভক্তেরা বাবা গম্ভীরনাথের যোগৈশ্বর্যের প্রকাশ ঘটাইতে সক্ষম হইতেন। অতুলবিহারী গুপ্ত তাঁহার "মৃত্যুর পরে ও পুনর্জন্মবাদ" নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে এক প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন।

অতুলবাবু গোরখ্‌পুর গভর্নমেণ্ট স্কুলের একজন শিক্ষক। সেদিন এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, গম্ভীরনাথজীর অন্যতম ভক্ত, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তিনি গোরখ্‌নাথ মঠে গিয়াছেন। সেখানে পৌঁছিয়াই তাঁহারা এক করুণ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। শহরের এক বিশিষ্ট ধনী ও সম্ভ্রান্ত গৃহের বৃদ্ধা মহিলা গম্ভীরনাথজীর পা দুটি ধরিয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছেন। মহিলাটির পুত্র ব্যারিস্টারী পড়িতে বিলাত গিয়াছেন, গত চার মাস যাবৎ নাকি তাঁহার কোনো পত্রাদি পাওয়া যায় নাই। বিলাতস্থিত তাঁহার এক বন্ধুর নিকট পত্র লেখা হইয়াছিল কিন্তু তিনিও কোনো খোঁজখবর দিতে পারেন নাই। পুত্রটি বর্তমানে একরকম নিখোঁজ। ঝামেলা এড়ানোর উদ্দেশ্যে বাবা গম্ভীরনাথ শান্ত স্বরে কহিতে লাগিলেন, "মাঈ, আমি গরীব, সংসার-ত্যাগী লোক। বিলাতের খবর আমি কি ক'রে জানবো, বল?"

পুত্রবিরহবিধুরা মাতা ছাড়িবার পাত্রী নন। নানা অনুনয় বিনয়ের পর তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবা আমি ভালো ক'রেই জানি, আপনি ইচ্ছে করলেই আমার ছেলের সংবাদ এনে দিতে পারেন। ভগবান্ গোরখ্‌নাথের দোহাই, আমাকে আপনি দয়া করুন, এ মহাসংকট থেকে এবার উদ্ধার করুন।"

সৌম্যদর্শন যোগীবরের আননে ফুটিয়া উঠিল মৃদু হাস্যের রেখা। কহিলেন, "আচ্ছা মাঈ, তুমি শান্ত হও। দেখছি এ ব্যাপারে আমি কি করতে পারি।"

তখনি নিজের প্রকোষ্ঠে গিয়া গম্ভীরনাথজী দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর তাঁহাকে ফিরিতে দেখা গেল।

এবার মহিলাটিকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, "মাঈ, সামনের সোমবার তোমার পুত্র গোরখ্‌পুরে ঠিক হাজির হবে। এখন সে জাহাজে রয়েছে। তুমি তার জন্য কোনো দুশ্চিন্তা ক'রো না।"

যোগীবরের উপর বৃদ্ধা মহিলার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস প্রচুর। পুত্রের আগমনের সংবাদ ও তাঁহার মুখের আশ্বাস পাইয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন।

সেদিনকার এ ঘটনা সম্বন্ধে অতুল গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, "পরের বুধবার অপরাহ্ণ প্রায় চারটের সময়, অঘোরবাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার বাংলোতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একজন সাহেবী পোশাক পরিহিত হিন্দুস্থানী যুবক তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া অঘোরবাবু বাংলা ভাষায় বলিলেন, 'ইনিই সেই বৃদ্ধার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র। বাবার কথামতোই পরশু, সোমবার এখানে আসিয়াছেন। বাবার সহিত ইহার মায়ের সাক্ষাতের কথা ইনি এখনও কিছু জানেন না। আমি ইহাকে ও তোমাকে এখনই বাবার নিকট লইয়া যাইব। বাবাকে আমি মহামানব বলে মনে করি।...আজ তোমার বহু দিনকার একটা কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হইবে।"

"বাবা একা পূর্বমতো তাঁহার কুটিরের সম্মুখে দালানে বসিয়া আছেন। তরুণ ব্যারিস্টার বাবাকে দেখিয়াই অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলিলেন—'হ্যালো বাবা। ইউ আর হীয়ার!' অঘোরবাবু এবার বিরক্তভাবে বলিলেন, 'বাবা ইংরেজী জানেন না।' আমরা সকলে উপবিষ্ট হইলে ব্যারিস্টার সাহেব এবারে হিন্দীতে বলিলেন, 'আপনি এখানে কবে আসিলেন? আমি আজ জাহাজ হইতে নামিয়া ইম্পিরিয়াল মেল ধরিয়াছিলাম। কিন্তু সে গাড়িতে আপনি ছিলেন বলিয়া তো আমার মনে হয় না!'

"অঘোরবাবু ব্যারিস্টার সাহেবকে বলিলেন, 'তোমার কথায় মনে হইতেছে, তুমি বাবাকে যেন ইহার আগে অন্য কোনো স্থানে দেখিয়াছ। সত্য কি?'

"ব্যারিস্টার—'খুব সত্য। আমাদের জাহাজ যখন বোম্বাই হইতে এক দিনের পথ, তখন আমি বাবাকে আমার ক্যাবিনের ঠিক বাহিরে দেখিতে পাই। একজন সাধুকে প্রথম শ্রেণীর নিকটে ঘুরিতে দেখিয়া আমি বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার সহিত প্রায় পাঁচ মিনিট কথোপকথন করিয়াছিলাম। তাহার পর বাবা কিন্তু অন্যদিকে চলিয়া যান।'

"আমি কহিলাম, 'আপনার কি মনে পড়ে, কবে কোন্ সময় আপনি জাহাজে বাবার সহিত কথা কহিয়াছিলেন?'

"পাঠক জানেন, ঐ বুধবার সন্ধ্যার পূর্বে বাবা নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রায় ৪০ মিনিট উহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। অথচ ব্যারিস্টার সাহেব বলিলেন যে, ঐ সময় তিনি বাবাকে জাহাজের উপর দেখিতে পান। এ সমস্যার উত্তর এই যে, সূক্ষ্ম দেহে ঐ জাহাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

মহাযোগীর এরূপ যোগবিভূতির প্রকাশ অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেও দেখা যাইত। তাছাড়া, একই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে স্থূলদেহে তাহার আবির্ভাবের তথ্যও একদল ঘনিষ্ঠ শিষ্যের জানা ছিল।

গম্ভীরনাথজী তখন যোগসিদ্ধির উত্তুঙ্গ চূড়ায় অধিষ্ঠিত। সমাধি ও ব্রহ্মধ্যানেই তাঁহার দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত। কিন্তু এই সূক্ষ্মলোকচারী মহাপুরুষের দৃষ্টি হইতে স্থূল জগতের মানুষের ক্ষুদ্রতম ইচ্ছা বা অভাব-অভিযোগটুকু কখনো এড়াইয়া যাইতে পারিত না। গম্ভীরনাথজীর শিষ্য বিনোদবিহারী দাশগুপ্ত তাঁহার স্মৃতিলিপিতে ইহার কিছুটা উল্লেখ করিয়াছেন।

মঠে রামেশ্বর নামে এক কিশোর বয়স্ক ভৃত্য ছিল, সে বাবা মহারাজের সেবা-পরিচর্যা করিত। একদিন দ্বিপ্রহরে নাথজীর প্রসাদ পাইবার পর গম্ভীরনাথ তাঁহার প্রকোষ্ঠে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। এ সময়ে বিনোদবাবু চুপি চুপি ঘরে প্রবেশ করিলেন। বাবাজীর সেবার কোনো সুযোগই তিনি এ যাবৎ পাইতেছেন না। আজ তাঁহার

বড় ইচ্ছা হইয়াছে, রামেশ্বরের হাত হইতে টানা পাখার দড়িটি নিয়া নিজে কিছুক্ষণ নিদ্রারত বাবাকে ব্যজন করিবেন।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই বিনোদবাবু কিন্তু থমকিয়া গেলেন। গম্ভীরনাথজী খাটে উপবিষ্ট, আর বালক ভৃত্যটি তাঁহার কাছ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাবা সকালবেলায় বেদানা, আপেল প্রভৃতি ফলের অজস্র ভেট পান। উহারই দুই তিনটি হাতে নিয়া তিনি নাড়াচাড়া করিতেছেন। উদ্দেশ্য—নিরিবিলিতে বসিয়া খাওয়ার জন্য বালক ভৃত্যটিকে দুই চারিটি ফল দিবেন। দীনদুঃখী বালককে আদর করিয়া কিছু খাইতে দিবে এমন আপনজন কেহ নাই। তাই নিজেই গোপনে তাহাকে এগুলি বাহির করিয়া দিতেছেন। ঠিক এ সময়ে অপর একজনের আকস্মিক আগমনে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন।

বিনোদবাবু বুঝিয়া নিলেন, এ সময়ে সেখানে তাঁহার অবস্থান মোটেই সমীচীন নয়। তাই তৎক্ষণাৎ প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

মঠ-এস্টেটের কর্মচারীদের কেহ কোনো অপরাধমূলক কাজ করিলে গম্ভীরনাথজী তাহাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করিতেন। কখনো কখনো তাহাকে অপর কাজে বদলী করাও হইত। কিন্তু কোনো অপরাধীকে বরখাস্ত করার জন্য শিষ্যেরা চাপ দিলে তিনি রাজী হইতেন না। ব্যস্ত হইয়া বলিতেন, "বেচারা না খেয়ে মরবে? তোমরা কি ওকে আরো অভাব ও পাপের ভেতরে ঠেলে দিতে চাও?"

দীন দরিদ্র প্রতিবেশী এবং প্রজাদের তিনি ছিলেন পিতা এবং প্রতিপালক। কোনো প্রকার সাহায্য বা আশ্রয় একবার কেহ চাহিয়া বসিলে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। উত্তরকালে গম্ভীরনাথজীর সমাধি মন্দিরের সম্মুখে তাই অনেক দুঃস্থ প্রজাকে অশ্রুমোচন করিতে দেখা যাইত। তাহারা খেদোক্তি করিত, "বুড়ো মহারাজ! আপনি আজ কোথায় লুকিয়ে আছেন? যেখানেই

থাকুন—আমাদের ওপর আপনার কৃপাদৃষ্টি যেন থাকে। আমাদের দুঃখের কথা শোনবার, অভাব মোচন করবার যে আর কেউ নেই!"

শুধু মানুষই নয়, ইতর প্রাণীর দলও মহাযোগীর স্নেহস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। বারান্দায় অথবা মঠপ্রাঙ্গণে উপবেশন করিলেই কুকুরের দল আসিয়া তাঁহার পা ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িত। যত ধূলি-মলিনই উহারা থাকুক, বাবার সান্নিধ্য হইতে উহাদের নড়ানো যাইত না। কুকুরদের উত্ত্যক্ত করিতে গেলে তিনি নিজেই ভক্তদের নিষেধ করিতেন।

বিনোদবাবুর লেখায় এক রাত্রির একটি চমৎকার দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—"একদিন শেষরাত্রে বাবার ঘরে খট্‌খট্ শব্দ শুনিয়া দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিয়া দেখি, বাবা তাঁহার খাটের নিচু হইতে রুটি ছিঁড়িয়া ইন্দুরগুলিকে বাঁটিয়া দিতেছেন। হঠাৎ আমাকে দেখিয়া যেন লজ্জা পাইয়া তিনি খাটে গিয়া বসিলেন এবং আমার চিন্তাকে অন্যদিকে ধাবিত করিবার জন্য আমাকে তামাক সাজিতে বলিলেন। বাবার চক্ষে কেহ কখনও এক ফোঁটা জল দেখে নাই, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণটি যে অত্যন্ত কোমল ছিল, তাঁহার দৃষ্টি ও ব্যবহারের প্রতি পদে ইহার সাক্ষ্য পাইয়াছি।"

রেশমী বস্ত্র গম্ভীরনাথজী কখনো পরিতে চাহিতেন না। কোনো ভক্ত বা শিষ্য এরূপ পরিচ্ছদ ভেট দিলে তিনি উহা সরাসরিভাবে ফিরাইয়া না দিয়া নিকটস্থ সেবকশিষ্যকে কোথাও উঠাইয়া রাখিতে বলিতেন।

একবার একটি রেশমী বস্ত্র পরার জন্য তাঁহাকে বার বার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইলে আসল কথাটি প্রকাশ পায়। তিনি শান্তস্বরে বলিতে থাকেন, "যারা রেশম সুতো উৎপন্ন করে, তারা পোকার সঙ্গে গুটিগুলো ফুটন্ত গরম জলে ফেলে দেয়। জীবন্ত পোকাগুলো যাতে রেশম না কেটে ফেলে সেজন্যই এ ব্যবস্থা। কিন্তু এর ফলে বহু পোকার মৃত্যু ঘটে।"

সকলেই বুঝিলেন, এজন্যই রেশমী বস্ত্রের প্রতি বাবার এমন বিতৃষ্ণা।

১৯০০ সাল হইতে গম্ভীরনাথজী লোকগুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। যোগীজীবনের এক করুণাঘন অধ্যায় এ সময়ে উন্মোচিত হইতে দেখা যায়। বহু মুমুক্ষু ও ভক্ত তাঁহার নিকট আসিতে থাকে, ইহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক তাঁহার শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হয়। এ ভাগ্যবান্‌দের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই ছিল বেশী।

মহাযোগী গম্ভীরনাথজীর প্রতি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। তিনি নিজে যেমন যোগীবরের নিকট হইতে সাধনার নির্দেশাদি নিতেন, তেমনি মুমুক্ষু ও ভক্তদের মধ্যেও এই শক্তিধর মহাপুরুষের গুণকীর্তনে তাঁহার বিরাম ছিল না। ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথে গোস্বামীজী সদ্‌গুরু লাভের উপর অত্যধিক জোর দিতেন এবং এ সময়ে অনেককে তিনি বাবার আশ্রয় গ্রহণে উৎসাহিত করিতেন। তৎকালীন বাঙলার শিক্ষিতসমাজে বাবা গম্ভীরনাথের কথা গোঁসাইজীর উৎসাহেই বেশী প্রচারিত হয় এবং এই মহাযোগীর চারিদিকে ক্রমে ক্রমে আশ্রয় প্রার্থীর ভিড় জমিতে থাকে।

লোকমুখে গম্ভীরনাথজীর লোকোত্তর জীবনের মহিমা শুনিয়া বহু ভক্ত দর্শনার্থী আসিয়া জুটিতে থাকে। আবার অলৌকিকভাবে নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াও কম সংখ্যক লোক তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই।

কুমিল্লার এক ডাক্তার বড় ভগবদ্‌ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, একটি অপরিচিত স্থানে তিনি উপনীত হইয়াছেন। সেখানে এক সৌম্য, দিব্যদর্শন যোগী তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। এ অদ্ভুত স্বপ্নের নিহিতার্থ কি ডাক্তার তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁহার ব্যাকুলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

তাঁহার এক বন্ধু গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য। হঠাৎ একদিন ইহার সঙ্গে ডাক্তারের দেখা। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার অন্তরের আলোড়নের কথাও প্রকাশ হইয়া পড়ে।

বন্ধুটি সব কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, "তোমার স্বপ্নে দেখা এ মহাত্মা বোধহয় গোরখ্‌পুরের গম্ভীরনাথজী। তুমি অবিলম্বে তাঁরই কাছে শরণ নাও।"

কয়েকদিনের মধ্যেই ডাক্তার আকস্মিকভাবে তাঁহার যাতায়াত ব্যয়ের উপযুক্ত অর্থ প্রাপ্ত হন। ইহার পর গোরখ্‌পুরের মঠে পৌঁছিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বুঝিলেন—স্বপ্নে এই পবিত্র স্থানটির দৃশ্যই তিনি দেখিয়াছেন, আর বাবা গম্ভীরনাথই তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট গুরুদেব।

দীক্ষাদানের পর গম্ভীরনাথজীকে তিনি তাঁহার স্বপ্ন সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। উত্তরে বাবা বলেন, "বেটা, তোমার সংস্কার ছিল, আর তোমার সঙ্গে আমার পূর্বের সম্বন্ধও ছিল।"

নোয়াখালি জেলার সুদূর অঞ্চলের এক বালকও এরূপ স্বপ্নযোগে একবার গম্ভীরনাথজীর দিব্য মূর্তিটি দর্শন করে। এ মহাত্মাটি কে—বালকের তাহা জানা নাই। অথচ ইহার চরণোপান্তে পৌঁছিবার জন্য সে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। একদিন ফেণীতে আসিয়া কোনো পরিচিত ব্যক্তির গৃহে সে গম্ভীরনাথজীর আলোকচিত্র দর্শন করে। এটিই যে তাহার স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের প্রতিকৃতি তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

বালক ভক্তটির ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং পাথেয় সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই সে সুদূর গোরখ্‌পুরে উপনীত হয়। রাত্রি তখন প্রায় তিনটা। এসময়ে মঠে উপস্থিত হইয়া সে দেখে বাবা গম্ভীরনাথ বারান্দায় একটি লণ্ঠন জ্বালাইয়া রাখিয়া খাটিয়ার উপর নীরবে বসিয়া আছেন, দূরদেশাগত বালক ভক্তটির জন্যই তিনি যেন প্রতীক্ষমাণ। প্রণাম করামাত্রই যোগীবর স্নেহভরে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। জানাইলেন, তাহার বিশ্রামের জন্য শয্যার ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই ঠিক করা রহিয়াছে।

ময়মনসিংহের একটি ভক্ত বালকের অভিজ্ঞতাও কম বিচিত্র নয়। অল্প বয়সেই সে এক যোগসাধকের নির্দেশে ধ্যানাভ্যাস শুরু করে।

একদিন আসনে উপবিষ্ট থাকাকালে বাবা গম্ভীরনাথজীর দিব্য মূর্তিটি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠে। বিস্ময়ে আনন্দে বালক অধীর হয়, এরূপ কোনো মহাপুরুষের চিত্র ইতিপূর্বে সে কখনো দেখে নাই, তাঁহার কথাও কখনো শুনে নাই। কিছুদিন পরে বাবা গম্ভীরনাথের এক শিষ্যের সহিত বালকটির যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং স্বল্পকাল মধ্যে সে যোগীবরের আশ্রয় লাভ করে।

অলৌকিক উপায়ে যে ভক্তদের সহিত গম্ভীরনাথজী যোগাযোগ স্থাপন করেন তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এ সম্পর্কিত কার্য-কারণের ধরণ দেখিয়া মনে হয়, ঈশ্বর-নির্দিষ্ট বিশেষ কোনো বিধান অনুযায়ীই যোগীবর তাঁহার সম্ভাব্য শিষ্যদের অন্তরসত্তায় নিজেকে প্রতিফলিত করিতেন। অমোঘ-আকর্ষণের ফলে তাহারা একের পর এক ছুটিয়া আসিত।

যোগীবরের বিশিষ্ট শিষ্য, অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "স্বভাবতই মনে হয় যে, বাবাজী তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে আহ্বান ও আকর্ষণ করিয়া আপনার কৃপায় তাহাদের কোলে টানিয়া লইয়াছেন এবং তাহাদের জীবন সার্থক করিয়া দিয়াছেন। অথচ সাক্ষাৎ দর্শনের কালে কখনো তিনি ইহার কোনো পরিচয় প্রদান করিতেন না। অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে কেহ সাহস করিয়া কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রায়শই বলিতেন—'স্বপ্ন তো স্বপ্নই, সেদিকে তোমাদের এত মনোযোগ দেবার দরকার কি?' দু-একজন ভক্ত নিতান্ত আকুল হইয়া কখনো জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে তাহাদের তিনি সান্ত্বনা দানের সুরে বলিতেন, 'তোমাদের সাথে সম্বন্ধ ছিল' অথবা বলিতেন 'তোমার সংস্কার ছিল'।"

যোগীবর গম্ভীরনাথজীর অলৌকিক শক্তি দূর-দূরান্তের কত মুমুক্ষুকে টানিয়া আনিয়াছে, তাঁহার করুণার স্পর্শমণি কত মানুষকে রূপান্তরিত করিয়াছে! এইসব জীবন্ত মানুষদের সঙ্গে অশরীরী আত্মাও কখনো কখনো মহাপুরুষের কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

একবার একটি ভক্ত গম্ভীরনাথজীর নিকট সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। এ বিষয়ে তাঁহার স্ত্রীরও ব্যাকুলতা কম ছিল না। কিন্তু মহিলাটির দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা ঘটিয়া উঠে নাই। অল্পদিন মধ্যে আকস্মিকভাবে তাঁহার লোকান্তর ঘটে।

কিছুদিন পর ভক্ত স্বামীটির দীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ঠিক হইল। গম্ভীরনাথজীকে তিনি করজোড়ে কহিলেন, "বাবা, আমার স্ত্রীর বড় অভিলাষ ছিল, আমার সঙ্গে একত্রে দীক্ষা নেবেন। আজকের শুভ অনুষ্ঠানে তাঁর অপূর্ণ বাসনা চরিতার্থ হোক, তাঁর ওপর গুরুকৃপা বর্ষিত হোক—এ আমার একান্ত মিনতি।"

গম্ভীরনাথজীর কাছে বার বারই সকাতরে তিনি এ প্রার্থনাটি নিবেদন করিতে লাগিলেন।

অক্ষয়বাবু এ ঘটনার এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়াছেন—"যোগীরাজ প্রথমে ধীরভাবে উত্তর দেন, প্রেতাত্মাকে দীক্ষা দেওয়া কিরূপে সম্ভব? যোগীরাজের পক্ষে যে ইহা অসম্ভব নয়, সে বিশ্বাস দীক্ষার্থীর ছিল। স্বামীটির ঐকান্তিক ব্যাকুলতায় যোগীরাজ দুইখানি আসন স্থাপন করিতেই নির্দেশ দেন। দীক্ষার্থী স্বামীটি গুরুদেবের সম্মুখে একখানি আসনে উপবেশন করিলে, তিনি তাঁহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিতে আদেশ করেন।

"দীক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের অনুভব হইল যে, তাঁহার পত্নীও দীক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। গুরুদেবের অসাধারণ করুণায় তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। অনুভূতির উপর বিশ্বাস সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত তিনি বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলেন—'তাঁহার স্ত্রীর দীক্ষালাভ হইয়াছে কিনা?' গুরুদেব মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ'। অহেতুক কৃপাসিন্ধু গুরুদেব কৃপা করিয়া মৃতের আত্মাকেও আকর্ষণ-পূর্বক আপনার চরণপ্রান্তে আনিয়া দীক্ষাদান করিলেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় বিস্ময়ে ভক্তিতে এবং কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হইয়া পড়িল।"

শিষ্যদের কাছে যোগীবর গম্ভীরনাথের প্রধান উপদেশ ছিল,—'বিশ্বাস রাখ্‌না'—'বিচার কর্‌না।' গুরু এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণ ছিল তাঁহার প্রথমবাক্যের মূল কথা। দ্বিতীয়টি জ্ঞাপন করিত—সতত পরিবর্তনশীল মায়াচ্ছন্ন সংসার সম্বন্ধে বিচারের কথা। এই বিচারের মধ্য দিয়া জ্ঞান লাভের নির্দেশ তিনি দিতেন।

কিন্তু এ সমস্ত উপদেশ ছিল যোগীগুরু গম্ভীরনাথজীর বহিরঙ্গের কথা। অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রদত্ত দীক্ষা ও সাধন বহুতর সাধু সন্ন্যাসী ও শিষ্যের জীবনকে চরম সার্থকতায় ভরিয়া তুলিত। তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্যদের যেসব অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতা ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা শোনা যায়, তাহা কম বিস্ময়কর নয়।

শিষ্য ও ভক্তদের দৈনন্দিন জীবনের উপর যোগীবরের সদাসতর্ক দৃষ্টিটি প্রসারিত থাকিত। তাহাদের মনোলোকের সামান্যতম তরঙ্গটিও তাঁহার অন্তরে প্রতিফলিত হইত।

শক্তিধর যোগীবর দিনের পর দিন সারা সত্তাটি দিয়া আশ্রিতদের জীবনকে ঘিরিয়া রাখিতেন। সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক যে কোনো প্রয়োজনে 'বাবার' উপর তাহারা নির্ভর করিতে পারিত।

দর্শনার্থী-পরিবৃত যোগীবরের সম্মুখে এক নবাগত ভক্ত সেদিন বসিয়া আছেন। চা পানে তাঁহার আসক্তি যথেষ্ট, কিন্তু সংকোচবশত সেকথা এতক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। গম্ভীরনাথজী হঠাৎ অর্ধবাহ্য অবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আরে যাও যাও, জল্‌দি চা তো পী লেও।"

মঠের উত্থান-গৃহে বহিরাগত শিষ্যগণ কখনো কখনো সপরিবারে আসিয়া বাস করেন। মহিলা ভক্তদের কেহ কেহ হয়তো গহনাপত্র সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন। রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, বাগানটি নির্জন, তাই সবাই কিছুটা ভয়ে ভয়ে আছেন। অন্তর্যামী গম্ভীরনাথজী ঐ শিষ্যদের অবস্থা বুঝিয়া নিলেন। সতর্ক সংসারী অভিভাবকের মতো তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, গহনার বাক্স যেন তাঁহার প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দিয়া সকলে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়।

গম্ভীরনাথজী একদিন ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার নিজের আসনটিতে বসিয়া আছেন। চতুর্দিকে দর্শনার্থী, ভক্ত ও শিষ্যদের ভিড়। ধ্যান-স্তিমিত নেত্রটি উন্মীলন করিয়া যোগীবর অকস্মাৎ কক্ষের এক কোণে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। দেখা গেল, সেখানে একটি ঘৃতের টিন রহিয়াছে। উহা তখনই রৌদ্রে দিবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া আবার তিনি পূর্ববৎ ধ্যানমগ্ন হইলেন। কিন্তু ব্যাপারটি এখানেই থামিল না। কিছুক্ষণ পরে আবার তিনি নয়ন মেলিলেন। এবার ঘৃতের ভাণ্ডটি দেখাইয়া যোগীবর নির্দেশ দিলেন, উহা হইতে কিছুটা অংশ একটি ভিন্ন পাত্রে ঢালিয়া যেন অবিলম্বে হাতিশালার দোতলায় নিয়ে যাওয়া হয়।

একটু পরেই ঘৃত সম্পর্কিত রহস্যের সন্ধান মিলিল। ঐ দোতলার প্রকোষ্ঠে একজন ভক্ত তখন সস্ত্রীক বাস করিতেছিলেন। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী যোগীবরের বড়ই অনুরক্ত। একনিষ্ঠভাবে যোগীবরের সেবা-পরিচর্যা করা ছিল তাঁহাদের জীবনের প্রধান ব্রত। নানাবিধ ঘৃতপক্ক খাদ্য প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন তাঁহারা বাবার ভোজনের জন্য পাঠাইতেন। আজ ঐ ঘৃতটুকু প্রেরণ করিয়া গম্ভীরনাথজী তাঁহাদের সেবানিষ্ঠাকে দিলেন সস্নেহ স্বীকৃতি।

উপস্থিত সকলে দেখিয়া সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, আত্মসমাহিত মহাযোগীর কাছে ভক্ত-হৃদয়ের ক্ষীণতম ভাব-তরঙ্গটির মূল্য এতটুকুও তুচ্ছ নয়।

কান্তিচন্দ্র সেন গোরখ্পুর শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডাক্তার। বাবার প্রতি তাঁহার ভক্তি অপরিসীম। পরের চিকিৎসায় নাম করিলে কি হয়, নিজের পরিবারের কেহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে ডাক্তার সেন সর্বদাই গম্ভীরনাথজীর শরণাপন্ন হইতেন। বাবার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ধুনির বিভূতি অথবা 'আশাবরী ধূপ' লইয়া পরম নির্ভরতার সহিত তিনি রোগীকে ব্যবহার করিতে দিতেন। অগৌণে সে আরোগ্য লাভও করিত।

ডাক্তার সেনের পুত্র একবার মরণাপন্ন কাতর হয়। বাঁচিবার যখন কোনো আশাটি নাই, তখন তিনি যোগীবর গম্ভীরনাথের শরণ গ্রহণ

করেন। তাঁহার প্রদত্ত আশাবরী ধূপের ধোঁয়া নাসিকায় কয়েকবার দিবার পর বালকের রোগের উপশম ঘটে, শীঘ্রই সে সুস্থ হয়।

শিষ্যগণসহ গম্ভীরনাথজী সেবার হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। সেখানে তখন কলেরার প্রাদুর্ভাব, ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মারাও গিয়াছে। ভক্ত উমেশবাবুর সহিত তাঁহার মুহুরীর একটি অল্পবয়স্ক পুত্রও বেড়াইতে আসিয়াছে। হঠাৎ এই ছেলেটি কলেরায় আক্রান্ত হইয়া পড়িল। পরের ছেলেকে লইয়া এ এক মহা সংকট, উমেশবাবু মহা-পুরুষের চরণতলে পড়িয়া বার বার এ বালকটির প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাও মনে জাগে—এ বালক যে তাহার গরীব পিতার একমাত্র পুত্র, একমাত্র অবলম্বন—উমেশবাবুর পরিবারের কাহারো জীবনের পরিবর্তে কি এর প্রাণরক্ষা সম্ভব নয়?

গম্ভীরনাথজী এতক্ষণ মৌনী হইয়াই ছিলেন। মনে উমেশবাবুর ঐ চিন্তা উদ্‌গত হইতে দেখিয়াই তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার পর ছাড়িলেন প্রচণ্ড হুঙ্কার।

উমেশবাবুর বুঝিতে বিলম্ব হইল না, যোগীবর তাঁহার মনোভঙ্গীর মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন আত্মম্ভরিতার বীজ লুক্কাইত দেখিতে পাইয়াছেন। ভৎর্সনাসূচক হুঙ্কার এই কারণেই। ইহার মর্মার্থ—'হুঁ, তুমি এরই মধ্যে এমন মুক্তপুরুষ এবং বীর ব'নে গিয়েছো যে, নিজের ছেলের পরিবর্তে পরের ছেলের জীবন রক্ষায় অগ্রসর হতে চাও!'

অতঃপর ভক্তের কাতর ক্রন্দনে কৃপালু যোগীবরকে সেদিন কিন্তু বলিতে হয়—"আচ্ছা, বাঁচেগা।" বালকটির সংকট সেই দিনই কাটিয়া যায় এবং অচিরে সে রোগমুক্ত হয়।

ভক্ত ও শিষ্যেরা যতদূরেই অবস্থান করুক না কেন, যোগীবরের কল্যাণহস্তখানি সতত তাহাদের জন্য প্রসারিতথাকিত। বাবা মহারাজ একদিন গোরখ্‌পুর মঠে স্বীয় প্রকোষ্ঠমধ্যে বসিয়া আছেন। সম্মুখে বসিয়া আছেন কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত। অকস্মাৎ ব্যাকুলভাবে তিনি

জিজ্ঞাসা করিলেন, শিষ্য উমেশবাবুর সংবাদ তাহারা কেহ পাইয়াছে কিনা? তিনি কেমন আছেন?

উমেশবাবু তখন সপরিবারে হরিদ্বারে গিয়াছেন। সকলেই ভাবিলেন, নিশ্চয় তাঁহার কোনো বিপদ উপস্থিত। টেলিগ্রামে তাঁহার সংবাদ আনানো হইবে কিনা প্রশ্ন করিলে গম্ভীরনাথজী অর্ধনিমীলিত নয়নে কিছুক্ষণ মৌনী থাকিয়া মৃদুস্বরে শুধু বলিলেন "হাঁ, কাল দেখা যায়গা।" পরদিন তাঁহাকে এ বিষয়ে বলিতে গেলে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন,—ফিকির মৎ করো। অর্থাৎ, দুশ্চিন্তা ক'রো না।

কয়েকদিন পরে উমেশবাবুর চিঠিতেই বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া গেল। যোগীবর গম্ভীরনাথ যে সময়ে তাঁহার খোঁজখবর নিবার জন্য ব্যস্ত হন, ঠিক সেই সময়েই উমেশবাবু ট্রেনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। গাড়িতে খুব ভিড়। চলন্ত গাড়ির হাতল ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে হঠাৎ তাঁহার জীবননাশের উপক্রম হয় এবং তাঁহার স্ত্রী-পুত্রেরা গাড়ির ভিতরে থাকিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। এ আর্ত রব প্রবেশ ক'রে দূরে অবস্থিত বাবা গম্ভীরনাথের কর্ণে। মুহূর্তে বিগলিত হয় যোগীবরের হৃদয়, প্রাণরক্ষা করেন উমেশবাবুর।

আর একদিনের কথা। গম্ভীরনাথজী অর্ধবাহ্য অবস্থায় তাঁহার নিজের আসনটিতে বসিয়া আছেন। হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁহার ধ্যানাবেশ টুটিয়া গেল। নয়ন মেলিয়া ব্যস্তভাবে তিনি ভক্ত শিষ্যদের কহিলেন, "মাস্টারবাবু কি আজ মঠে ফিরে এসেছে?"

এই মাস্টারবাবু তাঁহার অন্যতম শিষ্য, নাম প্রসন্নকুমার ঘোষ। শিক্ষা বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গুরুর সেবার জন্য সে-সময়ে তিনি গোরখ্‌পুর মঠে বাস করিতেছিলেন। ঐ দিন রাত্রে প্রসন্নবাবু গাড়ি করিয়া মঠে ফিরিতেছেন, পথিমধ্যে হঠাৎ ঘোড়াটি উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং গাড়িটি ভাঙিয়া ফেলিয়া ছুটিতে থাকে। এভাবে তাঁহার জীবন সংশয় হইলেও প্রসন্নবাবু বিস্ময়করভাবে সামান্য আঘাতের মধ্য দিয়া সেদিন বাঁচিয়া যান।

গম্ভীরনাথজী একবার কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। সে সময়ে শহরে এক শক্তিমান্ সাধকের আগমন ঘটে। ইনি নাকি যোগশক্তি সহায়ে যত্রতত্র বিচরণ করিতে পারিতেন এবং ইহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী শুনা যাইতে থাকে। যোগবলে ইনি পর-দেহে প্রবেশ করিতে পারেন বলিয়াও যথেষ্ট খ্যাতি রটিয়া যায়। এজন্য তৎকালে অনেকে তাঁহাকে 'পরদেহ-প্রবেশী' মহাপুরুষ বলিয়া অভিহিত করিতেন। কেহ কেহ বলিত, ইহাকে ভক্তিভরে স্মরণ বা আহ্বান করিলে সূক্ষ্ম দেহে ইনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

বাবা গম্ভীরনাথের এক শিষ্য মাঝে মাঝে ইঁহার নিকট যাইতেন। একদিন এই শিষ্যটি স্বগৃহে আসিয়া ঐ মহাপুরুষের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট করেন এবং মনে মনে আহ্বান জানান। অগৌণে শক্তিধর মহাপুরুষটি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন।

ঐ শিষ্যটির নিকট তাঁহার সেদিনকার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনিয়া মনীষী অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "মহাপুরুষ তাঁহাকে দীক্ষা দিতে চাহিলেন, ভদ্রলোকটি তাহাতে ভীত হইলেন। তিনি এক মহাপুরুষের শিষ্য হইয়া কেন অন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন? কিন্তু এই মহাত্মাকেও বিনা প্রয়োজনে আহ্বান করা অন্যায় হইয়াছে—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। 'পরদেহ-প্রবেশী' তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার পূর্বলব্ধ মন্ত্রের শক্তি নষ্ট করিয়া তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দান করিবেন। এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, পশ্চাৎ দিক হইতে বাবাজীর জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্তি পরদেহ-প্রবেশীর দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং সেই দৃষ্টি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইয়া পরদেহ-প্রবেশীকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। তিনি সেই তেজে বিহ্বল হইয়া ভীত-চকিতভাবে নমস্কার করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। বাবাজীর মূর্তিও অন্তর্হিত হইল।"

গম্ভীরনাথ বাবার শিষ্যটি ততক্ষণে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বাবাজী মহারাজের স্নেহময় দৃষ্টি যে বর্মের মতোই তাঁহাকে সতত

আবরিত করিয়া রাখিয়াছে, এ সত্যটি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় সেদিন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। অনুতপ্ত শিষ্য অতঃপর গুরুজীর নিকট গিয়া আপন ত্রুটির জন্য বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকেন। অতঃপর বাবার স্নেহমধুর আশ্বাসবাণীতে তাঁহার বিক্ষুব্ধ হৃদয় শান্ত হয়।

গম্ভীরনাথজীর যোগবিভূতি ছিল অপরিমেয়। কখনো বাহিরের সংঘাতে, কখনো বা কৃপার প্রয়োজনে তাঁহার এই অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটিত—সাধারণ মানুষ ইহা দর্শনে হইত বিস্ময়বিমূঢ়।

কিন্তু নিজস্ব আচার আচরণে অথবা ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে মহাযোগীর লৌকিক ও সহজ মূর্তিটির দর্শনই সর্বদা মিলিত। মন্দির সংক্রান্ত মামলায় গম্ভীরনাথজী প্রধানত উকিলের পরামর্শের উপরই নির্ভর করিতেন। তাছাড়া, নিজে কোনো কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে চিকিৎসকের নির্দেশমতো ঔষধপথ্য গ্রহণে কখনো তিনি পরাঙ্মুখ হইতেন না, এসময়ে তাঁহাকে যেন অসহায় বালকের মতোই দেখা যাইত। রোগের যন্ত্রণাকে তিনি সহজভাবে গ্রহণ করিতেন, এবং অসুস্থ অবস্থায় চিরদিনই সেবক ও ডাক্তারদের পরামর্শ তাঁহাকে নির্বিচারে পালন করিতে দেখা যাইত।

একবারকার পীড়ায় তাঁহাকে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ভক্ত ও শিষ্যেরা তাঁহার এ অবস্থা দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন।

একনিষ্ঠ, বাঙালী সেবক-শিষ্য, কালীনাথ ব্রহ্মচারীর উপর তখন তাঁহার সেবাপরিচর্যার ভার। ব্রহ্মচারী একদিন সোজাসুজি বলিয়া বসিলেন, "বাবা, আপনি ইচ্ছে করেই এত কষ্টে ভুগছেন, আর আপনার যন্ত্রণা দেখে আমাদের প্রাণেও এত দুঃখ হচ্ছে। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ ক'রে আপনি এখনই এ রোগটা ঝেড়ে ফেলুন।"

বাবাজী কিন্তু নিরুত্তর। বার বার তাঁহাকে এই মিনতি করা হইলে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ক্যা, মঁ্যায় ভগবান্‌কী করনী পলট দেঙ্গে ?" —কেন, আমি কি ভগবানের বিধানকে উল্টে দেব ?

১৯১৪ সালের শেষের দিকে গম্ভীরনাথজীর একটি চোখ দুরারোগ্য

ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। স্থির হয়, তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া ভাল সার্জন দ্বারা অস্ত্রোপচার করা হইবে। নিতান্ত সুবোধ বালকের মতোই যোগীবর এ ব্যবস্থা মানিয়া নিলেন।

পরে কিন্তু বুঝা গেল, এই রোগ প্রকৃতপক্ষে মহাপুরুষের এক ছলনা মাত্র। নিজের নেত্র-চিকিৎসার অজুহাতে বহু মুমুক্ষুর নেত্র-উন্মীলনের ব্যবস্থাই সে সময়ে তিনি করিতে চাহেন। কলিকাতা প্রবাসের অবসরে বাংলার একদল ভাগ্যবান্ সাধনার্থীকে কৃপা বিতরণই মহাযোগীর আসল উদ্দেশ্য।

দীক্ষাদান বা শিষ্য গ্রহণে প্রথম জীবনে গম্ভীরনাথজীর বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত না। ১৯১৪ সাল অবধি খুব কম সংখ্যক লোককেই তিনি আশ্রয়দান করেন। বোধহয় সে অবধি তাঁহার দীক্ষিত শিষ্যের সংখ্যা একশতকেরও বেশী ছিল না।

তাঁহার এবারকার কলিকাতায় অবস্থিতি উন্মোচিত করে তাঁহার লোকগুরু জীবনের এক নূতনতর অধ্যায়। বহু মুক্তিকামী নরনারীকে তিনি কলিকাতায় অবস্থানকালে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। ইহার পরও অনেকে গোরখ্‌পুরে গিয়া তাঁহার চরণাশ্রয়লাভে ধন্য হয়। মরদেহ ত্যাগের পূর্বে গম্ভীরনাথজীর বাঙালী শিষ্যদের সংখ্যা হয় প্রায় ছয় শত।

দীক্ষাদান সম্পর্কে বাবা মহারাজের এই সময়কার ঔদার্য দেখিয়া তাঁহার পুরাতন শিষ্যেরা বিস্মিত হইয়া যাইতেন। তাঁহারা সহর্ষে বলিতেন, "বাবা যেন বাংলায় এসে কল্পতরু হয়ে বসেছেন।"

বাবা কলিকাতায় থাকাকালে কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী একদিন কয়েকজন শিষ্যসহ তাঁহার চরণ দর্শন করিতে আসেন। যোগীবর তখন আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর প্রতি বরাবরই গম্ভীরনাথজীর নিবিড় স্নেহ ছিল। তাই তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্য কুলদানন্দজীর আগমনে তিনি খুব হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, বিশ্রাম ভঙ্গ করিয়া তখনি সাগ্রহে সবাইকে নিজ কক্ষে ডাকাইয়া আনিলেন।

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কুলদানন্দজী জোড়হস্তে কহিলেন, "বাবা

গোঁসাইজীর প্রতি আপনার যেরূপ কৃপা ছিল, এ অধীনের প্রতিও যেন সেরূপ কৃপা থাকে।”

গম্ভীরনাথজীর চোখ দুইটি তখন আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সস্নেহে গোঁসাইজীর শিষ্যদের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বার বার তিনি আশ্বাস দিতে লাগিলেন—“হাঁ, হাঁ।”

অস্ত্রোপচারের পর চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় এবং গম্ভীরনাথজী গোরখ্‌পুর মঠে ফিরিয়া যান। কিছুদিন এখানে থাকিবার পর শেষ বারের মতো তিনি হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভ মেলায় যোগদান করেন।

ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নিকটে নাথজীর দলিচা। এ স্থানটি তখন নাথপন্থী সাধুসন্তদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে বহুতর ভক্ত শিষ্য রহিয়াছেন, তাহাদের নিয়া তিনি এই ভাড়াটে বাড়িতে থাকিবেন, ইহাই সকলের ইচ্ছা।

বাবা গম্ভীরনাথ কিন্তু সকল ব্যবস্থা উল্টাইয়া দিলেন। প্রথমে উপস্থিত হইলেন নাথজীর দলিচায়। তাঁহার উপস্থিতিতে সমাগত সন্ন্যাসীদের মধ্যে আনন্দ-হিল্লোল বহিয়া গেল। কিন্তু এই জনাকীর্ণ দলিচায় গুরুদেবের কষ্ট হইবে ভাবিয়া শিষ্যেরা তাঁহাকে ভাড়া বাড়িতেই স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছুক।

দলিচার তরুণ প্রবীণ সমস্ত সাধুরা কিন্তু এ ব্যবস্থার বিরোধী। সোৎসাহে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, “না—না, বাবা আমাদের এখানেই থাকবেন। তিনি যে আমাদেরই একান্ত নিজস্ব ধন। আমরা কখনই তাঁকে ছেড়ে দেবো না।”

ইহাদের অনুরোধ বাবা এড়াইতে পারিলেন না, গুটিকয়েক শিষ্যসহ এই দলিচাতেই রহিয়া গেলেন। অপর শিষ্যেরা অন্যত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নাথজীর দলিচায় অবস্থান করার কালে সহস্র সহস্র লোক বাবা গম্ভীরনাথকে দর্শন করিতে আসিত। শুধু নাথপন্থী সাধু এবং মোহান্তেরাই নয়, সর্বশ্রেণীর নরনারীই এই মহাশক্তিধর যোগীকে দর্শন

করিতে তখন আগ্রহব্যাকুল। অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়া তাহারা কৃতকৃতার্থ হইত।

হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভ হইতে ফিরিবার পর যোগীবর মাত্র দুই বৎসর স্থূল শরীরে বর্তমান ছিলেন। অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে তাঁহাকে যাঁহারা এ সময়ে লক্ষ্য করিতেন, তাঁহাদের দৃষ্টি সমক্ষে ফুটিয়া উঠিত মহাপুরুষের নূতনতর দিব্যরূপ। তাছাড়া, দেখা যাইত, একদিকে যেমন জাগতিক বস্তুনিচয়ের উপর তাঁহার ঔদাসীন্য বাড়িয়া যাইতেছে, তেমনই ধীরে ধীরে তিনি ডুবিয়া যাইতেছেন রহস্যঘন অন্তর্মুখীনতার গভীরে।

উদ্বিগ্ন শিষ্যেরা দৈহিক স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি শুধু সংক্ষেপে উত্তর দিতেন, "আচ্ছা হ্যায়।"

গোরখ্‌পুরের সন্নিকটে যোগীচৌক। জাগ্রত শিবলিঙ্গের এটি এক মহাসিদ্ধ পীঠ। সে-বার শিবরাত্রির সময় গম্ভীরনাথজী সেখানে যাইয়া তিন দিন অতিবাহিত করিয়া আসিলেন। লক্ষ্য করা গেল, শরীর তাঁহার বড়ই দুর্বল হইয়া গিয়াছে। কয়েকদিন পরে যোগীবর সকলকে জানাইয়া দিলেন, শীঘ্রই তিনি এবার মফঃস্বলে যাইবেন।

কথাটি শুনিয়া সকলে ভাবিলেন, বাবা হয়তো মঠের জমিদারীর কোনো বিশেষ স্থানে গিয়া কিছুকাল বিশ্রাম নিতে চান। উৎকণ্ঠিত শিষ্যেরা প্রশ্ন তুলিলেন, তাঁহার এই দুর্বল শরীরে অন্য কোথাও নড়াচড়া করা কি ভাল হইবে?

যোগীবর সহাস্যে উত্তর দিলেন, "তোমাদের দুশ্চিন্তার কোনোই কারণ নেই। স্থানটি পরম নির্জন রমণীয়। সেখানে স্বাস্থ্য ভাল হবারই তো সম্ভাবনা।"

মফঃস্বলে যাওয়ার দিন স্থির করিতে হইবে। পঞ্জিকা দেখার পর শুভ সময় ঠিক হইল, ৮ই চৈত্র, বারুণী ত্রয়োদশীর দিন। এ মফঃস্বল যাত্রার বিশেষ উদ্দেশ্য কি, গন্তব্য স্থানটিই বা কোথায়, সে রহস্য উদ্‌ঘাটনে কেহ সেদিন সমর্থ হয় নাই।

বাবার শরীর কিন্তু ক্রমে আরও খারাপ হইতেছে। এ অবস্থায় কি করিয়া তিনি মফঃস্বলে যাইবেন ? শিষ্যদের মিনতিপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে গম্ভীরনাথজী যাহা বলিলেন, তারা আরও বিভ্রান্তিকর, আরও গাঢ় কুজ্ঝটিকায় আবরিত।

উদাসভাবে তিনি কহিলেন, "সেখানে তো বিপদের কোনো কারণ নেই। সেখানে একবার গেলে স্বাস্থ্য ভাল হবেই,—সে যে সকল কিছু ভালমন্দের অতীত—চিরশান্তিধাম !"

সেই পূর্ব নির্দিষ্ট মহাবারুণী তিথিতেই, ১৯১৭ সালের ২১শে মার্চ তারিখে, মহাযোগী তাঁহার মরদেহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার কথিত রহস্যময় 'মফঃস্বলের' গূঢ় অর্থ এবার সকলে বুঝিতে পারিলেন।

স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী

কানপুর জেলার মৈথেলালপুর এক সময়ে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও ভক্ত কবিদের জন্মস্থানরূপে খ্যাতি অর্জন করে। পণ্ডিত মিশ্রীলাল মিশ্র এই গ্রামেরই এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। উদারচেতা ও ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-রূপেও আবালবৃদ্ধবনিতার তিনি সম্মানভাজন। সেদিন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে, হঠাৎ কোথা হইতে তাঁহার গৃহে তিনটি সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত। প্রণাম সমাপনের পর পণ্ডিত মিশ্রীলাল যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় প্রাচীনতম সাধুটি তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "মিশ্রীলাল, আজ রাত্রে তোমার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। কালে সে বহু মুমুক্ষু মানবকে দেবে পথের সন্ধান। কিন্তু একটা কথা। এ শিশুর জন্মের পর কাউকে তার মুখ দর্শন করতে দেবে না, আর ভূমিষ্ঠ হবার পরই আমাদের তুমি অন্তঃপুরে ডেকে নিয়ে যেয়ো।"

মিশ্রীলালের পত্নী আসন্নপ্রসবা। সেই রাত্রেই—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তিনি সর্বসুলক্ষণযুক্ত এক সন্তান প্রসব করেন। সন্ন্যাসীদল শিশুকে দর্শন করার পর সেদিন গৃহের অঙ্গনে হোম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। পরদিন প্রত্যূষেই কিন্তু তাঁহাদের আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

পণ্ডিতের নবজাত সন্তানকে দেখিবার জন্য ভোর হইতেই ভিড় জমিতে থাকে। তাছাড়া, অপরিচিত সন্ন্যাসীদের আগমন ও হোমের কাহিনী শুনিয়াও লোকে সেদিন অতিমাত্রায় কৌতূহলী হইয়া পড়ে। দূরদূরান্ত হইতে আসিয়া তাহারা মিশ্রীলালের গৃহে জড়ো হইতে থাকে। শিশু মোতিরামকে কেন্দ্র করিয়া পণ্ডিতের অঙ্গনে সেদিন অপূর্ব আনন্দের বন্যা বহিয়া যায়।

উপরোক্ত ঘটনার পর আঠারো বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই গৃহেই আবার ঘটিল আর একটি নবজাতকের আবির্ভাব। বৃদ্ধ পণ্ডিত মিশ্রীলাল আজিকার দিনে আরও বেশী আনন্দোচ্ছল। তাঁহার প্রাণ-প্রিয় মোতিরামের যে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

বার বার তিনি পৌত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া চঞ্চল হইতেছেন, মনে মনে গড়িয়া তুলিতেছেন সুখ-স্বপ্নের প্রাসাদ। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই সেদিন সবকিছু হঠাৎ হয় বিপর্যস্ত। পণ্ডিতের গৃহে ক্রন্দনের রোল শোনা যায়, গ্রামবাসীরা উচ্চকিত হইয়া উঠে। সকলে শুনিয়া বিস্মিত হয়, মিশ্রীলালের পুত্র, প্রতিভাবান্ যুবক মোতিরাম, চিরতরে গৃহ ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মোতিরাম প্রমাদ গণিয়াছেন। সংসার জীবনের এই নূতনতর বন্ধনকে মানিয়া নিতে তাঁহার মন কোনো-মতেই সেদিন সায় দেয় নাই। জীবনের চরম সিদ্ধান্তটি তখনি তিনি গ্রহণ করেন। তরুণী ভার্যা ও নবজাত সন্তানের মায়াপাশ চিরতরে ছিন্ন করিয়া বহির্গত হন তিনি মুক্তির সন্ধানে।

আঠার বৎসর পূর্বে পণ্ডিত মিশ্রীলালের গৃহে নবজাত পুত্রের আবির্ভাব যে আনন্দধারা উৎসারিত করে, আজিকার দিনে তাহারই অন্তর্ধান সেই স্রোতধারাকে খণ্ডিত করিয়া দিয়া গেল।

বিষয়বিরক্ত মোতিরামের এই গৃহত্যাগ সূচনা করে এক সার্থক যোগীজীবনের। ভাস্করানন্দ সরস্বতীরূপে ভারতের অধ্যাত্মগগনে উত্তরকালে তাঁহার অভ্যুদয় ঘটিতে আমরা দেখি।

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণগৃহের সন্তান মোতিরাম। কিশোর বয়স হইতেই সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য অধ্যয়নে ছিল তাঁহার প্রবল আসক্তি। মেধা ও প্রতিভা ছিল তাঁহার প্রচুর, তাই সমস্ত কিছু পাঠ তিনি অতি সহজেই আয়ত্ত করিতেন। সতীর্থ ও শিক্ষকগণ ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন।

তীক্ষ্ণধী বালকের অন্তর্লোকে কিন্তু সদাই বহিয়া চলে বৈরাগ্যের এক অন্তঃসলিলা ধারা। মাঝে মাঝে ইহার বহিঃপ্রকাশ সকলকে সচকিত করিয়া তোলে। পুত্রের ভাবান্তর দর্শনে মিশ্রীলাল মাঝে মাঝে শঙ্কিত হইয়া পড়েন। তাইতো! সংসারের মায়া বন্ধনে তাঁহাকে না জড়াইতে পারিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন কই? আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত এক রূপলাবণ্যবতী কন্যার সহিত মোতিরামের বিবাহ দিলেন।

শাস্ত্রপারঙ্গম না হইলে ব্রাহ্মণ সন্তানের চলিবে কেন? তাই বিবাহের পর অধ্যয়নের জন্য মোতিরাম কাশীধামে প্রেরিত হন।

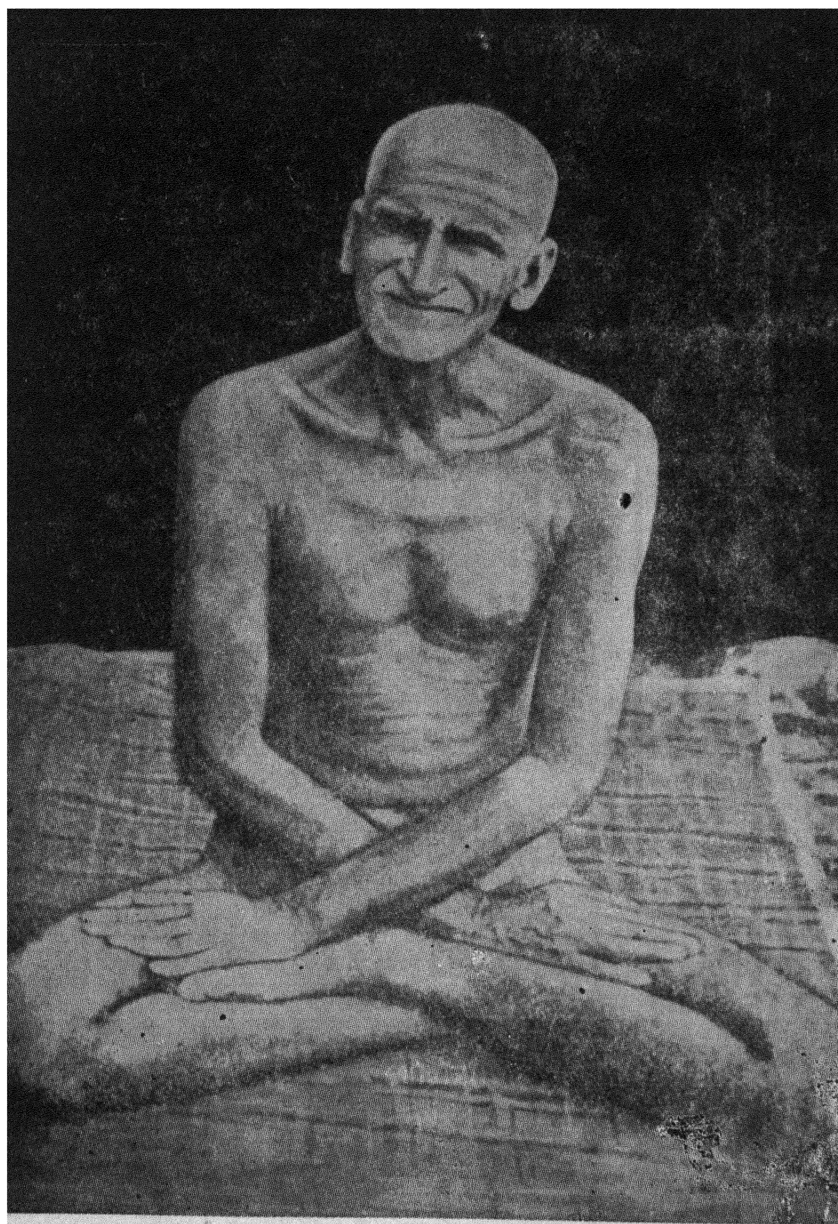
প্রতিভাবান্ তরুণ সতের বৎসর বয়সে তাঁহার অধ্যয়ন শেষ করিয়া মৈথেলালপুরে আসিলেন। কিন্তু বৈরাগ্যের যে আগুন এতদিন তাঁহার অন্তস্তলে আত্মগোপন করিয়া ছিল, কাশী হইতে ফিরিবার পর তাহা আরো তীব্র হইয়া উঠে। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও সম্মান, পরিবারের স্নেহবন্ধন, ভোগবাসনা, কোনো কিছুই সেদিন তাঁহাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

অজানা অমৃতলোকের হাতছানিটি পৌঁছিয়া গিয়াছে তাঁহার হৃদয়ে। উদাসীন মোতিরাম তাই ক্রমেই গভীর ও অন্তর্মুখীন হইয়া উঠেন। এমনই সময়ে পুত্রের এই জন্ম-সংবাদ!

মোতিরামকে সেইদিনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইল। মধ্যরাত্রিতে তিনি গৃহত্যাগ করিলেন।

মুমুক্ষু পরিব্রাজকরূপে অতঃপর তিনি উজ্জয়িনীতে উপনীত হন। মহাকালেশ্বর শিবের অধিষ্ঠানক্ষেত্র এই পুণ্যভূমি। কলনাদিনী শিপ্রার তটপ্রান্তে সারি সারি মন্দির ও স্নানের ঘাট। অসংখ্য তীর্থযাত্রী আর ভক্ত সাধকের পূজা ও স্তবগানে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত। পথেঘাটে দণ্ডী সন্ন্যাসী ও পরমহংসের ভিড়। মোতিরাম স্থির করিলেন, এই পবিত্র তীর্থে কিছুকাল অবস্থান করিবেন।

একবস্ত্রে কপর্দকহীন অবস্থায় তিনি বাহির হইয়াছেন—তাই আকাশবৃত্তি ছাড়া আর গত্যন্তরই বা কি? প্রত্যূষে পুণ্যতোয়া শিপ্রায়



স্বামী ভাস্করানন্দ

অবগাহন করিয়া মহাকালেশ্বর মন্দিরে ধ্যানরত থাকেন, কখনো বা উজ্জয়িনীর তীরে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বসিয়া থাকেন।

উজ্জয়িনীর শ্মশানে মোতিরাম কিছুকাল অতিবাহিত করেন। বহু যোগী, তান্ত্রিক ও বৈদান্তিক বহু সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যেও তিনি আসেন, কিন্তু তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের তৃষ্ণা নিবারিত হয় কই? কে দিবে তাঁহাকে মুক্তিপথের সন্ধান? অভীষ্ট সিদ্ধির চাবিকাঠিটিই বা রহিয়াছে কাহার হাতে?

মোতিরাম আবার পরিব্রাজনে বাহির হইয়া পড়েন। ইহার পর তির-চার বৎসরকাল তিনি দ্বারকায় কাটান, এক প্রসিদ্ধ জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীর নিকট বেদান্ত অধ্যায়ন করেন।

উজ্জয়িনীতে ফিরিয়া আসিয়া মোতিরাম কৃতসংকল্প হন সন্ন্যাস গ্রহণে। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় সাতাশ বৎসর।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষরূপে সে সময় দাক্ষিণাত্যে শ্রীমৎপূর্ণানন্দ সরস্বতীর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত। মোতিরাম তাঁহার কৃপা লাভ করেন এবং তাঁহার দ্বারাই দীক্ষিত হন সন্ন্যাসধর্মে।

পূর্বাশ্রমের সমস্ত পরিচয় এইবার নিঃশেষে মুছিয়া গেল, যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া তিনি গুরুপ্রদত্ত নূতন নাম গ্রহণ করিলেন—ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

ইহার পর রেবানদীর তটস্থিত এক শ্মশানে থাকিয়া কিছুকালের জন্য তিনি কঠোর সাধনায় রত হন।

সন্ন্যাস জীবনের প্রথা অনুযায়ী স্বামী ভাস্করানন্দ একবার তাঁহার জন্মস্থান মৈথেলালপুর দর্শন করিতে আসিলেন। যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া ইতিমধ্যে সে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছে।

আত্মপরিজনেরা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মিনতি ও অশ্রুজল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মোতিরামকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

ইহার পর শুরু হয় ভাস্করানন্দের তীর্থ পরিক্রমা। প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর ব্যাপিয়া ভারত ভ্রমণের পর তিনি হরিদ্বারে উপস্থিত হন। এইসময়ে সৌভাগ্যক্রমে বিখ্যাত বৈদান্তিক অনন্তরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। এই স্বনামধন্য আচার্যের নিকট শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তিনি ছাড়িলেন না। তাঁহার সাহায্যে বেদান্তশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ তিনি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইলেন।

অতঃপর শিবপুরী কাশীধামের আহ্বান আসিয়া যায়। পুণ্যতোয়া গঙ্গার তটে পৌঁছিয়া ভাস্করানন্দ এবার যে কৃচ্ছ্রব্রত অবলম্বন করেন, তাহা তাঁহার সাধনজীবনের এক বিশিষ্ট অধ্যায়। আহার বিহার সমস্ত কিছু তখন পরিত্যাগ করিয়াছেন। গঙ্গার বালুতটে শীত ও গ্রীষ্মে সমভাবে অবস্থিত থাকিয়া বিশ্বনাথজীর আরাধনায় তিনি নিমগ্ন। একনিষ্ঠ সাধকের অন্তরে অহোরাত্র চলিতেছে ইষ্ট ধ্যান। মুক্তির সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য তখন তিনি জীবন পণ করিয়া তপস্যায় বসিয়াছেন।

'বেদব্যাস' পত্রিকার সম্পাদক ভূধরবাবু তাঁহার এ সময়কার তপশ্চর্যার কাহিনী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"স্বামীজী তীব্র শীতের সময় বিবস্ত্র দেহে জলের উপর ঠিক একখণ্ড কাষ্ঠের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে বড় আনন্দ বোধ করিতেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় উত্তপ্ত বালুকার উপর নিজ দেহকে শায়িত করিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। সে সময়ে তাঁহাকে কেহ কোনোরূপ আহার করিতে দেখে নাই। যদি কেহ ভক্তি করিয়া কোনো আহার্য সামগ্রী নিকটে যাইয়া ধরিতেন, তিনি দ্রব্য-গুলির প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিয়া স্মিতহাস্যে সে-স্থান পরিত্যাগ করিতেন। ক্রমে এত শীর্ণ হইয়া পড়েন যে উত্থানশক্তি পর্যন্ত রহিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় প্রায়ই সমাধিস্থ থাকিতেন।"

কঠোরতপা স্বামীজীর ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং যোগবিভূতির কথা তৎকালে কাশীধামের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। ফলে ভক্ত ও কৌতূহলী জনতার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। দর্শনার্থীদের ভিড়

তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত, তাই স্বামীজী মাঝে মাঝে সাঁতরাইয়া গঙ্গার অপর পারে রামনগরে গিয়াও আশ্রয় নিতেন। সেখানে তাঁহার ধ্যান-ধারণার মিলিত প্রচুর অবকাশ। আবার স্বেচ্ছামতো তিনি কাশীতে ফিরিয়া আসিতেন।

ইহার পর দুর্গাবাড়ির নিকটে আনন্দবাগে স্বামীজী তাঁহার আসন স্থাপন করিলেন। এ উদ্যানের মালিক আমেটির রাজা। তাঁহারই সকাতর মিনতিতে এখানে আসেন—কিন্তু স্বামীজীর স্পষ্ট নির্দেশ থাকে যে, এখানে কোনো দর্শনার্থীকেই প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না এবং কয়েকজন প্রহরী এজন্য নিযুক্ত থাকিবে।

প্রহরার ব্যবস্থার ঠিক মতোই হইল। কিন্তু জনতা এড়ানো নিতান্ত সহজ হইল না।

ভাস্করানন্দের যোগৈশ্বর্যের খ্যাতি তখন দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মুমুক্ষু কৌতূহলী আগন্তুকদের কোলাহলে এবার নিস্তব্ধ আনন্দবাগ দিনের পর দিন মুখরিত হইতে থাকে। স্বামীজী অবশেষে তাঁহার কৃপার দুয়ারটি উন্মুক্ত করিলেন। সারাদিন ভূগর্ভস্থ গৃহে সাধন-ভজন করার পর তিনি যখন উপরে উঠিয়া আসিতেন, তখন সকলে তাঁহার দর্শন ও উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইত।

এ সময়ে একদিন এক কৌতূহলী রাজা ভাস্করানন্দজীকে পরীক্ষা করিতে উৎসুক হন। এজন্য কয়েকজন রূপসী গণিকাকে তিনি নিযুক্ত করেন। তাহাদের প্রতি নির্দেশ থাকে, যে-কোনো প্রকারে স্বামীজীর চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইলে তাহাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

গভীর নিশীতে এই নারীদের আনন্দবাগে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল। আর রাজাবাহাদুর নিকটস্থ এক ঝোপের আড়ালে নীরবে লুকাইয়া রহিলেন।

স্বামীজী তখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ভূগর্ভগৃহে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বারাঙ্গনাগণ কিন্তু দ্বারের কাছে আসিয়া বার বারই ফিরিয়া যাইতেছে।

মহাপুরুষের প্রশান্ত মহিমময় মূর্তির মধ্যে কি তাহারা দেখিয়াছে তাহারাই জানে, কিন্তু সকলেরই হৃদয় কোন্ এক অজানা শঙ্কায় কম্পিত হইতেছে। রাজাবাহাদুরের প্রলোভন আর তাহাদের উৎসাহিত করিতে পারিতেছে না।

রাত্রির শেষ যাম। হঠাৎ এসময়ে স্বামীজীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। দ্বারে সমাগত নারীদের উচ্চ স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "যদি বিন্দুমাত্র প্রাণের মায়া থাকে, এ মুহূর্তে তোমরা স্থান ত্যাগ ক'রে যাও।"

রমণীদের মধ্যে শুধু একজন কিছুটা সাহস সঞ্চয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অপরেরা ভীত সন্ত্রস্তভাবে ছুটিয়া আনন্দবাগের প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া পৌঁছিল।

স্বামীজীর সম্মুখে দাঁড়ানো নারীটি হঠাৎ আর্তস্বরে চীৎকার শুরু করিয়া দেয়। অতর্কিতে কোথা হইতে একটি বৃহদাকার সর্প তড়িৎ-বেগে আসিয়া তাহার পা দুইটি বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে।

গণিকাটিকে ঐ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া নির্বিকারভাবে স্বামীজী তাঁহার ভূগর্ভগৃহ হইতে উপরে উঠিয়া আসিলেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া রাজাবাহাদুরের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সর্পবেষ্টিতা রমণীকে সেই অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়া ভয়ার্ত হৃদয়ে সদলবলে তিনি পলায়ন করিলেন।

সূর্যোদয়ের পর ঐ নারীর নাগপাশ মোচন হয়—সর্পটি কোন্ এক অলৌকিক শক্তির নির্দেশে ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করে।

ভ্রষ্টা নারীটি এবার লুটাইয়া পড়ে স্বামীজীর চরণতলে, বার বার তাঁহার মার্জনা ভিক্ষা করিতে থাকে। উত্তরকালে বিত্ত-বিষয় বর্জন করিয়া এই নারী সংসার ত্যাগ করে এবং স্বামীজীর কৃপায় পরিণত হয় এক বিশিষ্টা সাধিকায়।

স্বামীজীকে ক্রমে তাঁহার কৌপীনটিও পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়। অন্তর বাহিরের সমস্ত ভেদাভেদ যাহার ঘুচিয়া গিয়াছে, সংসারের সমস্ত কিছু সংস্কার, সমস্ত কিছু প্রয়োজন, আজ তাঁহার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর! তাই দেখা যায়, বারাণসীর আনন্দবাগ উদ্যানের এক

প্রান্তে এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী উলঙ্গ হইয়া বসিয়া আছেন, আর সভ্য-জগতের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও অভিজাত ব্যক্তিরা তাঁহার চরণতলে ঢালিয়া দিতেছেন অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

এক এক সময়ে লৌকিক আচরণ ও সমাজের প্রয়োজনে তিনি নিজেই নিজের স্বাধীনতা সাময়িকভাবে খর্ব করিয়া নিতেন। দর্শনার্থী মহিলা ভক্তগণ আসিলে অল্প সময়ের জন্য কাহারো নিকট হইতে এক টুকরা বস্ত্র চাহিয়া নিয়া কটিদেশ আবৃত করিয়া বসিতেন। তাহার পরই আবার তাঁহাকে নগ্ন অবস্থায় ধ্যানমগ্ন থাকিতে বা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে দেখা যাইত।

অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারীরূপে ভাস্করানন্দ তখন খ্যাত, চারিদিকে ভক্ত ও আশ্রয়ার্থীর ভিড়ের অন্ত নাই। মহাযোগীকে এসময়ে যাঁহারাই দেখিতে যাইতেন, বিস্মিত হইতেন তাঁহার যোগ-সামর্থ্য ও করুণাঘন রূপ দর্শনে।

ভারত ও বহির্ভারতের রাজরাজড়ার দল, গবর্নর-জেনারেল ও কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্ প্রভৃতি যাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, নিরন্ন ভিখারীও তেমনি পাইতেছে তাঁহার স্নেহদৃষ্টির স্পর্শ।

যোগীবরের নিজস্ব দৈনন্দিন জীবনধারাটি কিন্তু বড় অদ্ভুত ছিল। নিদারুণ শীতের নিশীথেও এই উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে আনন্দবাগের শিশির-সিক্ত দূর্বাদলের মধ্যে পরম আনন্দে শায়িত থাকিতে দেখা যাইত।

'বেদব্যাস' পত্রিকার সম্পাদক ভূধরবাবু তাঁহার দিনচর্যা সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "স্বামীজী চত্বারিংশ বৎসর বয়সে আনন্দবাগে আগমন করিয়া, যেমন অনাবৃত দেহে বামহস্তোপরি মস্তক ন্যস্ত করিয়া, নিদারুণ পৌষমাসের শীতেও ভূমিতে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন, দেহ-ত্যাগের শেষ সময় পর্যন্তও তাঁহার এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পূর্বেও যেরূপ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলেও পানীয় পাত্রাভাবে তাঁহার জল পান করা হইত না, দেহত্যাগের শেষ সময় পর্যন্ত, মিনতি সত্ত্বেও জলপানার্থে আনীত পানপাত্রে কোনোমতেই তিনি জলপান করিতেন না। যদি কোনো দর্শনার্থী লোটা হস্তে লইয়া তাঁহার নিকট আগমন

করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ লোটা লইয়া জলপান করতঃ তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পণ করিতেন, নতুবা করপুটই তাঁহার পানপাত্রের কার্য করিত।”

পানপাত্র অভাবে স্বামীজীর অসুবিধা হইতেছে ভাবিয়া একবার এক ঘনিষ্ঠ শিষ্য তাঁহাকে একটি পাথরের জলপাত্র প্রদান করেন। বৈরাগ্যবান্ মহাপুরুষ স্মিতহাসে তখনই এটি সম্মুখে দাঁড়ানো এক ব্যক্তিকে দান করিলেন।

প্রায়ই তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত, “সাধু সর্বদা অবলম্বন ক'রে থাকবে আকাশবৃত্তি,—আগামীকালের জন্য সঞ্চয় ক'রে রাখবার তার অধিকার তো নেই।”

একবার তাঁহার এক সন্ন্যাসী শিষ্য পরের দিনের জন্য সামান্য কিছু রন্ধনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখেন। একথা কানে যাওয়া মাত্র স্বামীজী তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া কঠোর ভাষায় ভৎ‍র্সনা করিতে লাগিলেন।

রাজা, মহারাজা ও শ্রেষ্ঠীদের মধ্যে তাঁহার অনুরাগী ভক্তের সংখ্যা কম ছিল না। ইহারা প্রায়ই ঝুড়িভর্তি দুষ্প্রাপ্য ফলমূল, খাদ্য ও অর্থাদি আনন্দবাগে প্রেরণ করিতেন। আশ্রমে আসামাত্র অমনিই তাহা চারিদিকে বিতরিত হইয়া যাইত।

কাশ্মীরের মহারাজা একবার তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়া এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী দেন। স্বামীজীমহারাজ তখনি এই ভেট স্পর্শ করিয়া ফিরাইয়া দেন। কহেন, “আমার একটা অতিরিক্ত কৌপীনও নেই, কোথায় এসব টাকাকড়ি আমি রাখবো বলতো?”

কাশীর নৃপতি একদিন ঝুড়িভর্তি বহু ফল-পাকড় পাঠাইয়াছেন। স্বামীজী তাঁহার অভ্যাসমতো তখনই উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ইহা বিতরণ করিতে বলিলেন। ভক্ত ও সেবক রামচরণ তেওয়ারীজীর কিন্তু ইহা মোটেই মনঃপূত হইল না। ক্ষুব্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, পাঁচভূতে মিলিয়া এগুলি খাইয়া যাইবে, স্বামীজী মহারাজকে কোনো কিছুই দেওয়া সম্ভব হইবে না।

সেদিন স্বামীজীর আহার হইয়া গিয়াছে। পরের দিন তাঁহাকে

কিছু ফল খাওয়াইবেন মনে করিয়া তেওয়ারীজী বিতরণের সময় উহার কয়েকটি বস্ত্রের ভিতর লুকাইয়া ফেলিলেন।

সর্বজ্ঞ স্বামীজীর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হইল না। তিনি পরিহাসের সুরে বলিয়া উঠিলেন, "কেঁও রামচরণ, তুম্ পরমহংসকা ভাণ্ডারা বনাতে হো?"

ধরা পড়িয়া গিয়া তেওয়ারীজী বড় লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। স্বামীজী এবার তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "রামচরণ, তুমি হয়তো মনে করছো যে, আমার এসব খাওয়া হয় নি। কিন্তু তুমি তো জানো না—আমি এই ভক্তদের জিহ্বা দিয়ে এগুলোর সম্পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করেছি।"

স্বামীজীর ভক্তদের মধ্যে রাজা ও শেঠদের সংখ্যা৹ যথেষ্ট ছিল। এজন্য বহিরাগত ব্যক্তিদের কেহ কেহ মনে করিতেন, তিনি বুঝি ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট। অবশ্য ঘনিষ্ঠ লোকদের কাছে তাঁহার স্বরূপটি অজানা ছিল না। সংসারের সমস্ত ভোগসুখ অবলীলায় পশ্চাতে ফেলিয়া যিনি চলিয়া আসিয়াছেন, যোগ সাধনার মহাসিদ্ধি যাহার করতলগত, সমাজের ধনী ও অভিজাতদের মূল্য সেই মহাসন্ন্যাসীর কাছে কতটুকু? তাই দেখা যাইত, রাশিয়ার অধিপতি জারের পুত্র নিকোলাস এবং ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যর উইলিয়ম লক্‌হার্ট প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তি যেমন এই মহাযোগীর আশিস্ ও শুভেচ্ছা পাইতেন, তেমনি প্রতিদিন প্রভাতে বাবার প্রিয়পাত্র, দীনহীন কাঙাল সহাই তেলীও তাঁহাকে দর্শন করিতে না আসিলে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিতেন।

আনন্দবাগে উপস্থিত হইলেই সহাই তেলী সর্বপ্রথমে তাঁহার সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করিত। 'আও মেরে বাপ,' 'আও মেরে বাপ' বলিয়া স্বামীজী তাহাকে পরম স্নেহে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেন। ধনী ও পদস্থ লোকদের ভিড়ে দরিদ্রদের অনেক সময় দর্শনের অসুবিধা ঘটিত। স্বামীজী তাই মাঝে মাঝে তাহাদের সুবিধার জন্য একটি দিন

সপ্তাহে নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন—সে দিনটিতে অভিজাত দর্শনার্থীদের আনন্দবাগে ঢুকিতে দেওয়া হইত না।

বিশিষ্ট মার্কিন সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন ভারতবর্ষে আসিয়া ভাস্করানন্দজীকে দর্শন করিতে যান। তিনি তাঁহার 'মোর ট্রাম্প্‌স্‌ অ্যাব্রড' নামক পুস্তকে সে সময়কার এক মনোহর বর্ণনা দিয়াছেন—

"দর্শনের জন্য আনন্দবাগের একপ্রান্তে সবাইকে আমাদের দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। অপেক্ষমাণ থাকার সময় বুঝিতেছিলাম যে, সেদিন স্বামীজীর দর্শন লাভ বড় সহজ হইবে না, কারণ, সেদিন তিনি তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী রাজা-মহারাজাদিগকে দর্শন না দিয়া শুধু সমাজের নিম্ন-স্তরের জনতার সহিতই দেখা করিতেছেন। আভিজাত্য ও পদমর্যাদা এ মহাপুরুষের কাছে কিছুই নয়, সকলেই তাঁহার দৃষ্টিতে সমান। এক এক সময়ে তিনি স্বেচ্ছামতো রাজরাজড়ার সঙ্গেই শুধু দেখা করেন, আর একদিন দীনদরিদ্র লোকদের দর্শনদানেই তিনি উন্মুখ—ধনীর দল সেদিন তাঁহার সম্মুখ হইতে বিতাড়িত হইতেছে।"

হাস্যরসাত্মক রচনার জন্য এই মার্কিন সাহিত্যিকের খ্যাতি তখন বিশ্বব্যাপী। এসময়ে তিনি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলে 'ইংলিশ-ম্যান' কাগজের প্রতিনিধি প্রশ্ন করিলেন, "ভারতবর্ষে এসে আপনি যা দেখলেন তার ভেতর কোন্ বস্তুটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য?"

তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "বেনারস ও সেখানকার পবিত্রাত্মা মহাপুরুষটি।" একথা বলিতে বলিতে স্বামী ভাস্করানন্দের উলঙ্গ ছবিটি তিনি সর্বসমক্ষে খুলিয়া ধরিলেন।

সাংবাদিকটি কহিলেন, "এ বড় বিস্ময়ের কথা। সকলেই জানে আপনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আপনি এমন সব প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে লোককে হাসাতে পারেন, যাতে হাসবার মতো মোটেই কিছু নেই। এ উলঙ্গ সন্ন্যাসীর কথা আপনি উত্থাপন করায় আমরা ভেবেছিলাম, না জানি তাঁকে নিয়ে আপনি কত কিছু হাস্যরসের অবতারণা করবেন, আমরা হেসে খুন হবো। এখন ব্যাপার দেখছি অন্যরূপ।"

তিনি শ্রদ্ধাভরে কহিলেন. "তিনি যে ঈশ্বর-প্রতিম।"

এই স্বনামধন্য সাহিত্যিক তাঁহার ভ্রমণ-গ্রন্থে স্বামীজীর কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "ভারতের তাজমহল অবশ্যই এক পরম বিস্ময়কর বস্তু, যার মহনীয় দৃশ্য মানুষকে আনন্দে অভিভূত করে, নূতন চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করে। কিন্তু স্বামীজীর মতো মহান্ ও বিস্ময়কর জীবন্ত বস্তুর সঙ্গে তা কি ক'রে তুলনীয় হতে পারে? এ যে জীবন্ত, এতে শ্বাস প্রশ্বাস বয়, এ যে কথা বলে, লক্ষ লক্ষ লোক এতে আস্থা স্থাপন করে, ভগবান্ ভেবে ভক্তি করে, কৃতজ্ঞতার সহিত এর পূজো করে।"

মার্ক টোয়েন তাঁহার ভ্রমণ-গ্রন্থে এই ভারতীয় মহাপুরুষের কথা বার বার শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান ধর্মাচার্য ডাঃ ফেয়ারবার্নও স্বামীজীর দর্শন লাভের পর প্রকাশ করেন, "স্বামীজীর সামনে দাঁড়িয়ে আমি পবিত্রতা ও সততার এমন এক ভাবময় রূপ অন্তরে অনুভব করেছি, সমগ্র খ্রীষ্ট জগতে যার সমতুল্য কিছু আমি কখনো দেখি নি।"

এ দেশের বহুতর শিক্ষিত ও অভিজাত শিষ্য ভক্তদের মধ্য দিয়া বহির্ভারতের দিগ্বিদিকে স্বামী ভাস্করানন্দের নাম প্রচারিত হইতে থাকে। এই খ্যাতনামা 'হোলিম্যান অব্ বেনারস' বা কাশীর পবিত্রাত্মা মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য বিশ্বের বহু মনীষী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ব্যগ্র হইয়াছিলেন। জার্মান পণ্ডিত ডয়সন, রাশিয়ার জার নিকোলাসের পুত্র প্রভৃতি ছিলেন স্বামীজীর এইসব দর্শনার্থীর অন্যতম।

কাশীর সমকালীন মহাপুরুষদের অনেকের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি স্বামীজী লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেকের সহিত সৌহার্দ্যবন্ধনে তিনি আবদ্ধ ছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিশুদ্ধানন্দজী চিরকাল স্বামী ভাস্করানন্দকে 'বড়দাদা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মহাযোগী তৈলঙ্গ মহারাজের সহিত স্বামীজীর প্রগাঢ় সখ্য ছিল এবং সাক্ষাৎ মাত্রই উভয়ে উভয়কে সৌজন্য দেখাইতেন।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কাশীতে বাস করার কালে মাঝে

মাঝে ভাস্করানন্দজীকে দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিয়া গোস্বামীজীর আনন্দের সীমা থাকিত না। একদিন তিনি ভাস্করানন্দজীকে দর্শন করিতে আসিয়া দেখেন, তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া জনৈক মহারাজা বহু স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটি থালা তাঁহাকে নিবেদন করিতেছেন। কিন্তু স্বামীজী এটি ফিরাইয়া দিলেন। ক্ষুণ্ণমনে ঐ মহারাজকে আনন্দবাগ ত্যাগ করিতে দেখা গেল। স্বামীজীকে উদ্দেশ করিয়া সেদিন গোস্বামীজী ভক্তিভরে কয়েকটি প্রশস্তি-শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

ভাস্করানন্দজীর দীক্ষিত শিষ্যের সংখ্যা ছিল প্রায় লক্ষাধিক। আর ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের কত বিচিত্র নরনারীই যে দেখা যাইত তাহার ইয়ত্তা নাই। কাশীধামে সে-সময়ে একদল দুর্দান্ত পাণ্ডা উপদ্রব করিয়া বেড়াইত, ইহাদের কবলে পড়িলে নিরীহ যাত্রীদের বিপদের সীমা থাকিত না। স্বামীজী কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া এই পাণ্ডাদের মধ্যেকার বড় বড় পাষণ্ডীদেরই করিতেন তাঁহার শিষ্যদলভুক্ত। এজন্য অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেন, সমালোচনা করিতেও ছাড়িতেন না কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে, কুখ্যাত ঐ সব পাণ্ডা মহাপুরুষের কৃপাবলে ধীরে ধীরে নূতন মানুষে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

ভাস্করানন্দজীর যোগবিভূতির কাহিনী সে-সময়ে সারা ভারতে জনশ্রুতিতে পরিণত হয়। ভক্তদের অনুরোধ ও আবদার রক্ষা করিতে গিয়া এবং অনেক সময় তাঁহাদের কল্যাণার্থে, অবলীলায় তিনি নানা অলৌকিক শক্তির প্রকাশ করিয়া বসিতেন। যে বস্তু তাঁহার নিকট নিতান্ত নগণ্য, বালকের ক্রীড়াবস্তুর মতো তুচ্ছ, দর্শনার্থী ও ভক্ত-জনের মানসপটে এক এক সময় তাহাই দেখা দিত অপ্রাকৃত রশ্মি-রেখার চকিত আবির্ভাব রূপে।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র স্বামীজীর নিকট মাঝে মাঝে যাইতেন। একদিন তত্ত্বালোচনা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র কহিলেন, "স্বামীজী আপনি প্রায়ই বলেন, এই জগৎ নিতান্তই

অলীক—মায়া মাত্র। কিন্তু আপনাকে স্পর্শ করবার কালে তো তা আমাদের মনে হয় না।"

এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে তিনি ভাস্করানন্দ মহারাজের চরণস্পর্শ করেন। কিন্তু চরণ হইতে হস্তটি উঠাইতে না উঠাইতেই সবিস্ময়ে দেখেন এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। স্বামীজীর স্থূল দেহটি মুহূর্তে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে!

ক্ষণপরেই আবার স্থূলদেহে সেখানে আবির্ভূত হইয়া স্বামীজী স্যর রমেশচন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, "এবার বুঝতে পাচ্ছো তো? সমস্তই অলীক না হলে আমি এরূপভাবে প্রতি ক্ষণেই আছি, আবার নেই—তা কি ক'রে সম্ভব হয়?"

এ কথা বলিয়াই তিনি স্যর রমেশচন্দ্রের সম্মুখ হইতে দ্বিতীয় বার অদৃশ্য হইলেন। পুনরায় স্বস্থানে আবির্ভূত হইয়া যোগীবর হতবাক্ জাস্টিস্ মিত্রকে বলিলেন, "কি বল রমেশ? জগৎ স্বপ্নদর্শনের মতো অলীক, এ কথাটা কি এখন অবিশ্বাস করছো?"

ভারতের কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্ স্যর উইলিয়ম লক্হার্ট ভাস্করানন্দজীকে বড় শ্রদ্ধা করিতেন। মাঝে মাঝে সস্ত্রীক তাঁহাকে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেখা যাইত।

একবার লক্হার্ট সাহেবের চৈতন্যোদয়ের জন্য তিনি এক অদ্ভুত যোগবিভূতি প্রদর্শন করেন। শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন পুরাতন ভক্ত সেদিন আনন্দবাগে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাটি চাক্ষুষ দেখিয়া তিনি তাহার বর্ণনা দিয়াছেন—

"সেনাপতি যেদিন স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসেন, সেই দিন সেই সময়ে আমি আনন্দবাগে উপস্থিত ছিলাম। স্বামীজীর নিকট লক্হার্ট সাহেব, আফ্রীদিগণকে কিরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন বর্ণনা করিতে লাগিলেন, আমরাও সকলে শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

যুদ্ধের গল্প করিতে করিতে যে সময়ে সহসা সাহেবের মনে অহঙ্কার আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সময়ে স্বামীজীর নিকটে এক পেনসিল

পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া তিনি ঐ পেনসিল তুলিয়া আনিবার জন্য লক্‌হার্ট সাহেবকে বলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য কাণ্ড! লক্‌হার্ট সাহেব সহস্র চেষ্টা করিয়াও ঐ পেনসিলটি তুলিতে পারিলেন না। তখন স্বামীজী বলিলেন, তুমিই যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছ এরূপ ভাবিও না। জয় পরাজয়ের কর্তা কেবল একজন আছেন। আমি যেরূপ তোমার শক্তি হরণ করিয়াছি, তিনিও ঐ ভাবে তোমার বুদ্ধি হরণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যে কৌশল অবলম্বন করিয়া তুমি আক্রীদিগণকে পরাজিত করিয়াছ, ঐ প্রকার বুদ্ধি তোমার মনে যুদ্ধ-জয়কালে কখনই উপস্থিত হইত না। ঈশ্বরের উপরই সর্বদা সব কাজে নির্ভর করিবে।"

আধি-ব্যাধি পীড়িত বিপন্ন মানবের দুঃখ মোচনে স্বামীজীর হৃদয় সদাই বিগলিত হইয়া উঠিত। কৃপা ও আশ্রয়দানের মধ্য দিয়া প্রায়ই প্রকটিত হইত অলৌকিক যোগৈশ্বর্য। ডাঃ ঈশ্বর চৌধুরী বেনারসের একজন খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ। একবার তাঁহার বালক পুত্রটি কোনো এক মারাত্মক ব্যাধির কবলে পড়ে। বিজ্ঞানসম্মত সর্বপ্রকার চিকিৎসাই করা হয়, কিন্তু রোগীর অবস্থা দিনের পর দিন সংকটাপন্ন হইতে থাকে।

অনন্যোপায় হইয়া ডাক্তার চৌধুরী এবার ভাস্করানন্দ স্বামীজীর শরণাপন্ন হন। স্বামীজী তখন বহু দর্শনার্থী ও ভক্তজন পরিবৃত হইয়া আনন্দবাগে বসিয়া আছেন। ডাঃ চৌধুরীর কাতর প্রার্থনায় তাঁহার দয়া হইল। তখনই হাত বাড়াইয়া সম্মুখের ঝুড়ি হইতে একটি ফল নিয়া তিনি রোগীকে খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন। ইহা গ্রহণের পরই সংকট কাটিয়া যায়, বালকটি বাঁচিয়া উঠে।

তৎকালে বঙ্গবাসী কাগজে স্বামীজীর কৃপালীলার নানা তথ্য প্রকাশিত হয়। দুইটি কাহিনী এখানে উদ্ধৃত হইল :

"পূর্ববঙ্গের কয়েকটি বাবু একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কয়েকজন প্রণাম করিলে পর, অন্য একটি বাবু যেমন প্রণাম করিতে যাইতেছেন, অমনি স্বামীজী তাঁহাকে প্রণাম করিতে

নিষেধ করিলেন। বলিলেন, 'তোমার অশৌচ হইয়াছে, পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, তুমি প্রণাম করিও না! তুমি বরং এখনই বাটী চলিয়া যাও, বাটীতে তোমার অনাথিনী মাতা যারপরনাই শোকে কাতরা।' প্রথমে তাহাদের একথায় বিশ্বাস হয় নাই, কিন্তু ঐ বাবুটি যেমন বাসায় ফিরিলেন, অমনি দেখিলেন, দরজার কাছে তার-পিয়ন দাঁড়াইয়া, হাতে টেলিগ্রাম ;—'তোমার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে ; অবিলম্বে বাটী আসিবে।"

"সুখীপুর নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ স্বামীজীর নিকট আপন ব্যাধির আরোগ্য কামনায় উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তির শরীর অতিশয় কৃশ ছিল, যাহা খাইত তখনই তাহা বমি হইয়া উঠিয়া যাইত। স্বামীজী আগন্তককে দর্শনমাত্র তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, —পাঁড়েজী, ভোজন প্রস্তুত করো।' আদেশ মতো সে ব্যক্তি খিচুড়ি রাঁধিয়া স্বামীজী মহারাজের কণিকামাত্র প্রসাদ খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

চণ্ডীচরণ বসু ঢাকা শহরের একজন প্রবীণ রাজকর্মচারী। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি কঠিন বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। অভিজ্ঞ ডাক্তার ও হেকিমদের চিকিৎসায় দীর্ঘকাল থাকিয়াও তাঁহার রোগ নিরাময় হইল না। শুধু তাহাই নয়, ধীরে ধীরে তিনি মৃত্যুর দিকে আগাইয়া চলিলেন।

এ সময়ে চণ্ডীবাবু ভাবিতে থাকেন, জীবন তো শেষ হইয়াই যাইতেছে, কিন্তু দীক্ষাহীনভাবে মরা তো ঠিক নয়। তাই কাশীধামে আসিয়া সকাতরে ভাস্করানন্দ মহারাজকে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকে মন্ত্র দান করিতেই হইবে।

কৃপাপরবশ হইয়া স্বামীজী কহিলেন, "তোমায় আমি মন্ত্র দেবো ঠিকই, কিন্তু তার আগে কুলগুরুর কাছ থেকে তোমায় দীক্ষা নিতে হবে।"

চণ্ডীবাবু হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কুলগুরু থাকেন সুদূর পূর্ববঙ্গে, কাশীতে কি করিয়া তিনি তাঁহার দেখা পাইবেন?

কিন্তু মহাপুরুষের কৃপায় অচিরে সব দুশ্চিন্তা দূর হইল। একদিন তিনি শহরের রাস্তা দিয়া কোথায় চলিয়াছেন। দেখিলেন, তাঁহার কুলগুরু সেই পথেই আসিতেছেন। হঠাৎ এক সুযোগ পাইয়া তিনি কাশীতে তীর্থ করিতে আসিয়াছেন। এবার কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লাভের পর চণ্ডীবাবু ভাস্করানন্দজীর নিকট হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হন। মহাপুরুষ এ সময়ে তাঁহাকে বলিয়া দেন, "যাও, উনচল্লিশ দিনের ভেতর তুমি তোমার কাল ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে।" ঠিক ঐ সময়ের মধ্যেই চণ্ডীবাবু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ক্ষেত্রচন্দ্র বসু মল্লিক কলিকাতা শহরের এক বিশিষ্ট নাগরিক। ভাস্করানন্দ স্বামীর একটি কৃপালীলার কথা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন—"আমার ভগ্নীপতি, কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় রায় রমানাথ ঘোষ বাহাদুর ও তাঁহার মাতা স্বামীজীর নিকট গমন করিলেন। রমানাথবাবুর পুত্রের কোষ্ঠী প্রস্তুত হইলে জানা যায় যে, পুত্রটির ষোল বৎসর বয়সে একটি বড় ফাঁড়া আছে; ঐ ফাঁড়া হইতে তাহার রক্ষা পাইবার কথা নহে। রমানাথবাবুর মাতার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে, বালকের বিবাহ দেন কিন্তু রমানাথবাবু বিবাহ দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। শেষে তাঁহারা স্থির করেন, স্বামীজীর আদেশমতো কার্য করিবেন। স্বামীজীর মত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমরা ছেলের বিয়ে দাও।'

"স্বামীজীর আদেশ পাইয়া, রমানাথবাবু ও তাঁহার মাতা চলিয়া গেলেন। একটি জ্যোতিষী তথায় ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, 'প্রভো! পুত্রটির বিষম ফাঁড়া আছে। জ্যোতিষ-বাক্যও তো আপনার, অর্থাৎ ঋষিবাক্য। আপনি জানিয়া শুনিয়া কি করিয়া বিবাহ দিতে আদেশ করিলেন?'

"তদুত্তরে স্বামীজী বলিলেন, 'আমি জানি পুত্রের মৃত্যু হইবেই, কিন্তু সেই কন্যাটি, যাহার পূর্বজন্মার্জিত কর্মানুসারে ইহজীবনে বৈধব্যদশা ভোগ নির্দিষ্ট হইয়াছে ও যাহার কর্মের সহিত ঐ বালকের কর্ম এক

সুরে বাঁধা, তাহাকে বিধবা হইতেই হইবে ; তবে আমি যতদিন জীবিত থাকিব, পুত্রটিকে ততদিন মরিতে দিবনা, ইহা নিশ্চয় জানিও!'

"জ্যোতিষী স্বামীজীর কথা মানিয়া লইলেন। একদিন স্বামীজীর কলেরা হইল, রমানাথবাবুর পুত্র গণেশও ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, কিন্তু যে কয়দিন স্বামীজী জীবিত রহিলেন, গণেশও অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিল ; স্বামীজী রাত্রি বার ঘটিকার সময় দেহত্যাগ করিলেন, গণেশও ঠিক ঐ সময় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।"

কত মুমুক্ষু ও আশ্রিত ভক্তজন যে মহাপুরুষের আশ্রয়ে আসিয়া রূপান্তরিত হইয়াছে, নবজন্ম লাভ করিয়াছে তাহার সংখ্যা কে নির্ণয় করিবে? এমনই একজন ভাগ্যবান্ ছিলেন, নেপালের এক প্রবীণ রানা, কর্নেল মিনা বাহাদুর। ভাস্করানন্দজীর কৃপারশ্মি ইহার জীবনে পতিত হয় এবং রূপান্তর সাধন করে। মহাপুরুষের আশীর্বাদ লাভের পর সংসারে সমস্ত সুখৈশ্বর্য ও আত্মপরিজনের মায়া তিনি ত্যাগ করেন। হিমালয়ের শালিগ্রাম নদীতটে এক পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়া এই সাধক রত হন কঠোর তপস্যায়।

অনেক সময় জিজ্ঞাসুগণ স্বামীজীর নিকট হইতে তাঁহাদের জ্ঞাতব্য নির্দেশাদি স্বপ্ন অথবা অন্যান্য অলৌকিক পন্থার মধ্য দিয়াও প্রাপ্ত হইতেন। একবার প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর এক শিষ্য, ভূতনাথ ঘোষ মহাশয়, স্বামীজীর নিকট গিয়া সাধনবিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। খেয়ালী স্বামীজী তাঁহার প্রশ্নের তো কোনো উত্তর দিলেনই না, বরং তখনই তাঁহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, ঘোষ মহাশয় ইহাতে খুব বিরক্ত হন এবং চটিয়া যান। কিন্তু সেই দিনই রাত্রিতে স্বপ্নযোগে তিনি স্বামীজীর দর্শন ও নির্দেশ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তাঁহার মনের সমস্ত সন্দেহ ও বিরক্তির মেঘ অপসৃত হইয়া যায়।

অযোধ্যারাজ প্রতাপনারায়ণ সিংহ স্বামী ভাস্করানন্দের একজন

অনুগৃহীত শিষ্য। স্বামীজীর কৃপাবলে একবার তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। সে সময়ে তিনি গুরুদেবের চরণ দর্শনের জন্য বেনারসে আসিয়াছেন, হঠাৎ অযোধ্যা হইতে এক জরুরী তার আসিল, অগৌণে সেখানে মহারাজের উপস্থিতি প্রয়োজন। স্থির হইল, পরের ট্রেনেই তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু ভাস্করানন্দজী কিছুতেই সেদিন তাঁহাকে যাইতে দিতে রাজী নহেন। বলা বাহুল্য, প্রতাপনারায়ণ মহাসংকটে পড়িলেন।

অনুমতির জন্য বারংবার অনুনয় করা হইলে, স্বামীজী কহিলেন, "যদি নিতান্তই আজ তোমার যেতে হয়, তবে যে গাড়িতে যাবে বলে ঠিক করেছ তার পরের গাড়িতে যেয়ো।"

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই ঠিক হইল। স্টেশনে পৌঁছিয়া এক সংবাদ শুনিয়া তো মহারাজের চক্ষুস্থির। তারে সংবাদ আসিয়াছে, ইতিপূর্বে যে গাড়িখানা অযোধ্যার দিকে যায়, তাহা পথিমধ্যে অন্য এক গাড়ির সহিত সংঘর্ষে লাইনচ্যুত হয়। ফলে বহুলোক হতাহত হইয়াছে। স্বামীজীর নিষেধে যাত্রা স্থগিত না রাখিলে প্রতাপনারায়ণ ঐ গাড়িতেই উঠিতেন এবং জীবন তাঁহার বিপন্ন হইত।

ইহার পূর্বদিন ভাস্করানন্দ মহারাজ নিতান্ত কৌতুকভরে এক অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করেন। রাজা প্রতাপনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া স্বামীজী মহারাজ সন্ধ্যাকালে আনন্দবাগে ভ্রমণ করিতেছেন। ভক্তের মনে এক উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। জরুরী তার পাওয়া সত্ত্বেও তিনি দেশে যাইতে পারিতেছেন না, সারাদিন তাই বিষণ্ণ হইয়াই আছেন। সদানন্দময় স্বামীজী তাঁহার সহিত এ সময়ে এক রঙ্গ শুরু করিয়া দিলেন।

বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহারা আনন্দবাগের নিকটস্থ পুষ্করিণী দুর্গাকুণ্ডের ধারে আসিয়াছেন। হঠাৎ স্বামীজী রাজার নিকট হইতে তাঁহার হীরক অঙ্গুরীয়টি চাহিয়া নিলেন, তারপর ক্রীড়াচ্ছলে উহা জলগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। অযোধ্যারাজ গুরুদেবকে ভালভাবে জানেন, এ রহস্যময় আচরণে তাই তেমন কিছু বিস্মিত হন নাই।

তাছাড়া, গুরুজী যখন উহা জলে ফেলিয়া দিলেন, তখন তাঁহার আর কিই বা করিবার আছে? ব্যাপারটিকে অতঃপর কোনো গুরুত্ব না দিয়া অপর এক সঙ্গীর সহিত তিনি কথা কহিতে লাগিলেন।

শিষ্যের এই শান্ত আচরণ দর্শনে স্বামীজী বড় খুশী হইয়া উঠিয়াছেন। সহাস্যে কহিলেন, "তোমার অঙ্গুরীটি এখনই মিলবে, তুমি সরোবরের যে কোনো স্থানে হাত ডোবাও দেখি!"

প্রতাপ নারায়ণ চাতুরী করিয়া দুর্গাকুণ্ডের অপর পারে গিয়া জল-মধ্যে হস্ত প্রসারিত করিলেন। কী আশ্চর্য! জল হইতে কতকগুলি হীরক অঙ্গুরীয় উঠিয়া আসিল। সবগুলিই দেখিতে একপ্রকার—কোনো পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। অঙ্গুরীয়ের অধিকারীও তাঁহার নিজস্ব বস্তুটি চিনিতে সমর্থ নন!

স্বামীজী এবার বালকের মতো খল্‌খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, অযোধ্যারাজের অঙ্গুরীয়টি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে তাঁহার দেরি হইল না। সঙ্গে সঙ্গে অপরগুলি সেই পুষ্করিণীতে বিসর্জন দিলেন। এভাবে সমস্ত পরিবেশটি মহাপুরুষের এই কৌতুক-ক্রীড়ায় হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

স্বেচ্ছাময় স্বামীজী মাঝে মাঝে নিতান্ত মনের আনন্দে বালকবৎ তাঁহার যোগবিভূতি প্রকাশ করিতেন। একবার কয়েকজন সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আগন্তুকদের সহিত তত্ত্বালোচনা করিতে করিতে স্বামীজী একটি শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়া বসিলেন। পাঠ ও ব্যাখ্যায় বেলা বাড়িয়া যাইতেছে, হঠাৎ তাঁহার খেয়াল হইল, তাই তো, এ সন্ন্যাসীদের তো খাওয়া-দাওয়া হয় নাই। তিনি তাঁহাদের ভোজনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

ভক্ত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনা ঐ সন্ন্যাসীদের একজনের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। সন্ন্যাসীটি তাঁহাকে বলেন : "সর্বদর্শী স্বামীজী মহারাজ তখন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কিছু খাবে না?' আমরা উত্তর করিলাম যে, তিনি

আমাদের তিন জনের উপযুক্ত আহার কোথায় প্রাপ্ত হইবেন ? স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, 'আচ্ছা, তোমরা আহারার্থ উপবেশন করো, এখনই তোমাদিগের আহার উপস্থিত হইবে; তোমরা কোন্ কোন্ দ্রব্য খাইতে চাও তাহা আমাকে বল। ইহা শুনিয়া আমাদিগের মধ্যে একজন উত্তর করিলেন, 'আমরা রাবড়ি বরফি, ক্ষীর, দধি, ছানা, সন্দেশ, আম এবং কমলালেবু ভোজন করিব।'

"এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে আমরা সকলে দেখিতে পাইলাম, দুইটি দিব্যাকৃতি সুন্দর বালক আমাদিগের দিকেই আগমন করিতেছে। বালক দুইটি আগমনপূর্বক তাহাদিগের মস্তকস্থিত ঝুড়ি দুইটি স্বামীজীর পদতলে স্থাপন করিয়া মুহূর্তমধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহা অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা যে খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বালক দুইটি কেবলমাত্র সেই কয়েকটি দ্রব্যই আনয়ন করিয়াছিল।"

ভাস্করানন্দজীর জীবনে নানা সময়ে অজস্র অলৌকিক ঘটনার প্রকাশ দেখা গিয়াছে, কিন্তু ভক্ত লছমন মালাকে তিনি আবিষ্কার করেন, তাহার অলৌকিকত্ব অনেক কিছুকেই যেন হার মানাইয়া দেয়। উত্তরকালে এই দরিদ্র ধীবর ভক্তের প্রতি স্বামীজী মহারাজের কৃপা প্রায়ই তাঁহার অন্যান্য ভক্ত শিষ্যদের বিস্মিত করিত।

শেষ জীবনে স্বামীজী একবার জন্মভূমি মৈথেলালপুর দর্শন করিতে যান। তিনি সেখানে গোপনে আসিয়াছেন, কিন্তু কি করিয়া যেন আগমনের সংবাদটি চারিদিকে রটিয়া যায়। সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশে ক্ষুদ্র গ্রামটি আলোড়িত হইয়া উঠে।

স্বামীজীকে সেদিন এক মঞ্চোপরি উপবেশন করাইয়া অভ্যর্থনা করা হইতেছে, বিরাট এক জনতা তাঁহার সম্মুখে নীরবে সশ্রদ্ধভাবে উপবিষ্ট। উপদেশাদি দানের শেষে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা

হইতেছে, এমন সময়ে স্বামীজী তাঁহার সম্মুখস্থ ব্যক্তিদের আদেশ দিলেন, "ত্যাখো, লছমন মালা নামে এক দরিদ্র জেলে এ জনতার ভেতর মিশে আছে। সে আমার এক পরম ভক্ত। তাকে তোমরা শিগ্গীর খুঁজে বার করো।"

বহুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর এই ভাগ্যবান্ ধীবরকে আবিষ্কার করা গেল। কৃপালু স্বামীজী তাহাকে মঞ্চের উপর নিজের পার্শ্বে সাদরে বসাইয়া দিলেন। সবাই উপলব্ধি করিলেন, ধনীজন ও রাজন্যবর্গবন্দিত যোগীরাজ ভাস্করানন্দ কাঙালেরও এক পরমাশ্রয়।

ছিন্নবাস পরিহিত দরিদ্র ধীবরের মধ্যে স্বামীজীর দিব্যদৃষ্টি সেদিন এক শুদ্ধসত্ত্ব সাধককে আবিষ্কার করিয়াছিল।

পরবর্তীকালে স্বামীজী বলিতেন, "আমার লছমন মালার ভেদ-জ্ঞান দূর হয়েছে—সে সার্থক সাধক এবং জ্ঞানী।"

দীর্ঘদিন দিকে দিকে দিব্য করুণার ধারা বিস্তারিত করার পর স্বামী ভাস্করানন্দের জীবন-লীলা এবার উপস্থিত হয় শেষ অঙ্কে। পরমপ্রাপ্তির আনন্দে এ সময়ে সদাই তিনি ভরপুর। পরমাত্মার পরম আহ্বানের প্রতীক্ষায় যেন একেবারে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন।

প্রিয় ভক্ত লছমন মালা তখন তাঁহার নিকট আনন্দবাগেই বেশী সময় অবস্থান করে। প্রত্যহ স্বামীজীর আদেশমতো তাঁহার প্রিয় গানের ধুয়াটি ধরিয়া বার বার সে গহিয়া চলে—

ল্যারে মালাহা কিনারে লাইয়া
সরযূকে তীরে ভীড় ভৈ ভারী
ঠহ্রে হ্যায় রামলছমন দু ভাইয়া—

গান থামিয়া যায়, উদাস-করা সুরের ঝঙ্কার সারা আনন্দবাগের আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। সন্ধ্যায় তরল অন্ধকার নিকটস্থ বীথিকায় জড়াইয়া জড়াইয়া নিবিড় হইয়া উঠে, স্বামীজী মহারাজ আত্মভোলা দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাইয়া থাকেন। তারপর সুস্মিত

হাসি হাসিয়া বলেন, "মালা, আমার জন্যও তোকে শিগ্‌গীর এবার অসিঘাটে নৌকা নিয়ে আসতে হবে।"

ভক্ত লছমন মালার দুই চোখে ঘনায় শোকের অশ্রু। তবে কি প্রভুর বিরহ সত্যই আসন্ন ?

১৩০৬ সালের ২৫শে আষাঢ়। স্বামীজীর প্রতীক্ষিত বিদায় লগ্নটি এদিন উপস্থিত হয়। কয়েকদিন পূর্বে উদরের রোগে তিনি আক্রান্ত হইয়াছেন, এবার সেই রোগকেই বাহনরূপে গ্রহণ করেন লোকান্তর যাত্রায়।

মহাপ্রয়াণের কালে মহাপুরুষের মৃতকল্প শরীরে অপূর্ব অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। আপন ধ্যানাসনে গিয়া তিনি উপবিষ্ট হন, তারপর ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হন মহাসমাধিতে।

রামদাস কাঠিয়াবাবা

উত্তরাখণ্ডের শীতার্ত মধ্য রাত্রি। দূর পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় তুষারের ঘন আবরণ। চীর ও দেবদারুর বিশীর্ণ শাখা হইতে টুপটাপ করিয়া বরফের কণা ঝরিয়া পড়িতেছে। এই শীতের মধ্যে ঝুপড়িতে ধুনি জ্বালাইয়া তরুণ সাধু আসনে উপবিষ্ট। ধ্যান-জপে দীর্ঘকাল আক্রান্ত হইয়াছে। দেহ ক্লান্ত, অবসন্নপ্রায়। দুই চোখে তাঁহার নামিয়া আসিতেছে দুর্নিবার ঘুম। আসনের উপর দেহটি কোন্ সময়ে যে ঢলিয়া পড়িল, হুঁশ নাই।

চালের ফাঁক দিয়া ধুনির উপর মাঝে মাঝে বরফ পড়িতেছে? এবার কাঠের আগুন একেবারেই নিভিয়া গেল। এই প্রাণান্তকর শীতে ঘুমানোরই বা উপায় কোথায়? কাঁপিতে কাঁপিতে যুবক সাধুটি উঠিয়া বসিলেন। এ বিপদে কি করিয়া প্রাণ আজ বাঁচাইবেন? পাহাড়ীদের অবস্থান দূরে, সেখান হইতে যে আগুন সংগ্রহ করিবেন, তাহারও জো নাই।

নিকটেই গুরুদেবের ঝুপড়ি, সেখানে তিনি ধ্যানমগ্ন। তাঁহার নিকট হইতে জ্বলন্ত কয়লা চাহিতে যাওয়া,—সে যে আরো সাংঘাতিক বিপদের কথা! প্রায় জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিবারই সমান! ডাকাডাকি শুরু করিলেই ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িবেন। শিষ্যের তামসিক আলস্যে পবিত্র ধুনি নির্বাপিত হইয়াছে,—সে অপরাধের জন্য দিবেন চরম দণ্ড। আবার এই শীতে তাঁহার কাছে না গেলেও বিপদ কম নয়, অবিলম্বে আগুন সংগ্রহ না করিতে পারিলে মাঘের এই প্রচণ্ড শীতে মৃত্যু অনিবার্য।

অবশেষে সাহস সঞ্চয় করিয়া তরুণ সাধু ঝুপড়ির দ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়ান। ডাকিতে থাকেন, "গুরুজী গুরুজী।"

কিছুক্ষণ পরে ভিতর হইতে ধ্বনিত হয় গুরুগম্ভীর কণ্ঠ—"কে? বাইরে কে দাঁড়িয়ে?"

ভীতিজড়িত কণ্ঠে শিষ্য নিবেদন করেন, "মহারাজ, আমার ধুনির আগুন হঠাৎ নিভে গেছে। যদি কৃপা ক'রে আপনার ধুনি থেকে কিছু কয়লা দেন, আবার তা জ্বালিয়ে নিতে পারি। প্রচণ্ড শীতে জমে যাচ্ছি, মহারাজ।"

ভিতর হইতে এবার আসে রোষদৃপ্ত তর্জন গর্জন, আর অনর্গল ভৎর্সনা, "ধ্যান জপের সময়ে আসনে বসে নিশ্চয়ই তুমি ঘুমোচ্ছিলে। নইলে জ্বলন্ত ধুনি কি ক'রে নিভে? এই তামস ঘুম ও আরামের দিকে যদি এতই ঝোঁক, তবে বাপ-মাকে এত দুঃখ দিয়ে ঘর ছাড়লে কেন? সেখানে প্রাণ ভরে খেতে ঘুমুতে পারতে।"

শিষ্য রামদাসের দেহে তখন শীতের কাঁপুনির চাইতে ভয়ের কাঁপুনিই বেশী। মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বার বার গুরুমহারাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন। সানুনয়ে বার বার জানান, নিতান্ত আকস্মিকভাবে তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তাই আজ এই অপরাধ ঘটিয়াছে। আর কখনও এরূপ হইবে না। এবার হইতে নিশ্চয়ই ছেদ-বিরতিহীন ধ্যান জপে ব্রতী হইবেন। ধুনি অনির্বাণ রাখিতেও শৈথিল্য ঘটিবে না।

কিন্তু গুরুদেবের ক্রোধ প্রশমিত হয় কই? ঝুপড়ির ভিতর হইতে কঠোর কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠেন, "ইয়ে জাড়ামে এক ঘণ্টা ঠিক্‌সে খাড়া হো কর্ রহো, লেকিন আগ্ তুমকো নেহি মিলেগা।" অর্থাৎ, এই তীব্র শীতে তুমি এক ঘণ্টা বাইরে এমনি ক'রেই দাঁড়িয়ে থাকো—আগুন কিছুতেই মিলবে না।

এ আদেশ অলঙ্ঘনীয়। উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া হিমাচলের এই সুতীব্র শীতে তরুণ সাধু মৃতকল্পের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেহ প্রায় নিঃসাড় হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে ঝুপড়ির দরজাটি হঠাৎ খুলিয়া গেল। গুরুদেব তাঁহার আসনে উপবিষ্ট থাকিয়াই ভিতর হইতে একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ বাহিরে ছুঁড়িয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন এক সতর্ক-বাণী—আর যেন এমন ত্রুটি কখনো না ঘটে।

নূতন সমিধ প্রাপ্ত হইয়া শিষ্যের পবিত্র ধুনি তৎক্ষণাৎ আবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

দীর্ঘ তপস্যা ও কৃচ্ছ্রব্রতের মধ্য দিয়া উত্তরকালে এই শিষ্যের জীবনসমিধেও এমনি করিয়া জ্বলিয়া উঠে আত্মনিবেদনের অগ্নিশিখা। গুরুকৃপার দিব্য স্পর্শে সর্বসত্তা তাঁহার জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে, লাভ করেন তিনি বহুপ্রার্থিত ব্রহ্মজ্ঞান।

উত্তরাখণ্ডের শীতজর্জর নিশীথের সেদিনকার এই তরুণ সাধকই উত্তরকালের শ্রীবৃন্দাবনের রামদাস কাঠিয়াবাবা, আর তাঁহার গুরু মহাসমর্থ তাপস শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী দেবদাসজী মহারাজ।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীমৎ নাগাজীর শাখার এক শক্তিধর আচার্য দেবদাসজী মহারাজ। ভারতের উচ্চকোটির সাধক ও ব্রহ্মজ্ঞ সমাজে তখন তাঁহার বিরাট প্রসিদ্ধি। এই শক্তিধর মহাপুরুষের অন্তর্লোকের পরিচয় তাঁহার মহাজীবনের জ্যোতির্ময় স্বরূপ, অনুগত শিষ্য রামদাসের সাধনসত্তায় তৎকালে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। সাধক রামদাস তাঁহার গুরু মহারাজের অপার যোগৈশ্বর্যের পরিচয় যেমন জানিয়াছেন, তেমনি জানিয়াছেন তাঁহার দিব্য করুণার স্বরূপ। আত্মগোপনশীল যোগীগুরুর কঠিন বাহ্যাবরণটি ভেদ করিতে তাঁহার সাধনোজ্জ্বলা দৃষ্টি সেদিন ভুল করে নাই।

অধ্যাত্মপথের দুঃসাহসিক অভিযানে রামদাস বাহির হইয়াছেন। এই অভিযাত্রার পথে দিনের পর দিন তাঁহাকে কম মূল্য প্রদান করিতে হয় নাই। কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগ-তিতিক্ষার চরম পরীক্ষার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে সদ্‌গুরু তাঁহাকে টানিয়া নিতেছেন পরম পরিণতিটির দিকে।

গুরুদেব একদিন রামদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, কোনো বিশেষ কাজের জন্য তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইবে, তিনি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত বৃক্ষতলের আসন ছাড়িয়া রামদাস যেন কোথাও না যায়। আদেশমতো শিষ্য ধুনি জ্বালাইয়া ধ্যানে বসিয়া গেলেন।

দিনের পর দিন গত হইল। গুরুদেবের কিন্তু ফিরিবার কোনো লক্ষণই নাই। কৃচ্ছ্রব্রতের একি বিচিত্র পরীক্ষায় তিনি শিষ্যকে সেদিন ফেলিয়া গেলেন! আসন ত্যাগ করার আদেশ নাই, তাই ক্রমাগত আটদিন রামদাস অবিরাম ধ্যান ভজনে নির্দিষ্ট আসনটিতে বসিয়াই কাটাইয়া দিলেন। আহার নিদ্রা নাই, মলমূত্র ত্যাগ পর্যন্ত নাই। অসামান্য গুরুভক্তিই সেদিন তাঁহার জীবনে দৈবী শক্তির প্রেরণা জাগাইয়া তুলিল।

ফিরিয়া আসিয়া গুরুজী সব শুনিলেন। প্রসন্নমধুর হাস্য ফুটিয়া উঠিল তাঁহার আননে। সস্নেহে শিষ্যকে কহিলেন, "সদ্‌গুরুর চরণে এই আত্মসমর্পণই যে সর্বাপেক্ষা বড় প্রস্তুতি, এতেই মিলে সাধকের আকাঙ্ক্ষিত ধন—গুরুকৃপা, সংসার ত্যাগের বেদনা ও পিতামাতার অশ্রুজল সার্থক হইয়া উঠে পরম প্রাপ্তিতে।

যোগীবর দেবদাসজী প্রিয় শিষ্যকে অর্পণ করিতে চাহেন তাঁহার অপরিমেয় যোগবিভূতি আর ব্রহ্মজ্ঞান। তিনি জানেন, রামদাস এক বিরাট আধার—অধ্যাত্মযোগের এক চিহ্নিত পুরুষ। তাই তো এই শিষ্যের জন্য তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ও যত্নের অবধি নাই। নিরন্তর শাসন ও ভর্ৎসনায় শিষ্যের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় কিনা, সতর্কভাবে তিনি পরীক্ষা করেন, বাক্য-যন্ত্রণার দহনে তাঁহার হৃদয়ের অভিমানকে করিতে থাকেন ভস্মীভূত।

অক্লান্ত গুরুসেবা ও সাধন-ভজনে সদা ব্যাপৃত থাকিয়াও রামদাসকে সহ্য করিতে হয় শ্লেষ এবং নিন্দার সুতীব্র কশাঘাত। "এ চামার", "এ ভাঙ্গী"—বলিয়া ডাকিয়া গুরুজী তাঁহার ধৈর্যের পরীক্ষা করেন। উদরের পরিচর্যার জন্যই যে শিষ্য এই বৈরাগ্যময় জীবন গ্রহণ করিয়াছে—বার বার একথা বলিয়া দেবদাসজী তাঁহার উষ্মাকে জাগাইয়া তুলিতে চান। পরীক্ষার পর চলিতে থাকে পরীক্ষা।

রামদাস কিন্তু জানেন, গুরুজীর এ কঠোর বাহ্য রূপের অভ্যন্তরে রহিয়াছে ভগবৎসত্তার প্রকাশ। ঐশী করুণার মাধুর্যে, আর যোগ-

বিভূতির ঐশ্বর্যে তাহা ভরপুর। এই বিরাট পুরুষের চরণতলে তাই এমনভাবে তিনি পড়িয়া রহিয়াছেন।

একদিন কিন্তু গুরুদেবের আচরণের রূঢ়তা চরমে পৌঁছিল। প্রচণ্ড রোষে অকস্মাৎ তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন, সামান্যতম কারণে রামদাসকে প্রহার করিতে লাগিলেন নির্দয়ভাবে।

প্রহার ও অশ্রাব্য গালিগালাজের পর চীৎকার করিয়া তিনি কহিলেন, "আমার এত দিনকার বড় বড় চেলা সব চলে গিয়েছে আর তুই শালা ভাঙ্গী কেন আমার পেছনে এমন ক'রে এখনো লেগে রয়েছিস, বল্‌তো? এক্ষুনি তুই আমার সামনে থেকে দূর হ। কোনো শালার সেবায় আমার এতটুকু দরকার নেই।"

লগুড়াঘাতে জর্জর রামদাস ভূতলে পতিত হইয়াছেন। তবুও গুরুজীর চরণ ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বার বার মিনতি করিতে থাকেন, পিতা-মাতাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া তিনি গুরুর পরমাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, আর যে কোথাও তাঁহার যাইবার স্থান নাই। সেই গুরুই যদি আজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে সারা পৃথিবীতে তিনি দাঁড়াইবেন কোথায়? ইহা অপেক্ষা গুরুদেব বরং তাঁহার গলায় কাটারি বসাইয়া দিন। যে চরণে রামদাস তাঁহার সর্বস্ব নিবেদন করিয়া বসিয়া আছেন, জীবন থাকিতে সে চরণ তিনি ত্যাগ করিবেন না।

রুদ্র অকস্মাৎ প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মেঘমালা হইতে এবার বর্ষিত হইল প্রাণদায়িনী বারিধারা। মুহূর্তমধ্যে দেবদাসজী মহারাজ রূপান্তরিত হইয়া গেলেন। স্মিতহাস্যে, স্নেহভরা কণ্ঠে, বলিতে লাগিলেন,—তাঁহার স্নেহপুত্তলী রামদাসের শেষ পরীক্ষা এবার সম্পন্ন হইয়াছে। শিষ্য তাঁহার আজ সসম্মানে উত্তীর্ণ—তাহার অহংবোধ এতদিনে নিশ্চিহ্নপ্রায়, বুদ্ধিও নিশ্চলা ও তত্ত্বোজ্জ্বলা হইয়া উঠিয়াছে।

গুরু যেন আজ কল্পতরু হইয়া বসিয়াছেন। উদার দাক্ষিণ্যভরা কণ্ঠে শিষ্য রামদাসকে তিনি প্রাণভরা আশীর্বাদ জানাইলেন, "বৎস,

তোমার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হবে। ঋদ্ধি সিদ্ধি আজ থেকে হবে তোমার করতলগত। আমি আরো বলছি, অল্পকাল মধ্যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভে জীবন তোমার ধন্য হবে।”

নতশিরে দণ্ডায়মান রামদাসের নয়নে তখন বহিতেছে প্রেমাশ্রুর ধারা। পুলকাঞ্চিত দেহে করুণাঘন গুরুদেবের চরণতলে তিনি সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িলেন।

কয়েকদিন পরের কথা। গুরু দেবদাসজী এক শহরের উপকণ্ঠে আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। প্রিয় শিষ্য রামদাস কিছুটা ব্যবধানে ধুনি জ্বালাইয়া উপবিষ্ট। এমন সময় কয়েকটি ভক্ত দর্শনার্থী সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের মধ্যে একজন কয়েকটি টাকা নবীন সন্ন্যাসী রামদাসের চরণতলে রাখিয়া প্রণাম করিল।

রামদাস চমকিত ও শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, “সে কি কথা! আমার শ্রীগুরুদেব, মহাসমর্থ তাপস দেবদাসজী মহারাজ, স্বয়ং এখানে উপস্থিত। কোনো ভেট যদি দিতেই হয় তো তাঁকেই নিবেদন করা উচিত। যোগেশ্বর গুরুদেবের সাক্ষাতে তাঁর নগণ্য শিষ্য আমি এ টাকা কি ক’রে নেবো?”

কিন্তু দর্শনার্থী ভক্তটি যে মনে মনে এ প্রণামী তাঁকেই নিবেদন করিয়াছে। কিছুতেই সে উহা আর ফিরাইয়া নিতে চাহিল না। ভক্তটি চলিয়া যাইবামাত্র রামদাসজী আসন ত্যাগ করিয়া গুরুদেবের কাছে গেলেন। টাকা কয়টি তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, “মহারাজ, এক ভক্ত দর্শনার্থী এই মাত্র এই ভেট দিয়ে গেল। কৃপা ক’রে আপনি গ্রহণ করুন।”

গুরুদেব ক্রোধে একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন। এ কোন্ ধরনের অশিষ্ট চেলা সে? স্বয়ং গুরু সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে সে নিজেই পূজার-ভেট গ্রহণ করিয়াছে? এমনি ঔদ্ধত্য তাহার!

রামদাসজী মহা ফাঁপরে পড়িলেন। কাতরকণ্ঠে গুরুদেবকে বুঝাইতে লাগিলেন, এ ভেট তিনি কোনোমতেই গ্রহণ করিতে চান

নাই। কিন্তু দর্শনার্থী ব্যক্তিটি তাঁহার কথা না মানিয়াই উহা রাখিয়া গিয়াছে। তাছাড়া, তিনি তো এ ভেট অবিলম্বে গুরুদেবের চরণেই নিবেদন করিতে আসিয়াছেন—আন্তর বা বাহ্য কোনো দিক দিয়াই তিনি নিজে এটা গ্রহণ করেন নাই। তবে গুরুজী কেন এমন কঠোর হইতেছেন ?

ক্রোধের অভিনয় ততক্ষণে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেবদাসজীর বাহিরের খোলস খুলিয়া এবার বাহির হইয়াছে করুণা ও দাক্ষিণ্যের রূপ! সহাস্য আননে শিষ্যের শিরে হাত রাখিয়া ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ কহিলেন, "আরে বেটা, তুম্‌ভী তো আভী সিদ্ধ হো গয়া। অ্যায়সা তো হোনেই পড়েগা। তুমকো তো মালুম নেহি হ্যায়—তুমভী এক শের বন্ গয়া। বাকি, দো শের এক ঠোর্ মে রহনে নেহি সক্‌তে।" —অর্থাৎ, বাবা, তুমিও যে ইতিমধ্যে সিদ্ধ মহাপুরুষ হয়ে গিয়েছ। কাজেই এরূপ ঘটনা ঘটাই যে স্বাভাবিক। তাছাড়া, তুমি জানো না, তুমিও যে হয়ে পড়েছো অধ্যাত্মজগতের এক বাঘ। এবার এক গুহায় আমাদের মতো দুই বাঘের থাকা তো আর ঠিক নয়!

অধ্যাত্মজীবনের স্থিতির জন্য, প্রকৃতকল্যাণের জন্য, শিষ্যকে এখন হইতে পৃথক পথেই চলিতে দিতে হইবে। রামদাসজীকে গুরু মহারাজ এবার তাই প্রেরণ করিলেন পরিব্রাজনে। শিষ্যের স্বাধীন অধ্যাত্মপরিক্রমা শুরু হইল এই পরিক্রমার মধ্য দিয়া। অচিরে দেখা দিল শ্রীশ্রী১০৮ রামদাস কাঠিয়াবাবার পরম অভ্যুদয়।

বৈরাগ্যময় জীবনের আহ্বানে, বিচিত্র পথরেখা বাহিয়া, রামদাস সদ্‌গুরু দেবদাসজীর চরণোপান্তে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহার সে পথের বাঁকে বাঁকে, সমগ্র পরিক্রমার পশ্চাতে, আত্মপ্রকাশ করে দৈবীশক্তির এক সুনির্দিষ্ট লীলা।

বাল্য, কৈশোর ও যৌবনে রামদাসের জীবনে দেখা গিয়াছে একই গতিচ্ছন্দ, আর একই মুমুক্ষা-পথের অনুসৃতি। তেমনি তাঁহার সারা অধ্যাত্মজীবনের নেপথ্যেও সদা সঞ্চরমান রহিয়াছে গুরুকৃপা ও ঐশীকৃপার আলোক-সংকেত।

পূর্ব পাঞ্জাবের এক নগণ্য গ্রাম সোনাচামারী। অমৃতসর হইতে ইহা প্রায় বিশ ক্রোশ দূরের পথ। এই গ্রামেরই এক বর্ধিষ্ণু গৃহস্থের ঘরে রামদাসের জন্ম। পিতা এক সম্মানিত ব্রাহ্মণ, গুরুগিরি করিয়া তাঁহার সংসার চালান। নিতান্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবন, কিন্তু গৃহে কোনো কিছুরই অনটন নাই। ক্ষেতের পর্যাপ্ত ফসল ও চার-পাঁচটি মহিষের দুগ্ধে সুখে-স্বচ্ছন্দে এ পরিবারের দিন চলে।

পিতৃগৃহের নিকটেই এক পরমহংস সন্ন্যাসীর আশ্রম। বালক রামদাস মায়ের পিছে পিছে প্রায়ই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে। একদিন কিন্তু এ ক্ষুদ্র বালকের এক প্রশ্ন সকলকে বিস্মিত করিয়া দেয়। পরমহংসজীকে সে জিজ্ঞাসা করে, "বাবা মহারাজ, আপনার কাছে তো কত লোকই আসে, আর সবাই আপনার চরণে শির নত করে। আপনি তো সকলেরই বড় ও পূজ্য। কিন্তু কি ক'রে আপনি এত বড় হলেন, আমায় বলুন তো। এ কৌশলটি একবার জানতে পারলে আমিও তা কাজে লাগাবো।"

পরমহংস সকৌতুকে এই বালকের দিকে চাহিলেন। সস্নেহে কহিলেন, "বেটা, আমি যে সদাই পরম পবিত্র রামনাম জপ করি। মঙ্গলময় রাম নামই যে আমাকে ছোট থেকে বড় ক'রে তুলেছে। মনে মনে এ নাম জপ করো, তুমিও এমনি বড় হতে পারবে।"

বালক চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া নেয়, তারপর জানায়, এই রামনামই সে জপ করা শুরু করিবে, আর হইয়া উঠিবে পরমহংসজীর মতো এমনি এক বড় সাধু।

পূর্বজন্মের শুভ সংস্কার ভাগ্যবলে জাগিয়া উঠিল, সেদিন হইতেই রামদাসের অন্তরে আবর্তিত হইতে লাগিল পবিত্র রামনামের প্রচ্ছন্ন জপমালা।

পিতার মহিষক'টি মাঠে বিচরণ করিতে যায়। রামদাস পাঁচনি হস্তে মাঝে মাঝে ইহাদের অনুগমন করে। তখনও সে নিতান্ত ক্ষুদ্র বালক, বয়স সাত আট বৎসরের বেশী হইবে না। একদিন সে মাঠের মাঝখানে এক বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আছে, হঠাৎ সেখানে

কোথা হইতে এক জটাজুটসমন্বিত সাধু আসিয়া উপস্থিত। সন্ন্যাসী বড় ক্ষুধার্ত। রামদাসকে তাড়াতাড়ি কিছু আহার্যের যোগাড় করিতে তিনি বলিলেন।

বালকের উৎসাহের সীমা নাই। সানন্দে সে বলিয়া উঠিল—"সাধুবাবা, তুমি আমার মোষগুলো একটু ত্মখো, আমি ঘর থেকে তোমার জন্যে সব কিছু নিয়ে আসছি।"

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ। বেলা ক্রমে গড়াইয়া পড়িতেছে। গৃহে পিতামাতা উভয়েই নিদ্রিত। বালক রামদাস চুপি চুপি ভাঁড়ার খুলিয়া প্রচুর ময়দা, চিনি ও ঘি লইয়া সোৎসাহে বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিল।

তাহার এ সেবানিষ্ঠা দেখিয়া সাধু বড় প্রসন্ন হইলেন। আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাচ্চা, তুম্ এক যোগীরাজ বন্ যাওগে।"

রামদাস কিন্তু বড় বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। যোগীরাজ হইবার মতো যোগ্যতা তাহার আছে কিনা, তাহা সে জানে না।

ব্যস্তসমস্ত হইয়া উত্তর করিল, "কিন্তু সাধুবাবা, আমার বাবা রোজ প্রায় দশ সের ক'রে মোষের দুধ পান করেন, আমিও তেমনি তাঁর সঙ্গে বসে দু-বেলা পাঁচ সের ক'রে দুধ উড়িয়ে দিই। তাহলে আমি কি ক'রে যোগীরাজ হবো?"

অতিথি সন্ন্যাসী সহাস্যে দক্ষিণ হস্তটি উত্তোলন করিলেন. উদার দাক্ষিণ্যভরা কণ্ঠে কহিলেন, "বাচ্চা, হামারা বচনসে তুম জরুর যোগীরাজ হোগে।" অতঃপর তল্পী-তল্পা গুটাইয়া ধীরে ধীরে তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু একি অলৌকিক কাণ্ড? সর্বত্যাগী সাধকের উচ্চারিত এই আশীর্বাণী যেন চৈতন্যময়। এ বাণীর ইন্দ্রজাল বালক রামদাসের সমস্ত জাগতিক চেতনাকে মুহূর্তের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। তাহার স্মৃতি হইতে পিতা-মাতা, গৃহ-অঙ্গন, বন-প্রান্তর—এই চারণরত মহিষের দল, সমস্ত কিছুর আকর্ষণই যেন অপসৃত হইয়া যায়। সারা অন্তরে তাঁহার ধ্বনিত হইতে থাকে শুধু একটিমাত্র বোধ—গৃহস্থাশ্রম

তাঁহার জন্য নয়! এক অদৃশ্য অপরিচিত লোকের আহ্বান কেবলই কানের কাছে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরে।

সাত বৎসর বয়স্ক বালকের অন্তরের এই প্রতিক্রিয়া সত্যসত্যই বড় বিস্ময়কর। উত্তরকালে রামদাস কাঠিয়াবাবা মহারাজ তাঁহার বাল্যজীবনের এই অনুভূতিটির কাহিনী সোৎসাহে তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের কাছে বিবৃত করিতেন।

রামদাসের পিতা আড়ম্বর সহকারে পুত্রের উপনয়ন দিলেন। তারপর শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ব্রহ্মচারী বালককে নিকটস্থ গ্রামে এক আচার্যের নিকট প্রেরণ করা হইল। মেধাবী রামদাস অল্পদিনের মধ্যেই আচার্যের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

সামান্য অভ্যাসেই পাঠ তাহার রোজ তৈরি হইয়া যায়, তারপর মালাটি হাতে নিয়া সে নিবিষ্ট হয় অভ্যস্ত রামনাম জপে।

ঈর্ষাপরায়ণ একদল সহপাঠী একদিন আচার্যের নিকট নালিশ জানায়—রামদাস তাহার কোনো পাঠেই মনঃসংযোগ করে না, গুরুর বাক্য অবহেলা করিয়া সে শুধু বসিয়া বসিয়া মালা টপ্‌কায়।

রামদাসকে তখনই ডাকা হইল। কিন্তু আচার্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কোনো পাঠই তাহার আয়ত্ত করিতে বাকি নাই। নিজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তবেই রোজ সে রত হয় তাহার নিয়মিত জপ-সাধনে। তাহাতে আর দোষ কোথায়?

মিথ্যা অভিযোগ আনয়নের জন্য আচার্য ঐ ছাত্রদের তিরস্কার করেন। ইহার পর হইতে আচার্য-গৃহে শিক্ষার্থী রামদাসের প্রতাপ-প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া যায়। আট-নয় বৎসর এই পণ্ডিতের শিক্ষাধীনে থাকিবার পর বিভিন্ন শাস্ত্রপাঠ তাঁহার সমাপ্ত হয়। গুরু-গৃহ হইতে যেদিন তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন সেদিন দেখা যায়, তরুণ শিক্ষার্থীর বক্ষোদেশে বাঁধা রহিয়াছে একখানি ভগবদ্গীতা। এই মহাগ্রন্থখানির সহিত তাঁহার জীবন তখন এক অচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

পুত্র আচার্য-গৃহ হইতে পড়া শেষ করিয়া ফিরিয়াছে। পিতা তাই এবার তাঁহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রামদাস তাহাতে কান পাতেন কই ? মুমুক্ষু তরুণের স্মৃতিতে তখনো অস্ফুট স্বরে ধ্বনিত হইতেছে বালক কালের দেখা সন্ন্যাসীর সেই বাণী—বাচ্চা, তুম্ জরুর যোগীরাজ বন্ যাওগে।

গৃহজীবনের মোহ ও বিষয়াসক্তি রামদাসের জীবন হইতে মুছিয়া গিয়াছে—তাই অধ্যাত্মজীবনের পথে বাহির হইয়া পড়িতে তিনি কৃতসংকল্প। পিতা মাতাকে এবার স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেই বিবাহ দেওয়া হোক—তিনি নিজে আর সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবেন না। আত্মপরিজনের ভর্ৎসনা বা অশ্রুজল কোনো কিছুই তাঁহাকে এ প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না।

গ্রামের প্রান্তে এক বিরাট বটবৃক্ষ। ইহারই নিচে তরুণ সাধক রামদাস আসন পাতিয়া জপে বসিলেন। গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিবেন, ইহাই তাঁহার মনের সংকল্প। এক লক্ষ জপ সমাপ্ত হইবার পর তিনি শ্রবণ করিলেন এক দিব্য বাণী। এ প্রত্যাদেশ তাঁহাকে জানাইয়া দিল—'বৎস, তুমি অবশিষ্ট পঁচিশ হাজার জপ সম্পূর্ণ করো জাগ্রত মহাতীর্থ জ্বালামুখীতে গিয়ে, তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।'

এই নির্দেশ পাইবার পর রামদাসের উৎসাহের সীমা রহিল না। জ্বালামুখী তাঁহার লোনাচামারী গ্রাম হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। অবিলম্বে সেই তীর্থের দিকে তিনি অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু পথমধ্যে এক নূতন কাণ্ড ঘটিয়া গেল। রামদাস হঠাৎ দেখিলেন, বৃক্ষতলে জটাজূটসমন্বিত দিব্যশ্রীমণ্ডিত এক সন্ন্যাসী আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। অমোঘ আকর্ষণ এই সন্ন্যাসীর! রামদাস ধীরে ধীরে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিল নিজের পূর্ব জীবনের সংস্কার। এ সন্ন্যাসী যেন কত কালের আপন জন। ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন। ফলে জ্বালামুখী তীর্থে বসিয়া তপস্যা করার সংকল্প একেবারে পরিত্যক্ত হইয়া গেল।

মুমুক্ষু তরুণ ব্যগ্রভাবে মহাপুরুষের নিকট সন্ন্যাস ও মন্ত্রদীক্ষার জন্য বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কৃপা অবশেষে মিলিল, শরণার্থী যুবককে চেলা করিয়া নিতে সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন। মস্তক মুণ্ডন করিয়া রামদাস এক শুভ মুহূর্তে গ্রহণ করিলেন বৈরাগ্য-আশ্রম। এই শক্তিধর মহাপুরুষই দেবদাস মহারাজ, তাঁহার দীক্ষাবীজ ও আশ্রয়ই উত্তরকালে রামদাসকে পৌঁছাইয়া দেয় সিদ্ধির অমৃতলোকে।

•

পিতার কাছে সন্ন্যাসের সংবাদ পৌঁছিতে দেরি হয় নাই। পুত্র ও তাঁহার দীক্ষাদাতা গুরুর নিকট তখনই তিনি ছুটিয়া আসিলেন। ভীতি প্রদর্শন ও অনুনয়-বিনয় সমস্ত কিছুই ব্যর্থ হইল—রামদাস প্রাণ গেলেও তাঁহার বৈরাগ্য-আশ্রম ত্যাগ করিতে সম্মত নন। এদিকে তাঁহার মাতা শোকাকুলা হইয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়াছেন। পিতা তাই সন্ন্যাসীকে অনুরোধ জানাইলেন, পুত্রকে জননীর সহিত একবার সাক্ষাতের অনুমতি তিনি দিন, অন্তত শেষ-বারের মতো নিজগৃহ সে একবারটি দেখিয়া আসুক। গুরুর অনুমতি মিলিবার পর রামদাস লোনাচামারীতে ফিরিয়া আসিলেন।

নবীন সন্ন্যাসী কিন্তু নিজগৃহে আর বাস করেন নাই, গ্রামের প্রান্তস্থিত এক বটবৃক্ষমূলে তিনি আসন পাতিয়া বসিলেন। কিন্তু জননীকে নিয়াই বিপদ বাধিল, প্রবল কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিলেন, তাঁহাকে ধৈর্য ধারণ করাইবে কে? রামদাস কিন্তু টলিলেন না, দৃঢ়স্বরে কহিলেন, মাতা স্থির না হইলে কালবিলম্ব না করিয়া তিনি গ্রাম ত্যাগ করিবেন।

এ সময়ে কোনো নির্দিষ্ট গৃহে তিনি ভোজন করিতেন না। পর্যায়ক্রমে গ্রামের বিভিন্ন গৃহস্থ-ঘরে তাঁহার ভিক্ষা চলিত।

ইতিমধ্যে সেখানে একদিন এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিল। সেদিন গভীর রাত্রিতে রামদাস বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। সম্মুখস্থ আকাশমণ্ডল অকস্মাৎ এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বয়ং গায়ত্রীদেবী তরুণ সাধকের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন,

"বৎস, তুমি গায়ত্রী মন্ত্রে সিদ্ধ হয়েছ, আমি তোমার প্রতি আজ প্রসন্না। তুমি তোমার ঈপ্সিত বর প্রার্থনা করো।"

করজোড়ে রামদাস উত্তর দিলেন, "মা, আমি যে এখন সন্ন্যাসী হয়েছি। কামনাবাসনা আমার থাকতে নেই, প্রার্থনার প্রয়োজনও তাই দেখছিনে। আমার অন্তরের এই শুধু প্রার্থনা—তুমি আমার প্রতি সদা প্রসন্না থাক।"

"তথাস্তু"—বলিয়া দেবী অন্তরীক্ষে মিলাইয়া গেলেন।

রামদাসের নিকট গ্রামের বহু নরনারীই তখন আনাগোনা করিতেছে। এই সময়ে তিনি কিন্তু এক মহাবিপদে পতিত হন। এক সুন্দরী তরুণী সন্ন্যাসী রামদাসকে দেখিয়া বড় মুগ্ধ হয়, তাঁহাকে সে প্রলুব্ধ করিতে থাকে। রমণীর বাস এই গ্রামেই, রামদাসের সে পূর্ব পরিচিতা। বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা কঠিন হইয়া পড়ে।

যুবতীটি একদিন কামার্তা হয়, গভীর নিশীথে সে তাঁহার আসনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে। তরুণ সাধক প্রমাদ গণিলেন। অনন্যোপায় হইয়া সজোরে তিনি প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে থাকেন, ভয় পাইয়া এই রমণী সরিয়া পড়ে।

পরের দিন দেখা যায়, রামদাস গ্রাম হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। আর কখনো তিনি জন্মভূমিতে পদার্পণ করেন নাই।

এইবার সাধক জীবনে পরিব্রাজনের পালা। গুরুর নির্দেশে বহু তীর্থ ও জনপদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহাকে দীর্ঘদিন কাটাইতে হয়। এই সময়ে একবার রামদাসজী মহারাজ কোনো এক দেশীয় রাজার রাজ্যে উপস্থিত হন। এখানকার রানী এক বিধবা তরুণী, তাছাড়া অসাধারণ রূপলাবণ্যবতীও তিনি। রামদাসকে প্রাসাদে আনয়ন করিয়া রানী সাহেবা তাঁহার সেবাযত্ন করিতে থাকেন। তরুণ সাধুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়া রানী ধীরে ধীরে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, একদিন ব্যাকুল অন্তরে প্রেম নিবেদনও করিয়া বসেন। স্বীয় যৌবন

ও বিপুল সম্পদ ভোগ করার জন্য নবীন সন্ন্যাসীকে বারংবার তিনি মিনতি জানাইতে থাকেন।

এই রূপসী তরুণীর সান্নিধ্য ও তাঁহার প্রেমের স্পর্শ সাধক রামদাসকে কিছুটা চঞ্চল করিয়া তোলে। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে সন্ন্যাস জীবনের পবিত্র দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হইয়া উঠেন। অন্তরে জাগে বিবেকের তীব্র দংশন। মোহাবিষ্ট হইয়া এ তিনি কি করিতেছেন? বৈরাগ্য আশ্রম গ্রহণ করিয়া মুক্তির সাধনায় তিনি ব্রতী, রমণীর রূপমোহ কি আজ তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিবে?

সেই মুহূর্তেই এই নারী ও রাজপ্রাসাদের সমস্ত কিছু প্রলোভন ত্যাগ করিয়া রামদাস সবেগে রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু একি অদ্ভুত ব্যাপার? ঐ রূপসী রানী সাহেবার স্মৃতি তখনও তাঁহার অন্তর হইতে মুছিয়া যাইতে চাহে না। রাজপ্রাসাদের এ মোহিনী যেন তাহার মায়াজাল বিস্তার করিয়া আবার তাঁহাকে কবলিত করিতে চাহিতেছে। সাময়িক এক দুর্বলতা তরুণ সাধকের অন্তরে আবার সে সময়ে দেখা দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় তিনি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। দ্রুত পদবিক্ষেপে রাজ্যের বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়েন।

উত্তরকালে মহাসাধক রামদাস কাঠিয়াবাবাকে প্রায়ই বলিতে শুনা যাইত—"অহেতুক ভগবৎকৃপা ছাড়া তরুণ সাধকের পক্ষে রিপু জয় করা বড় কঠিন।"

পরিব্রাজকরূপে রামদাসজী একবার উত্তরাখণ্ডের গহন বনাঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন জনবিরল কোনো উচ্চ পাহাড়ে একটি প্রস্তরাবদ্ধ গুহামুখ তিনি দেখিতে পান। কৌতূহলী হইয়া তরুণ সাধক উহার দ্বার উন্মোচন করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দীর্ঘ জটাজুটসমন্বিত বিরাটকায় এক প্রাচীন যোগী সেখানে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। গুহার প্রান্তদেশে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন। লোল চর্মের

আবরণে চক্ষুদ্বয় ঢাকিয়া গিয়াছে। রামদাস ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

প্রাচীন তাপস এবার আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া গুহাদ্বারে দাঁড়াইলেন। তারপর হস্ত দ্বারা নয়নোপরি বিলম্বিত চর্মাবরণটি ধীরে ধীরে তুলিয়া ধরিলেন। রামদাসের তখন মনে হইল, মহাপুরুষের চক্ষু-তারকা হইতে যেন অগ্নি বর্ষিত হইতেছে। গম্ভীর কণ্ঠে বৃদ্ধ যোগীবর তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

রামদাস ততক্ষণে ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছেন। অর্ধস্ফুট স্বরে উত্তর দিলেন—"মহারাজ, আমি আপনার বালক—এক দীন চেলা।"

"চেলা? সে কি কথা? বেশ, চেলা-ই যদি হও, আমার আদেশমতো সব কিছু কাজ করতে পারবে?"

"আজ্ঞে মহারাজ, আপনার কৃপায় অবশ্যই সব পারবো।"

গুহার নিচেই এক সুগভীর পার্বত্য খাদ, খরস্রোতা নদী সেখানে গর্জন করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। বৃদ্ধ সাধু অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, "যদি চেলা-ই হয়ে থাক, তবে এই মুহূর্তে আমার আদেশে ঐ জলস্রোতে ঝাঁপ দিয়ে পড়!"

নিচে তাকাইয়া রামদাস শিহরিয়া উঠিলেন। পার্বত্য-খাদের ঐ উন্মত্ত প্রবাহে ঝাঁপ দিবার অর্থ, নিশ্চিত মৃত্যু। কিন্তু আদেশ পালন না করিলেই বা বাঁচিবার উপায় কোথায়? রুদ্রপ্রতিম এই যোগীর রোষবহ্নি হইতে যে নিস্তার নাই।

ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া রামদাস পর্বতশৃঙ্গ হইতে তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদান করিলেন। জলে নিপতিত তাঁহার দেহখানি তখন তীব্র স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। এ সময়ে হঠাৎ এক মহা অলৌকিক কাণ্ড সংঘটিত হইতে দেখা যায়। বৃদ্ধ তাপস অত্যাশ্চর্য যোগবিভূতিবলে তাঁহার হস্তখানি নিম্নদিকে প্রসারিত করেন। মুহূর্তমধ্যে তাহা দীর্ঘায়ত হইয়া রামদাসের স্রোত-বাহিত দেহখানিকে স্পর্শ করে। যোগশক্তির বিস্ময়কর ক্রিয়া এখানেই শুধু থামে নাই, তৎক্ষণাৎ যোগীর হস্তের

আকর্ষণে ভাসমান দেহখানি শূন্যে উত্থিত হয়, সরাসরি সেটিকে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দেয় গুহাদ্বারে।

ভয়ে বিস্ময়ে রামদাস তখন একেবারে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছেন। সম্মুখে দণ্ডায়মান যোগীবরের ক্রোধোদ্দীপ্ত রূপটি কিন্তু আর নাই। আননে তাঁহার প্রসন্নমধুর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রামদাসকে আশিস্ জানাইয়া তিনি কহিতে লাগিলেন—"বৎস, তুমি চেলা হবার যোগ্য, এটা ঠিকই। তোমার কল্যাণ হোক—সদ্‌গুরুর কৃপায় অভীষ্ট পূর্ণ হোক। কিন্তু এখান থেকে তুমি অবিলম্বে প্রস্থান করো। এ অঞ্চল ঋষিদের এক বিশেষ তপঃক্ষেত্র। এখানে তুমি আর অবস্থান ক'রো না।"

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইয়া রামদাস ধীরে ধীরে যোগীর সাধনস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হন।

পরিব্রাজনের পর্ব এবার শেষ হয়। রামদাস অতঃপর দেবদাসজী মহারাজের সহিত মিলিত হন, গুরুদেবের একনিষ্ঠ সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন্। শক্তিধর আচার্যের নিরন্তর সাহচর্য ও সাধন-নির্দেশে রামদাসের অধ্যাত্ম-জীবনে ক্রমে সাধিত হয় বিরাট রূপান্তর।

গুরু দেবদাসজী পূর্বাশ্রমে ছিলেন অযোধ্যার অধিবাসী। নিম্বার্ক শাখার অন্তর্ভুক্ত এক অসামান্য যোগীর কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। তারপর বহু বৎসর তপশ্চর্যার পর এই কঠোরতপা সাধক অপরিমেয় যোগশক্তির অধিকারী হন। রামদাস জ্বালামুখী গমনের পথে যখন দেবদাসজীর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন তখনই তিনি এক বহুবিশ্রুত যোগী। পরিব্রাজনের সময় কিছুকালের জন্য উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়। তারপর আবার শুরু হয় গুরু ও শিষ্যের জীবনে ঘনিষ্ঠ যোগবন্ধনের এক নূতনতর অধ্যায়। দেবদাসজীর যোগবিভূতি ও কৃপালীলা শিষ্যের সম্মুখে একের পর এক উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে।

গুরুদেব কোনো কোনো সময়ে একাদিক্রমে একই আসনোপরি ছয় মাসকাল জড় সমাধিতে মগ্ন থাকিতেন। দিনের পর দিন তাঁহার এই কাণ্ড দেখিয়া তরুণ শিষ্য রামদাসজীর বিস্ময়ের সীমা থাকিত না। যোগীবর দেবদাসজীর বাহ্য জীবনের চলাফেরার বৈশিষ্ট্যও বড় কম ছিল না। নয়নে নিদ্রার লেশমাত্র নাই, গাঁজা আর চরসের ধূমপানে আগ্রহও ছিল তাঁহার অপরিসীম।

রামদাসজীর চোখে গুরুর আহার্য গ্রহণের পর্বটি ছিল সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যাপার। ধুনি হইতে খানিকটা ভস্ম লইয়া কমণ্ডলুর জলে তিনি ফেলিয়া দিতেন, তারপর এই বিভূতি-মিশ্রিত জল সবটা পান করিতেন। আবার সঙ্গে সঙ্গে এই মিশ্র বস্তুকে অগৌণে উদর হইতে বিদায় দিতেও তাঁহার বিলম্ব ঘটিত না। যৌগিক প্রক্রিয়াবলে উহা উদ্‌গীরণ করিয়া ফেলিয়াই শিষ্য রামদাসকে দেবদাসজী উহা তৌল করিতে বলিতেন। প্রতিবারই মাপিয়া দেখা যাইত, এই ভস্ম-গোলা জল সমপরিমাণেই পাকস্থলী হইতে পুনরায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইহাই ছিল তাঁহার গুরুদেবের দৈনন্দিন আহার।

মহাযোগীর এ আহার সম্বন্ধে ব্যতিক্রমও যে মাঝে মাঝে না দেখা যাইত এমন নয়। একবার দেবদাসজী শিষ্যকে ডাকিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, তাঁহার দেহে প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভূত হইতেছে, অবিলম্বে প্রচুর দুগ্ধ পান না করাইলে তাঁহার আর নিস্তার নাই।

ত্রস্তব্যস্ত রামদাসজী দ্রুতপদে একটি বৃহৎ ভাণ্ড লইয়া গৃহস্থদের বসতিতে চলিয়া গেলেন। সাধুবাবার জন্য প্রায় আধ মণ দুধ সংগৃহীত হইল। হাঁড়িটি সম্মুখে স্থাপন করামাত্রই দেবদাসজী মহারাজ ঢক্ ঢক্ করিয়া উহার সবটা পান করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু দেহের গরম তাহাতেও মিটিতেছে না—তিনি আরও বেশি পরিমাণ দুগ্ধ আনয়নের জন্য আদেশ দিলেন। ব্যাপার দেখিয়া রামদাসের তো চক্ষুস্থির!

যুক্তকরে সানুনয়ে তিনি কহিলেন, 'বাবা, তুমি পরমাত্মাস্বরূপ—তোমার দেহের উত্তাপ মেটাবার মতো সামর্থ্য আমার কোথায়?

আধমণ দুধ তো দেখছি এক মুহূর্তে উড়ে গেল, তারপর আর এখন কি করা যায় ?"

গুরুদেব কৃপাপরবশ হইয়া স্মিতহাস্তে বলিলেন, "না বেটা, তুমি আরও সামান্য কিছু দুধ নিয়ে এসো। এবার আমার পিপাসা নিশ্চয় মিটবে।"

আরো কয়েক সের দুগ্ধ সংগ্রহ করা হইল। উহা পানের পর তবে দেবদাসজীর ঐ উত্তাপ দূর হয়।

ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের পরীক্ষার জন্যও শক্তিধর গুরুকে মাঝে মাঝে লীলাখেলার অবতারণা করিতে দেখা যাইত। একবার কোনো পার্বত্য শহরের নিকটে এক গহন বনে দেবদাসজী মহারাজ আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। সঙ্গে রামদাস প্রভৃতি জনকয়েক অন্তরঙ্গ শিষ্য। গুরুদেব হঠাৎ মধ্য রাত্রিতে আদেশ করিয়া বসিলেন—নিকটস্থ শহর হইতে এখনই দু-টাকার গাঁজা কিনিয়া আনিতে হইবে, শিষ্যদের একজন এখনই রওনা হইয়া যাক্।

সকলেই প্রমাদ গণিলেন। এ জঙ্গল হিংস্র জন্তু ও শ্বাপদসঙ্কুল। এ সময়ে বাহির হইতে হইলে প্রাণ হাতের মুঠোয় করিয়া যাইতে হইবে। অন্ধকার রজনীতে পথ চিনিবার উপায় নাই। তাছাড়া, নিঃসম্বল সাধুদের কাহারো কাছে টাকাকড়ি কিছুই নাই। এই গভীর রাত্রিতে শহরে গেলে ভিক্ষাই বা কে দিবে ?

শিষ্যের দল নতশিরে চিন্তামগ্ন। কিন্তু রামদাস দৃঢ়চিত্তে তখনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গুরুদেবের আদেশ পালনের জন্য তিনি প্রস্তুত। দেবদাসজী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন—"বেশ বাচ্চা, তবে তুমিই যাও। টাকার জন্য তোমার কোনো ভাবনা নেই। শহরে পৌঁছানোমাত্র একটি লোক তোমায় দুটো টাকা দেবে। তাই নিয়ে তুমি গাঁজা কিনে আনবে।"

অরণ্যপথ অতিক্রম করিয়া রামদাস শহরে পৌঁছিলেন। গভীর নিশীথ। রাস্তাঘাট একেবারে জনশূন্য। গৃহস্থ ও দোকানীদের ঘরে আলো জ্বলিতেছে না। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাস্তার একটি বাঁক

ফিরিতেই তিনি দেখিলেন, নিকটস্থ গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছে। দ্বারে করাঘাত করা মাত্র এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। এই নিশীথ রাত্রে সাধুর দর্শন পাইয়া তাহার যেন আনন্দের সীমা নাই। প্রণাম করিয়া যুক্তকরে সে জানাইল—আজ তাহার পরম সৌভাগ্য! সকাল হইতেই সে সংকল্প করিয়া আছে, দুইটি টাকা কোনো সাধুকে ভেট দিবে। সারাদিন প্রতীক্ষায় কাটিয়াছে। অতঃপর এই গভীর রাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে ভগবান্ সে সংকল্প সিদ্ধ করিলেন।

টাকা দুইটি লইয়া রামদাস গুরুদেবের জন্য গাঁজা ক্রয় করিলেন। এইবার সত্বর তাঁহাকে ফিরিতে হইবে। সম্মুখে ঘোর অন্ধকারময় বনপথ। রাত্রিতে তীব্র ঠাণ্ডাও পড়িয়াছে। রামদাসজী গুরুসেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদী গাঁজা সেবনেও আজকাল বেশ কিছুটা অভ্যস্ত হইয়াছেন। ভাবিলেন, ইহা হইতে এক ছিলিম গাঁজা পৃথক করিয়া নিয়া এক কল্‌কে এখানেই টানিয়া গেলে ক্ষতি কি? করিলেনও তাহাই। ছিলিম উড়াইয়া তারপর তৃপ্ত মনে ধীরে ধীরে বনপথ দিয়া উপস্থিত হইলেন গুরুর সকাশে।

দেবদাসজী মহারাজের পদপ্রান্তে গাঁজার পুঁটুলীটি রাখা মাত্রই শ্লেষাত্মক কণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওরে, গুরুসেবা কি শিষ্য এমনি ক'রেই করে? ভোগের অগ্রভাগ আগে নিজে নিয়ে, তারপর তা গুরুকে নিবেদন করছিস্? এ শিক্ষাই বুঝি এতদিনে হয়েছে?

রামদাস বিস্ময়ে ভয়ে ততক্ষণে হতবাক্ হইয়া গিয়াছেন। গুরুজী সম্পর্কে যে কথা কেবল শোনা ও জানা ছিল—আজ তা তাঁহার ধৃতিতে অনড় হইয়া বসিয়া গেল। বুঝিলেন, গুরুদেব অন্তর্যামী ও মহাশক্তিধর। তাঁহার সদাজাগ্রত দৃষ্টি অবলীলায় যে কোনো জাগতিক বাধা, যে কোনো দূরত্বকে অতিক্রম করিতে সক্ষম।

ভীতকণ্ঠে জোড় হস্তে তিনি মার্জনা চাহিলেন। তিনি অবোধ শিশুমাত্র, শ্রীগুরুর মহিমা আজিও তাঁহার অন্তর-সত্তায় ফুটিয়া উঠে নাই,—ইহাই বার বার সখেদে কহিতে লাগিলেন।

দেবদাসজী মহারাজ এবার প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "ঠিকই। তুমি নিতান্ত বালক মাত্র। তাই আজকের এ অপরাধ ক্ষমা করা গেল। কিন্তু জেনে রাখবে, প্রকৃত সদ্‌গুরুর দৃষ্টি থেকে সামান্যতম চিন্তাটুকুও কখনো গোপন করা যায় না।"

একবার রামদাস তাঁহার গুরুজীর সঙ্গে পাঞ্জাবের কোনো এক তীর্থের দিকে চলিয়াছেন। লাহোর নগরীর সন্নিহিত অঞ্চলে পৌঁছিয়া একসময়ে উভয়ে আসন পাতিয়া বসিলেন। চতুর্দিক হইতে আরও বহু সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া জড় হইয়াছেন। রীতিমতো এক বৃহৎ সাধু-জমায়েৎ। লাহোরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীদের অনেকে মহাত্মাদের নিকট আনাগোনা করিতেছেন।

রামদাস ও তাঁহার গুরুজীর সম্মুখে এই সময়ে এক প্রসিদ্ধ ধনবান শেঠ উপবিষ্ট। শালের ব্যবসায়ে এ লোকটি প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে।

দেবদাসজী হঠাৎ ইহাকে আদেশ করিয়া বসিলেন, "জমায়েতের সাধুদের তুমি আজ ভাণ্ডারা দাও।"

সমবেত সাধুদের সংখ্যা হইবে সহস্রাধিক। শেঠজী চমকিয়া উঠিলেন। এত লোককে ভোজন করাইতে হইবে? এ যে বহু টাকার ব্যাপার। না, এ তিনি পারিবেন না। শুধু তাহাই নয়, সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে এ সময়ে কিছু শ্লেষাত্মক মন্তব্যও তিনি করিলেন।

দেবদাসজী তাঁহার কথায় বড় কুপিত হইয়া উঠিলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "বানিয়া, দেখতে পাচ্ছি তোমার ধন-গর্ব বড় বেশী হয়ে পড়েছে। সর্বত্যাগী সাধুদের অবজ্ঞা করার সাহস তোমার হয়েছে। এ এক গুরুতর অপরাধ! এজন্য আজ তোমার কিছু দণ্ড হওয়া উচিত। ঘরে ফিরে গিয়ে দেখবে—অগ্নিদেব তোমার শালের বস্তায় আবির্ভূত হয়েছেন।"

যত সব অলক্ষুণে কথা! শেঠজী ত্রস্তব্যস্তে গৃহের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখস্থ ধুনিতে কিঞ্চিৎ জল উৎসর্গ করিয়া

দেবদাসজী মুচকি হাসিয়া রামদাসকে কহিলেন, "বানিয়ার শাল গুদামে আগুন লাগা শুরু হয়ে গেল।"

কিছুক্ষণ বাদেই শাল ব্যবসায়ী শেঠজী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আবার সেখানে আসিয়া উপস্থিত। অশ্রুসজল চক্ষে তিনি কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আমার যে সর্বনাশ উপস্থিত! আপনি কৃপা ক'রে রক্ষা না করলে আমি ধনেপ্রাণে মারা যাচ্ছি। আমার শাল গুদাম এত সুরক্ষিত কিন্তু কি ক'রে যেন সত্য সত্যই সেখানে আগুন জ্বলে উঠেছে। আমি নিতান্ত অবোধ, আপনি আজ আমায় ক্ষমা করুন। কথা দিচ্ছি, এ সাধু জমায়েতকে আমি সাতদিন ধরে ভালো ক'রে ভাণ্ডারা দেব।"

কাতর অনুনয়ে দেবদাসজী করুণার্দ্র হইয়া উঠিয়াছেন। শেঠজীকে এবার অভয় দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা বেটা, তুমি শান্ত হও। গুদামের আগুন এখনই নিভে যাবে। কিন্তু সাধুদের অবজ্ঞা করার জন্য দণ্ড তোমাকে পেতে হবেই। তোমার একখানা দামী শাল এ আগুনে নষ্ট হবে। যাও, আর এরকম অপরাধ কখনো ক'রো না।"

পরে দেখা গেল, সত্য সত্যই একখানা শালই মাত্র দগ্ধ হইয়াছে, তাছাড়া, বানিয়ার গুদামের আর বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় নাই।

ব্যাপার দেখিয়া রামদাস একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। অন্তরে তাঁহার নানা প্রশ্নও আবার জাগিতেছে। অবশেষে সাহস সঞ্চয় করিয়া করজোড়ে তিনি গুরুজীকে এ ঘটনাটির উপর আলোক-পাত করিতে কহিলেন।

দেবদাসজী মহারাজের বুঝিতে বাকী নাই, যোগবিভূতির এ ধরনের প্রয়োগ, সাধু জমায়েতের ভোজনের প্রশ্ন লইয়া এরূপ দণ্ড প্রদান, তাঁহার শিষ্যকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তিনি সহাস্যে কহিতে লাগিলেন, "বেটা তুমি তো জানো না, এই বানিয়া প্রকৃতই এক সজ্জন ও ধর্মপ্রাণ লোক। কিন্তু ধনগর্ব তাকে পথভ্রষ্ট ক'রে দিচ্ছিল। আজকের এই দণ্ড তার পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে। জেনে রেখো, এখন থেকে তার জীবনের মোড় অবশ্য ফিরবে।"

সদ্‌গুরুর রোষবহ্নির পশ্চাতে সদাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাঁহার কল্যাণ হস্ত ; এই নিগূঢ় তত্ত্বটি জানিয়া রামদাসের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না।

দেবদাসজী মহারাজের যোগৈশ্বর্য ও তাঁহার অলৌকিক জীবনের মহিমা এমনি করিয়াই দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, শিষ্য রামদাসের জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে, তাঁহাকে অধ্যাত্ম-সাধনার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। উত্তরজীবনে গুরুজীর বিভূতিলীলার নানা কাহিনী তিনি হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বর্ণনা করিতেন।

একবার রামদাসজী ও অন্যান্য শিষ্যগণসহ দেবদাসজী মহারাজ মধ্যভারত অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন। একদিন ভূপালতালের নিকটে আসিয়া হঠাৎ কি জানি কেন, শিষ্যদের তিনি কিছুটা দূরে অবস্থান করিতে আদেশ দেন। তারপর স্বয়ং ঐ সরোবরের তীরে দাঁড়াইয়া ঘোর নিনাদে বার বার করিতে থাকেন শঙ্খধ্বনি।

ভূপালতালের অপর তীরেই মুসলমান নবাবের প্রকাণ্ড প্রাসাদ। ইতিপূর্বে নবাব এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, এই সরোবরের তীরবর্তী অঞ্চলে কেহ শঙ্খ-ঘণ্টায় ধ্বনি করিতে পারিবে না। আদেশ অমান্যের শাস্তি—শিরশ্ছেদ।

হঠাৎ এ প্রচণ্ড শঙ্খধ্বনি শুনিয়া তো সকলে বিস্মিত। ব্যাপার কি জানিবার জন্য নবাব তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইলেন। দরবারে সংবাদ পৌঁছিল, এক হিন্দু সন্ন্যাসী সরকারী আজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া ওখানে শঙ্খ বাজাইতেছে।

আর যায় কোথায়! নবাব বাহাদুর ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। প্রাসাদের অদূরে দাঁড়াইয়া বার বার আইন অমান্যের দুঃসাহস সাধুটির কি করিয়া হয়? প্রহরীদের আদেশ দিলেন, তাহারা যেন অবিলম্বে ঐ উদ্ধত সাধুর শিরশ্ছেদ করে অথবা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনে।

সাধুর আসনের সম্মুখে গিয়া নবাবের অনুচরেরা কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। সেখানে কোনো জীবিত মানুষ তো নাই! শুধু

রহিয়াছে একটি সাধুর খণ্ডিত মস্তক; অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত অবস্থায় ভূপালতালের তীরে ছড়ানো রহিয়াছে।

নবাবের প্রহরীদল ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিল। কিন্তু একি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! আবার সেই স্থান হইতেই কে যেন সজোরে শঙ্খধ্বনি করিতেছে। প্রহরীরা দ্রুতবেগে ছুটিয়া গিয়া এবার যাহা দেখিল, তাহা আরও রহস্যময়। মনুষ্যদেহের কর্তিত অংশগুলি সেখান হইতে ইহারই মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, রক্তপাতের বিন্দুমাত্র চিহ্ন কোথাও দেখা যাইতেছে না।

আনুপূর্বক সমস্ত ঘটনা শুনিয়া নবাবের ধারণা হইল, এই সাধু নিশ্চয়ই এক মহাশক্তিধর যোগীপুরুষ। মনে তাঁহার ভয় ও ভক্তি দুয়েরই সঞ্চার হইল। ভাবিয়া দেখিলেন, ইঁহার সহিত আর দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

অমাত্যবর্গসহ অগৌণে তিনি সরোবরের তটে উপস্থিত হন। সকলে হতবাক্ হইয়া দেখেন, দীর্ঘ জটাজূটসমন্বিত এক তেজোদৃপ্ত সন্ন্যাসী সেখানে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট।

যোগীকে অভিবাদন করিয়া নবাব বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন। সেবা পরিচর্যা ও আদেশ পালনের জন্য তাঁহার তখন ব্যগ্রতার সীমা নাই।

যোগীবর প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "ভেবে গ্যাখো, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করা তোমার পক্ষে কি গর্হিত হয় নি? তুমি মুসলমান, বেশতো, তোমার ধর্ম তুমি পালন ক'রে যাও। সঙ্গে সঙ্গে অপর ধর্মের লোকদেরও তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্মাচরণ করতে দেওয়া তো তোমার উচিত। তোমার এ অন্যায় ঘোষণা অবিলম্বে প্রত্যাহার করো।"

নবাব তখনই যোগীবরের আদেশ সানন্দে মানিয়া নিলেন। এই ভূপালতালের তীরে মহাত্মা দেবদাসজী অতঃপর এক দেবমন্দির প্রস্তুত করান। উত্তরকালে রামদাস কাঠিয়াবাবা এটিকেই তাঁহার গুরুদ্বারা বলিয়া অভিহিত করিতেন।

শক্তিধর গুরুর আশ্রয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে রামদাসজীর জীবনে দুশ্চর তপস্যার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। কঠোর কৃচ্ছ্রব্রত, একনিষ্ঠ অধ্যাত্ম-সাধনা ও চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া পরম প্রাপ্তির পথে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হয়। মহাসমর্থ গুরুর সদাসজাগ-দৃষ্টি ও নিপুণ পরিচালনা এই উপযুক্ত অধিকারী শিষ্যকে তাঁহার প্রার্থিত সিদ্ধির দিকে পৌঁছাইয়া দিতে থাকে।

শীত নাই গ্রীষ্ম নাই, ধুনি জ্বালাইয়া রামদাসকে সারা রাত্রিই ভজন করিতে হইত। মাঘের প্রচণ্ড শীতে তাঁহার একমাত্র গাত্রাবরণ ছিল তিনহাত লম্বা একখণ্ড সূতির বস্ত্র।

রামদাসের কোমরে গুরুজী মোটা ও ভারী একটি কাঠের আড়বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে আবার ঝুলানো থাকিত কাষ্ঠনির্মিত এক লেঙোটি। এই কঠিন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াই দিনান্তের সাধন শেষে রামদাস ও তাহার সতীর্থদের শয়ন করিতে হইত। তামসিক ঘুম যাহাতে নবীন সাধকদের ভজন ও ধ্যানে বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে, সেজন্যই গুরু দেবদাসজীর এ কঠোর ব্যবস্থা।

কিন্তু নিদ্রা তো দূরের কথা, এ কাষ্ঠ-লেঙোটি বিশ্রাম বা শয়নেও বিঘ্ন জন্মাইত। আড়বন্ধটি সর্বদা এরূপ উঁচু হইয়া থাকার জন্য দেহটিকে শায়িত ও বিন্যস্ত রাখা বড়ই দুষ্কর ছিল। তাই গোড়ার দিকে রামদাস বালুকাময় স্থানকেই শয্যারূপে নির্বাচন করিতেন এবং কাষ্ঠনির্মিত আড়বন্ধ লেঙোটি উহাতে প্রবেশ করাইয়া তবে তিনি খানিকক্ষণ শয়ন করিতে পারিতেন। পরবর্তীকালে এ কৃচ্ছ্রসাধনে তিনি অভ্যস্ত হইয়া ওঠেন এবং তাঁহার এ কাঠের পরিচ্ছদটিই কাঠিয়াবাবারূপে তাঁহাকে সর্বত্র পরিচিত করিয়া তোলে।

গুরুকৃপা শিরে ধারণ করিয়া রামদাস সাধনায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন—দেবদাসজী মহারাজের নানা কঠোর পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হন। মহাসমর্থ গুরুর আশীর্বাদে ঋদ্ধি ও সিদ্ধি দুই-ই হয় তাঁহার করতলগত।

এই সময়ে দেবদাসজী একদিন শিষ্যকে আদেশ দেন, দ্বারকাধাম

তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। কারণ, দ্বারকা তাঁহাদের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মুখ্যধাম।

রামদাস কিন্তু মহারাজকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে রাজী নহেন। করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ, আপনাকে আমি ভগবৎস্বরূপ বলেই জানি। শাস্ত্রেও রয়েছে সদ্‌গুরুর চরণেই সর্ব তীর্থ বর্তমান। আপনার চরণতলে বসেই তো আমার তীর্থ-ধর্ম সবকিছু হচ্ছে। দ্বারকায় যেতে তাই আমার তেমন ইচ্ছে নেই।"

দেবদাসজী মহারাজ অমনি গর্জিয়া উঠিলেন। শ্লেষাত্মক ভাষায় রামদাসকে বলিতে লাগিলেন, "আরে, তুই দেখছি মস্ত জ্ঞানী হয়ে পড়েছিস্! তোর বুঝি ধারণা হয়েছে যে, তোর মতো জ্ঞানী তোর গুরুপর্যায়ের মধ্যে কেউ হয় নি? আমি দ্বারকাধামে গিয়েছি, আমার গুরু, দাদা-গুরু, সবাই গিয়েছেন আর তুই এমনি মহাজ্ঞানী যে, তোর আর এই মুখ্যধাম দর্শনের প্রয়োজন নেই! এ বুদ্ধি পরিত্যাগ কর্। আমি আদেশ করছি, দ্বারকাধাম থেকে ঘুরে আয়।"

রামদাস বাধ্য হইয়া দ্বারকার পথে সেদিন পা বাড়াইলেন।

কিন্তু শ্রীধাম দর্শনান্তে ফিরিয়া আসিয়া যে দুঃসংবাদ শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। সদ্‌গুরু দেবদাসজী মহারাজ ইতিমধ্যে মরদেহটি ত্যাগ করিয়াছেন।

গুরুর শূন্য আসনের দিকে তাকাইয়া রামদাস শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহারই পরমাশ্রয়ের লোভে পিতামাতা, ভাই-বন্ধু এবং সংসারের সবকিছু আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া তিনি আসিয়াছিলেন। ভগবদ্‌স্বরূপ গুরুজীর বিহনে এ জীবনে আর কোন্ প্রয়োজন? এ সন্ন্যাসীর বেশই বা আর ধারণ করা কেন? শোকাকুল রামদাস কাঁদিতে কাঁদিতে মস্তকের জটাজাল উৎপাটন করিতে লাগিলেন। গুরু-ভ্রাতাগণ তাঁহার এই কাণ্ড দেখিয়া জোর করিয়া সেদিন তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেন। অনাহারে, অনিদ্রায় ও নিরন্তর ক্রন্দনে রামদাসের দিনগুলি অতিবাহিত হইতে থাকে।

ক্রমান্বয়ে সাতদিন এইরূপ শোক অবস্থায় কাটিল। ইহার পর

বিদেহী দেবদাসজী মহারাজ একদিন জ্যোতির্ময় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইলেন শোকার্ত শিষ্যের সম্মুখে।

স্নেহভরা কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "বৎস, কেন তুমি এমন করছো? এবার তুমি শান্ত হও। আমি আশীর্বাদ করি, তোমার প্রকৃত কল্যাণ হোক্। জেনে রেখো—আমার মৃত্যু হয় নি, শুধু আমার নর-জীবনের লীলাটি সমাপ্ত হয়েছে মাত্র। কিন্তু তাতে তোমার আমার মধ্যে ব্যবধান তো কিছু গড়ে ওঠে নি। তাছাড়া, প্রয়োজন মতো আমি তোমায় মাঝে মাঝে দর্শন দেবো।"

দেবদাসজীর কৃপালীলার কাহিনী বলিতে গিয়া কাঠিয়াবাবা মহারাজ উত্তরকালে প্রায়ই বলিতেন, গুরুজী তাঁহার এ কথা রক্ষা করিয়াছিলেন। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষণে তিনি তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যকে দর্শন দিয়া অনুগৃহীত করিতেন।

গুরুর দেহাবসানের পর হইতে কাঠিয়াবাবা সাধনার আরও গভীরে প্রবেশ করেন। গ্রীষ্মকালে পঞ্চধুনি জ্বালাইয়া উহার মধ্যে তিনি কঠোর তপস্যায় রত থাকেন। আবার প্রচণ্ড শীতের মধ্যে অবস্থান করেন বরফ-গলা শীতল জলে। এক একদিন এই কৃচ্ছ্রব্রতে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইত। অন্যান্য সাধুরা সকালবেলায় তাঁহাকে জল হইতে তুলিয়া আনিতেন। নিস্পন্দ দেহে বার বার আগুনের তাপ লাগানোর পর কাঠিয়াবাবাকে চক্ষু উন্মীলন করিতে দেখা যাইত।

একবার কাঠিয়াবাবা এক গ্রামে পঞ্চধুনি জ্বালাইয়া ধ্যান করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে অপর একটি সন্ন্যাসীও রহিয়াছেন। রামদাসজীর সাধন-সাফল্য ও খ্যাতি প্রতিপত্তি এই সন্ন্যাসীর ঈর্ষা জাগাইয়া তুলে। ধুনিমণ্ডলের মধ্যে ধ্যানস্থ রামদাসজীর প্রাণনাশের জন্য সেদিন সে এক জঘন্য কুকর্ম করিয়া বসে।

ধ্যানস্থ কাঠিয়াবাবাজীর তখন কোনো হুঁশ নাই, এই সুযোগে সন্ন্যাসীটি প্রজ্বলিত ধুনিগুলির চারিদিকে সহস্র সহস্র ঘুঁটে সজ্জিত

করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করে। বাহ্যজ্ঞান-রহিত সাধকের দেহের চতুর্দিকে অগ্নিশিখা পরিব্যাপ্ত হয়, আর দুর্বৃত্ত সন্ন্যাসীটি ইতিমধ্যে সে স্থান হইতে সরিয়া পড়ে।

দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিলে গ্রামের লোকজন সেদিকে ছুটিয়া আসে। সকলেই দৃঢ় ধারণা, তপোনিরত সাধুবাবার দেহ নিশ্চয়ই ভস্মীভূত হইয়াছে। সমবেত চেষ্টায় আগুন নেভানো হইলে দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য—কাঠিয়াবাবাজী যোগযুক্ত হইয়া, প্রশান্ত বদনে, তাঁহার আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন! অগ্নি তাঁহার কোনো অনিষ্টই করে নাই।

সঙ্গী সাধুটির নৃশংস কার্য দেখিয়া গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হয়। পলায়িত সাধুটিকে ধরিয়া আনিতে চাহিলে কাঠিয়াবাবা তাহাদের নিরস্ত করিয়া কহেন, "ভাইসব, তোমাদের কিছু করার দরকার নেই, দুষ্ট নিজের ওপর নিজেই দণ্ড টেনে নিয়ে এসেছে।"

দুই দিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল, সেই সাধুটি অপর একটি অপরাধের অভিযোগে ধৃত হইয়াছে। অতঃপর বিচারে তাহার ছয় মাস কারাদণ্ড হয়।

প্রজ্বলিত হুতাশনের মধ্যে থাকিয়াও সেদিন রামদাস বাবাজীর শরীর দগ্ধ হয় নাই—কেহ কেহ তাঁহাকে এই রহস্যের মর্ম জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি জানান—পঞ্চধুনি তাপিত করিয়া বসিবার পূর্বে সাধককে অগ্নি হইতে আত্মরক্ষা করার মন্ত্রটিকে চৈতন্যময় করিয়া নিতে হয়। স্মিতহাস্যে আরও কহেন, "যাদের দেহ অগ্নিতে ক্লিষ্ট বা দগ্ধ হয় তারা যোগী নয়, এ কথাটা স্মরণে রাখবে।"

গুরুকৃপায় কাঠিয়াবাবা মহারাজ এরূপ বহুতর যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধন ও পরিব্রাজনের কালে এগুলি নানা সময়ে প্রয়োজনমতো প্রকট হইয়া উঠিত। একবার তিনি আগ্রায় যমুনার ধার দিয়া চলিয়াছেন। তখন সিপাহী বিদ্রোহের কাল, চারিদিকে প্রচণ্ড যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তারক্তি চলিতেছে।

যমুনার উপরে গোরা পল্টনে ভর্তি একটি ক্ষুদ্র জাহাজ নোঙ্গর-

করা। গোরা সৈন্যেরা তীরস্থিত সাধু কাঠিয়াবাবাকে দেখিয়া এই সময়ে বড় উত্তেজিত হইয়া উঠে, একজন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াও বসে। গুলিটি কিন্তু কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল, তাঁহার দেহ স্পর্শ করিল না। অকুতোভয় কাঠিয়াবাবাজীর কিন্তু একটুও ভ্রূক্ষেপ নাই। যমুনার তীর ধরিয়া আপনমনে তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

গোরা সৈনিকটি নিরস্ত্র হইবার পাত্র নয়, বন্দুক উঠাইয়া সে জাহাজ হইতে আবার গুলি চালাইতে উদ্যত হইল। কাঠিয়াবাবাজী বিরক্ত হইয়া অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "ভালো বিপদ হয়েছে। এ ব্যাটা দেখছি কিছুতেই আজ ছাড়বে না!"

অন্তর্লীন হইয়া কিছুক্ষণের জন্য তিনি চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিলেন। ক্ষণপরেই সৈনিকের হস্তধৃত বন্দুকটি কোন্ এক ইন্দ্রজাল বলে স্খলিত হইয়া যমুনায় ডুবিয়া গেল।

এতক্ষণে জাহাজের গোরা সৈনিকদের কিছুটা হুঁশ হইয়াছে। তাহারা বুঝিয়াছে—এ সাধু নিশ্চয়ই অলৌকিক শক্তি ধারণ করে, ইহার সহিত তাই সৌহার্দ্য স্থাপন করাই ভালো। গোরার দল তখন জাহাজ হইতে নামিয়া আসে, টুপী খুলিয়া কাঠিয়াবাবাজীকে বার বার অভিবাদন জানাইতে থাকে।

সদ্‌গুরু দেবদাসজী মহারাজ নরলীলা সংবরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রোপিত দীক্ষা-বীজটি এবার কাঠিয়াবাবার মধ্যে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। গুরুকৃপা ও আপন তপস্যার ধারাপথটি বাহিয়া তাঁহার জীবনে সাধিত হয় এক পরম রূপান্তর, একনিষ্ঠ সাধক রামদাস এবার বহু আকাঙ্ক্ষিত ঈশ্বর দর্শনে সিদ্ধকাম হন। সাধনার এ পরিণতিটি ঘটে ভরতপুরের পবিত্র তীর্থ সয়লানিকা-কুণ্ডায়। কাঠিয়াবাবাজী নিজেই ইহা বর্ণনা দিয়াছেন—

রামদাসকো রাম মিলা
সয়লানিকা-কুণ্ডা।

সন্তন তো সাচ্চা মানে
ঝুঠ্ মানে গুণ্ডা।

—অর্থাৎ সাধক রামদাসের ভাগ্যে উপাস্য শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন হয় সয়লানির কুণ্ডে, সাধু-সজ্জন ব্যক্তিরা এ কথা গ্রহণ করবে সত্য বলে, আর অসত্য বলে মনে করবে শুধু দুর্বৃত্তেরা।

ভরতপুরে ঈশ্বর দর্শনের পর হইতেই শুরু হয় সিদ্ধকাম সাধক কাঠিয়াবাবার আচার্য-জীবন। এ সময় হইতেই ক্রমে ক্রমে দুই একটি করিয়া শিষ্যকে তিনি আশ্রয় দিতে থাকেন। তাঁহার প্রথম চেলার নাম গরীবদাস। ভরতপুরের এক নিষ্ঠাবান্ ভগবদ্-ভক্ত ব্রাহ্মণ কাঠিয়াবাবার মাহাত্ম্যে মোহিত হইয়া বালক পুত্রটিকে আনিয়া তাঁহার চরণতলে সমর্পণ করেন। ত্যাগে, প্রেমে ও তপোনিষ্ঠায় এই বালক পরিণত হন অসামান্য সাধকরূপে।

ভগবানদাস, ঠাকুরদাস এবং নরোত্তমদাস নামেও কয়েকটি বিশিষ্ট চেলা কাঠিয়াবাবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। উত্তরকালে আরও বহুসংখ্যক সাধক অনুগ্রহ লাভ করেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই বাস বাংলাদেশে।

কঠোর তপস্যা ও পর্যটনের পালা সাঙ্গ হইবার পর লোকগুরু-রূপে কাঠিয়াবাবার এই আত্মপ্রকাশ। এবার তিনি ভাবিতে থাকেন, কোথায় স্থাপন করিবেন তাঁহার আশ্রম।

কঠোরতপা সাধুদের পক্ষে উপযোগী উত্তরাখণ্ডের নির্জন পর্বতগুহা। কিন্তু মনে মনে বিচার করিলেন—সেখানেও তো উদরের চিন্তা কম করিতে হয় না। বর্ষাকালে কোন্ স্থানে কন্দমূলের অঙ্কুর দেখা যায় তাহা আগে হইতে খুঁজিয়া দেখিয়া রাখিতে হয়। এটাও তো আহারের জন্য এক বিশেষ প্রয়াস। সমতল ভূমেই বা কোথায় থাকিবেন? ব্রজভূমির আকর্ষণই এ সময়ে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রেমের ঠাকুর কাহ্নাইয়ালালের লীলাভূমি এটি। তাছাড়া, এই পবিত্র ভূমিতে সাধুদের সেবার জন্য ব্রজবাসী ও ব্রজমাঈদের স্বাভাবিক আগ্রহ

রহিয়াছে। তাই বৃন্দাবনে আশ্রয় নিবার জন্যই রামদাসজী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

গঙ্গাজীর কুঞ্জের নিকটস্থ ঘাটে, বটবৃক্ষতলে, কাঠিয়াবাবা তাঁহার আসনটি প্রথমে পাতিয়া বসেন। সঙ্গে সেবকশিষ্য গরীবদাসজী। যমুনার ঘাটে স্ত্রী-পুরুষ বহু লোকই স্নান করিতে আসে। তাহাদের অনেকেই এই সুদর্শন, তেজোদৃপ্ত সাধুকে নম্র নতি জানাইয়া যায়, ধর্মকথা আলোচনা করিয়াও অনেকে তৃপ্ত হয়।

একদিন গভীর রজনীতে ঐ বৃক্ষতলে এক বিচিত্র কাণ্ড ঘটিল। প্রথম রাত্রির ভজন শেষ করিয়া কাঠিয়াবাবা তাঁহার আসনের উপর শায়িত রহিয়াছেন। চুপি চুপি অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ বাহিয়া এক তরুণী সেখানে উপস্থিত হয়, হঠাৎ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে।

বাবাজী মহারাজ চমকিত হইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসেন। চেলা গরীবদাসজী নিকটেই ঘুমাইতেছিল, হাঁকডাক করিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেন। গরীবদাস আলো জ্বালিলে দেখা গেল, কাঠিয়াবাবার আসনের উপর এক বিধবা যুবতী বসিয়া আছে।

তিরস্কার ও প্রশ্নবাণ বর্ষণের পর রমণী জানায়, সে এক আশ্রয়-হীনা বিধবা। আজ সে বড় কামার্তা হইয়াছে, দুর্দমনীয় আবেগ এড়াইতে না পারায় নিশীথে তাহার এ অভিসার।

বাবাজী মহারাজ তো ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্মা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "তোমার কাম যদি এতই জেগে থাকে, তবে গৃহস্থ পুরুষদের কাছে যাও। ত্যাগী সাধুসন্তদের কাছে এমন ক'রে আসা কেন?"

যুবতী বিনাইয়া বিনাইয়া বলে তাহার মনের কথা, "মহারাজ, আপনার অপূর্ব রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। দর্শনের পর থেকেই আমার কামবাসনা কেবলি বেড়ে চলেছে। আপনি কৃপা ক'রে আমার অভিলাষ পূরণ করুন।"

এতক্ষণ অবধি তবুও কাঠিয়াবাবা কিছুটা ধৈর্য ধরিয়াছিলেন, রমণীর এ কথা শোনামাত্র ঘটিল এক বিস্ফোরণ।

ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন, চেলা গরীবদাসকে হাঁক দিয়া কহিলেন, "ওরে, তুই কিছুটা দূরে সরে যা তো, এই পাপীয়সীকে আমি সাধুর সিদ্ধাই কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি। ও সাধুর সাধুত্ব হরণ ক'রে নিতে চায়, কিন্তু তাঁর সামর্থ্য যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে সেইটেই ওকে আমি আজ দেখিয়ে ছাড়বো।"

ভীতা সন্ত্রস্তা রমণী করুণ কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। জোড়হস্তে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নিবেদন করিল, এ দুষ্কার্য করিতে সে স্বেচ্ছায় আসে নাই। একদল কুচক্রী ব্রজবাসী ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছে। মহারাজ কামজিৎ কিনা, তাহারা পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল।

যুবতীটি বার বার কাঠিয়াবাবার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করিতে থাকে।

বাবাজী মহারাজ সব কথা শুনিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "আচ্ছা, এখনি এখান থেকে তুমি চলে যাও। আর কখনো কোনো সাধুর কাছে এরূপভাবে যেও না। জেনো, সব সাধুই এক রকমের নয়— তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কিন্তু যোগীরাজও থাকেন।"

কম্পিত হৃদয়ে পলায়ন করিয়া রমণী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ব্রজভূমির ছোট বড় সব লোকের সহিতই কাঠিয়াবাবার সখ্যভাব। তাঁহার গাঁজা-চরসের আড্ডায় অনেকেই আসিয়া জড়ো হয়, বাবাজী মহারাজের সহিত তাহাদের নানা কথা ও ঠাট্টা তামাশা চলে।

গোঁসাইয়া নামক এক কুখ্যাত ব্যক্তিও রোজ সেখানে আসে। বৃন্দাবনের সে এক দুর্ধর্ষ ও পুরাতন দুর্বৃত্ত। চৌদ্দ বৎসর কাল দ্বীপান্তরে বাস করিয়াও তাহার অপরাধপ্রবণতা কিছুমাত্র কমে নাই। বৃন্দাবনবাসীরা তাহার দৌরাত্ম্যে অস্থির।

একদিন জোর গাঁজা-চরস উড়ানো হইতেছে। বাবাজীর এই ধূমপান-বৈঠকের বিশিষ্ট সদস্য, পালোয়ান ছন্নু সিং হঠাৎ বলিয়া উঠে,

"বাবাজী মহারাজ, আপনার মতন মহাত্মা ও সিদ্ধপুরুষ এখানে থাকতে ডাকাত গোঁসাইয়ার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হল না! ওর অত্যাচার থেকে ব্রজবাসীদের আপনি কৃপা ক'রে রক্ষা করুন।"

কথা কয়টি বড় মিনতিপূর্ণ। বাবাজীর হৃদয়তন্ত্রীতে সেদিন উহা আঘাত করিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল সমর্থ মহাযোগীর করুণাঘন রূপ।

গোঁসাইয়া কিছুক্ষণ পরেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কাঠিয়াবাবা সস্নেহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোঁসাইয়া, তুই কি সাধু হয়ে প্রকৃত আনন্দের স্বাদ পেতে চাস? চুরি-ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে তুই আমার চেলা হয়ে থাকবি?"

করুণামাখা এ কথা কয়টিতে কোন্ জাদু ছিল তাহা কে বলিবে? গোঁসাইয়ার সর্ব সত্তায় সেদিন উহা আলোড়ন তুলিয়া দিল।

কিছুকাল চুপ করিয়া থাকে গোঁসাইয়া। তারপর আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিতে থাকে, "মহারাজ, আমি জীবনে যত কুকাজ করেছি, কোনো মানুষ তা করতে পারে না। এ সব জেনেশুনেও কি সত্যিই তুমি আমায় কৃপা করবে? তোমার চেলা ক'রে নেবে?"

দুর্ধর্ষ অপরাধীর জীবনে সেদিন উদ্ধারের পরম লগ্নটি আসিয়া গিয়াছে। কৃপাময় মহাপুরুষ স্মিতহাস্যে কহিলেন, "হ্যাঁরে হ্যাঁ। আমি তোকে সত্যিই আমার চেলা করবো। আজই করবো। যা, এখনই বাজার থেকে একগাছা তুলসীর কণ্ঠীমালা নিয়ে আয়।"

গোঁসাইয়ার দীক্ষাদান সমাপ্ত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার অপূর্ব রূপান্তর দর্শনে ব্রজবাসিগণ বিস্মিত হইলেন। তাহার দৌরাত্ম্য ও লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি এবার একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। কাঠিয়াবাবা মহারাজের করুণার দিব্য স্পর্শ এই দুর্বৃত্তকে রূপান্তরিত করিয়াছে এক প্রেমিক সাধুতে।

যমুনাতটের এক নিভৃত অঞ্চলে গোঁসাইয়া তাহার ভজন পূজনে দিন অতিবাহিত করে। সে যে এবার এক নূতন মানুষ! পুরাতন পাপ-জীবনের কথা সবাইকে অবলীলায় শুনাইয়া দিতে তাহার বাধে

না। নিজের চুরি-ডাকাতির নানা কাহিনী স্বরচিত সংগীতে গাঁথিয়া সকলের সঙ্গে সেও বেশ আমোদ উপভোগ করে। দুর্ধর্ষ দস্যুর রূপান্তর ঘটিয়াছে এক সদানন্দময় মহাবৈরাগী পুরুষরূপে! সাধারণ লোকে ঠাট্টা করিয়া তাহাকে ডাকে—চোর-গোঁসাইয়া।

কুখ্যাত পাষণ্ডীর এই উদ্ধারসাধন বৃন্দাবনধামে কাঠিয়াবাবার এক বিস্ময়কর কীর্তিরূপে প্রচারিত হয়।

•

যমুনার ঘাটে বাবাজীর সভায় বেশ জনসমাগম হইত। ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে গাঁজা-চরস উড়াইবার লোকও কম জুটিত না। বাবাজী মহারাজের নিকট দর্শনার্থীদের ভিড় ও পুরি কচৌরির আমদানি দেখিয়া চোরের দল সন্দেহ করিত, তাঁহার নিকট বুঝি সঞ্চিত টাকা-কড়িও বেশ কিছু রহিয়াছে। এ সন্ধানে মাঝে মাঝে তাহারা রাত্রিকালে হানা দিতেও ছাড়িত না। বিস্ময়ের কথা, এ দুর্বৃত্তেরাই আবার দিনের বেলায় কাঠিয়াবাবার কাছে বসিয়া তাঁহারই গাঁজা-চরস ধ্বংস করিত।

একবার এইরূপ একদল তস্করের সঙ্গে বাবাজীর প্রবল বিতণ্ডা চলিতেছে। সংখ্যায় ইঁহারা তিনজন। উত্তেজিত হইয়া দুর্বৃত্তেরা বলিয়া উঠে, "বাবাজী, তুমি আমাদের এমন ক'রে ধম্‌কে কথা বল, তোমার সাহস তো কম নয়! এর প্রতিফল তুমি একদিন রাত্রিবেলায় ভালো ক'রেই পাবে!"

কাঠিয়াবাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "বটে! চোর ছ্যাঁচোড়ের দল আস্কারা পেয়ে একেবারে মাথায় উঠে বসেছে। দেখছি, সাধুদের চোখ রাঙাতেও তোদের বাধছে না।"

তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "দেখবি আজই তোরা পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হবি।"

দুর্বৃত্তরা উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিয়া গেল, "দ্যাখো বাবাজী, থানায় পুরতে পারে এমন শক্তি কারুর নেই।"

কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার! ঠিক সেইদিনই পূর্বেকার এক দুষ্কর্মের

অভিযোগে এই তিন ব্যক্তি পুলিস কর্তৃক ধৃত হয়। অভিযোগ বড় গুরুতর, মুক্তি পাওয়া কঠিন। কোনোমতে জামিনে ছাড়া পাইয়া ইহাদের দুইজন কাঠিয়াবাবার কাছে ছুটিয়া আসে, চরণ ধরিয়া বার বার তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে।

বাবাজী মহারাজের ক্রোধ তিরোহিত হইতে দেরি হইল না। শান্তস্বরে তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, বেশ কথা। কিন্তু তোরা প্রতিজ্ঞা কর্—আর কখনও চুরি-ডাকাতি করবিনে, আর সাধুদের মর্যাদা রেখে চলবি।"

তস্করেরা তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইল। মোকদ্দমার দিন দেখা গেল, কাঠিয়াবাবা মহারাজের আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয় মুক্তি পাইয়াছে, আর তৃতীয় অপরাধীটির উপর হইয়াছে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ।

কিছুদিন পরের কথা। বাবাজী সেদিন মথুরার রাস্তায় চলিয়াছেন। দেখিলেন, তাঁহার পূর্ব-পরিচিত তৃতীয় চোরটির কোমরে শিকল বাঁধা, সরকারী রাস্তা মেরামতের কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কাঠিয়াবাবাকে দেখিয়াই সে হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সাশ্রু নয়নে বার বার ক্ষমা চাহিয়া বলিতে লাগিল, "বাবাজী মহারাজ, আমরা ব্রজবাসী—সবাই তোমার বালক, নিতান্ত অবোধ। রুষ্ট হয়ে আমাদের এ কঠিন দণ্ড দেওয়া কি তোমার উচিত হয়েছে?"

লোকটির ক্রন্দনে কাঠিয়াবাবার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা। সাধুসন্তদের আর কখনো তুই যেন অসম্মান করিসনে। যা, আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে তুই জেল থেকে মুক্ত হবি?"

চমকিত হইয়া বন্দী বলিয়া উঠিল, "কিন্তু মহারাজ, এ আপনি কি বলছেন? এখন আর তা কি ক'রে সম্ভব হতে পারে? মামলায় আপীল করেছিলাম, তাও যে অগ্রাহ্য হয়েছে। মুক্তি পাবার বিন্দুমাত্র আশা আমার নেই।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাবাজী মহারাজ তিরস্কার করিয়া উঠিলেন, "ক্যা? সন্তনকা বচনমে অব্ ভী তেরা বিশ্বাস হোতে নহীঁ। মেরা বচন

কভী ঝুঠে নহীঁ হোগে।" অর্থাৎ, সে কি রে? সাধুর বাক্যে এখনও দেখছি তোর বিশ্বাস হচ্ছে না? ওরে, আমার বাক্য যে কখনো মিথ্যা হতে পারে না?

কয়েদীটি কিন্তু তৃতীয় দিনে ঠিকই মুক্ত হইয়া আসে। সরকার হইতে কি এক বিশেষ কারণে আদেশ বাহির হয়, প্রত্যেক কারাগার হইতে তিনজন করিয়া কয়েদীকে অবিলম্বে খালাস দেওয়া হইবে। দেখা যায়, বাবাজী মহারাজের মার্জনাপ্রাপ্ত লোকটির নাম ঐ মুক্তি তালিকায় রহিয়াছে।

কাঠিয়াবাবা মহারাজের গাঁজা ও চরস পান ছিল এক নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার। ধুনির আগুনের মতো তাঁহার বৈঠকে কল্‌কের আগুন কখনো নির্বাপিত হইত না। কিন্তু বাবাজী মহারাজের একটি বৈশিষ্ট্য সকলেরই চোখে ধরা পড়িত। নিরন্তর গাঁজা-চরসের ধূমপান করার পরও তাঁহার নয়নদ্বয় একটুও আরক্তিম হইত না। প্রশান্তিময় আনন হইতে সর্বদা বিকীর্ণ হইত দিব্য আনন্দের ছটা।

সেবার বৃন্দাবনে কুম্ভমেলা হইতেছে। এ উপলক্ষ্যে দিগ্‌বিদিক্ হইতে সহস্র সহস্র বৈষ্ণব ব্রজধামে উপনীত হন এবং পরিক্রমা করিতে থাকেন। মেলায় উপস্থিত সকল বৈষ্ণব সাধুদের সমর্থনে এ সময়ে শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবাজী বৃন্দাবনের মোহান্ত পদে বৃত হন।

উৎসব ও আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে এ মেলাক্ষেত্রে একজন ব্রজবাসী কৌতুককর প্রতিযোগিতায় সকলকে আহ্বান করে। একটি বৃহদাকার কল্‌কে শিকলে বাঁধিয়া বটবৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, আর উহার ভিতরে পুরিয়া দেওয়া হয় সওয়া সের চরস। উপরে ও নিচে সাজানো হয় সওয়া সের করিয়া দুইটি বালাখানা তামাকুর স্তর। এই বৃহৎ কল্‌কেতে টান দিয়া ছিলিম উড়ানো সত্যই অতি কঠিন ব্যাপার। এটি হইতে ধোঁয়া বাহির করিবার মতো শক্তি কোন্ সাধুর আছে, প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তরা তাহাই দেখিতে চান।

ব্রজভূমির বহু পরাক্রান্ত সাধুই সেদিন পরাজয় স্বীকার করিতে

বাধ্য হন। এই বিচিত্র ছিলিম হইতে ধোঁয়া বাহির করা কাহারও সামর্থ্যে কুলায় নাই।

বৃন্দাবনের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাবাজী মহারাজকে বিশেষভাবে ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকেই এই বল পরীক্ষায় জয়ী হইতে হইবে নতুবা তাহাদের মাথা যে হেঁট হইয়া যায়। কাঠিয়াবাবাও পরম উৎসাহে এ আনন্দরঙ্গে অবতীর্ণ হইলেন।

তিনি সজোরে এই কল্‌কেতে দম দিবামাত্রই উহার শীর্ষদেশে দপ্‌ দপ্‌ করিয়া অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে তখন তাঁহার জয় জয়কার।

আধ্যাত্মিক ও শারীরিক শক্তি, উভয় দিক দিয়াই চিরকাল বাবাজী মহারাজ ছিলেন বৈষ্ণব সাধুসমাজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

কাঠিয়াবাবাজীর চরস পানের আরও একটা কৌতুককর ঘটনা রহিয়াছে। সেবার ভরতপুর হইতে তিনি শিষ্য গরীবদাসজীসহ বৃন্দাবনে ফিরিতেছেন। উভয়ের সঙ্গে রহিয়াছে প্রায় দুই সের চরস। আইনমতে এই পরিমাণ চরস রাখা নিষিদ্ধ—পথমধ্যে গুরু ও শিষ্য পুলিস কর্তৃক ধৃত হইলেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উভয়কে উপস্থিত করা হইল।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "সাধু, এত বেশী পরিমাণ চরস দিয়ে তুমি কি করবে?"

বাবাজী সহাস্যে উত্তর দিলেন, "সাহেব, এ আবার বেশী কি? এতো আমার দুই-এক দিনের খোরাক।"

সাহেব এরূপ অবিশ্বাস্য কথা মানিয়া নিতে রাজী নহেন। ইহা চাক্ষুস না দেখিয়া তিনি ছাড়িবেন না। বাবাজী এবার এক ছিলিমে প্রায় এক পোয়া চরস সাজিয়া কল্‌কেতে জোর টান দিলেন। দপ্‌ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সাহেবের বিস্ময় ততক্ষণে চরমে উঠিয়াছে। শুধু একটি ছিলিমে এ পরিমাণ চরস কোনো মানুষ যে সত্যই পান করিতে পারে ইহা

তাঁহার ধারণার অতীত। মনে মনে বুঝিলেন, ইহা এই সাধুর দৈবী শক্তির কাজ। খুশী মনে কহিলেন, "আচ্ছা সাধু, তুমি চলে যাও। কেউ যাতে পথে এই চরসের জন্য তোমাদের না আটকায় এজন্য আমি একটা আদেশপত্র দিচ্ছি।"

বাবাজী মহারাজ আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলিয়া উঠিলেন, "সাহেব, এ হুকুমনামার আমার কোনো দরকার নেই। কেউ যদি রাস্তায় ধরে, ভয় কি? আবার এমনি ক'রেই ছিলিম উড়িয়ে দেব!"

সাহেব হোহো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কাঠিয়াবাবাজীর গাঁজা-চরস পানের নানা কাহিনী সাধু ও ভক্তমহলে খুব শুনা যাইত। আবার সকলেই জানিতেন, বিপুল পরিমাণ তীব্র নেশার বস্তু পান করিয়াও তাঁহার দেহে বা মনে কখনো বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিত না।

দীর্ঘকালের এ প্রচণ্ড নেশার অভ্যাসটি বাবাজী মহারাজ কিন্তু একদিনে এক মুহূর্তেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে তাঁহার এক সামান্য অসুস্থতায় ভক্তেরা এক চিকিৎসক ডাকিয়া আনে। ঐ চিকিৎসকের একটিমাত্র কথায় বাবাজী ভাঙ চরস পান ছাড়িয়া দেন।

একবার বাবাজীর প্রধান শিষ্য সন্তদাস মহারাজ প্রশ্ন করেন, "বাবা, দুই-চারবার গাঁজা-চরসের ছিলিম উড়িয়ে অন্যান্য সাধুরা নেশায় একেবারে মত্ত হয়ে ওঠে, অথচ আপনি তো অনবরত ছিলিম টেনেও এমন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারেন। এ কি ক'রে সম্ভব হয়?"

কাঠিয়াবাবা উত্তরে বলিলেন, "বাবা, জিস্‌পর ভগওয়ানকা অমল্ চড় গিয়া উস্‌পর আওর কোঈ অমল্ কভী চড়তা নহীঁ।" অর্থাৎ—বাবা, যার সর্বসত্তায় ভগবানের নেশা চড়ে গিয়েছে, সংসারের আর কোনো নেশাই যে তার উপর ভর করতে পারে না।

উজ্জয়িনীতে সেবার কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ সময়ে

মেলাক্ষেত্রে এক শক্তিধর শৈব সন্ন্যাসীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি ও যোগবিভূতিতে আকৃষ্ট হইয়া উজ্জয়িনীর রাজা তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া শৈব সন্ন্যাসীরা মেলাক্ষেত্রের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। শুধু তাহাই নয়, ইহাদের একদল লোক উদ্ধতভাবে বৈষ্ণব সাধুদের বিতাড়িত করিতে থাকে।

চিরাচরিত প্রথামতো বৃন্দাবনের মোহান্তকে কুম্ভমেলায় উপস্থিত থাকিতে হয়। কয়েকজন বৈষ্ণব সাধুসহ কাঠিয়াবাবাজী তাই এ সময়ে উজ্জয়িনীর পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথিমধ্যে কয়েকটি বৈষ্ণব সাধু জমায়েতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সাধুরা ক্ষুণ্ণ মনে শৈব সন্ন্যাসীদের অত্যাচারের কথা তাঁহাকে নিবেদন করে।

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বাবাজী মহারাজ ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন—বৃথাই তাহারা ত্যাগী সাধু হুইয়াছেন। মৃত্যুভয় যাহাদের এত বেশী, গৃহকোণই তাহাদের উপযুক্ত স্থান। কুম্ভমেলার ক্ষেত্রে নিজস্ব অধিকারের জন্য তাহাদের লড়াই করা উচিত ছিল। মরিলে কিই-বা ক্ষতি হইত—বিষ্ণু নাম করিয়া তাহারা বৈকুণ্ঠে যাইতে পারিত। কাপুরুষের দল! নিজেদের মাথা তো তাহারা হেঁট করিয়াছেই, ইষ্টদেব শ্রীবিষ্ণুর মর্যাদাহানিও করিয়াছে।

বাবাজী মহারাজের এসব তীক্ষ্ণ বাক্য বৈষ্ণব সাধুদের অন্তরে গিয়া বিঁধিল। মেলাক্ষেত্রে পুনরায় স্থান অধিকারের জন্য তাঁহারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। একটি হস্তী সংগ্রহ করিয়া সোৎসাহে তাঁহারা মোহান্ত রামদাস বাবাজীকে ইহাতে আরোহণ করাইলেন। পিছনে চলিতে লাগিল কয়েক সহস্র বৈষ্ণব সাধুর বিরাট দল।

কাঠিয়াবাবাজীর নেতৃত্বে এই সাধু 'ফৌজ' কুম্ভমেলায় পৌঁছিলে এক বিস্ময়কর কাণ্ড সংঘটিত হয়। হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন বাবাজী মহারাজের দিব্য প্রশান্ত মূর্তিটি সেদিন উদ্ধত সন্ন্যাসীদের এক মুহূর্তে নিষ্ক্রিয় করিয়া দেয়। দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হওয়া দূরের কথা, ভীত

সন্ত্রস্ত হইয়া মেলাক্ষেত্রে নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিতে থাকে।

কাঠিয়াবাবার ব্যক্তিত্ব এবং অধ্যাত্মশক্তি সেদিন লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী ও দর্শনার্থীর মধ্যে এক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বাবাজী মহারাজ একবার তাঁহার কয়েকটি শিষ্যসহ কোনো এক সাধু জমায়েতের সহিত পথ চলিতেছেন।

প্রতিদিন শেষ রাত্রের কৃত্যাদি শেষে, ইষ্টপূজা সমাপনের পর, যাত্রা শুরু হয়। তারপর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলে পরিব্রাজন। মধ্যাহ্নে সাধুরা কোনো ছায়াচ্ছন্ন জলাশয়ের ধারে পৌঁছিয়া আসন পাতিয়া বসেন। গ্রামবাসীরা সাধুসন্তদের দর্শন করে ও দণ্ডবৎ জানায়, আহার্যের যোগাড় করিয়া দেয়। এ সময়ে গৃহস্থদের প্রদত্ত ভেট নিয়া মাঝে মাঝে দুই-একটি ছোটখাট ঝগড়া-বিবাদও সাধুদের মধ্যে বাধিয়া যায়।

জমায়েতের সঙ্গে এক পরমহংসজীও পথ চলিতেছেন। একদিন রামদাস কাঠিয়াবাবাকে ডাকিয়া পরমহংসজীও শ্লেষাত্মক বাক্য বলিতে শুরু করিলেন—"বৈষ্ণবদের সম্প্রদায়ের প্রকৃত বৈরাগ্য কিছুই নেই, পেটের চিন্তায় সবাই সব সময়ে অস্থির, আর এ নিয়ে কি বিশ্রী ঝগড়া-ঝাঁটি তারা করে!"

বাবাজী স্থির করিলেন, আত্মাভিমানী পরমহংসজীকে কিছু শিক্ষা দিবেন। দীনভাবে জোড়হস্তে তাঁহাকে কহিলেন, "মহারাজ, প্রকৃত বৈরাগ্য কি বস্তু, আপনি আমায় তা একটু বুঝিয়ে দিন। আজ থেকে আপনার নির্দেশ মতোই আমি চলবো, আপনার আসনের পাশেই পাতবো আমার আসন।"

পরমহংসজী অতঃপর গম্ভীরভাবে বাবাজী মহারাজকে বৈরাগ্য ও ত্যাগ-তিতিক্ষা সম্বন্ধে এক সুন্দর বক্তৃতা শুনাইয়া দিলেন।

চতুর কাঠিয়াবাবাজী কিন্তু ইতিমধ্যে এক চমৎকার ফাঁদ পাতিয়া বসিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধুদের ডাকিয়া তিনি চুপি চুপি বলিয়া দিলেন,

"তোমরা জেনে রেখো, আজ থেকে জমায়েতের ভোজনের ব্যাপারে ঋদ্ধি সিদ্ধির কোনো ক্রিয়া আর হবে না। তোমরা সুবিধামতো গ্রামের ভেতর যাও, গৃহস্থদের কাছ থেকে ডাল, আটা, ঘি সংগ্রহ ক'রে খাওয়া-দাওয়া সেরে নাও।"

ঘটিলও ঠিক তাহাই। দিনের পর দিন চলিয়া যায়, গ্রামবাসীদের যেন কি হইয়াছে, তাহারা আর জমায়েতের জন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভোজনদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনে না। বৈষ্ণব সাধুদের সকলেই গ্রামে গিয়া ভোজন সমাধা করিয়া আসে, কিন্তু কাঠিয়াবাবা মহারাজ ও পরমহংসজী আসন ছাড়িয়া বাহির হন না। তাঁহাদের সম্মুখে পূর্বের মতো ভেট ইত্যাদিও আর উপস্থিত হয় না।

এদিকে পরমহংসজী দিনের পর দিন শুধুমাত্র জল পান করিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কাঠিয়াবাবার কিন্তু এদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নাই। ছিলিমের পর ছিলিম গাঁজা চরস উড়াইয়া তিনি পরম আনন্দে দিন কাটাইতেছেন।

পরমহংসজী কয়েকদিনের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়িলেন। ক্ষুধায় মৃতকল্প হইয়া একদিন তিনি বাবাজী মহারাজকে কহিলেন, "বাবা, আজ যে আমার প্রাণ যায়! তুমি গ্রাম থেকে শিগ্‌গীর কিছু খাবার সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসো, আমায় বাঁচাও।"

কাঠিয়াবাবা জোড়হস্তে সবিনয়ে কহিলেন, "মহারাজ, সেদিন বৈরাগ্যতত্ত্ব বুঝাতে গিয়ে আপনি কিন্তু আমায় বলেছেন, কারুর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করা যাবে না। তবে আজ আবার আপনার এই বিরুদ্ধ মত কেন?"

পরমহংসজী ইতিমধ্যে একেবারে নরম হইয়া আসিয়াছেন। কাঠিয়াবাবাজীর নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া তিনি মার্জনা ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন।

বাবাজী মহারাজ এবার প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনার আর কোনো ভয় নেই। আজ এক্ষুনি গ্রামের গৃহস্থেরা বহুতর ভেট নিয়ে জমায়েতের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। ঋদ্ধি সিদ্ধির ক্রিয়া

আবার পূর্ববৎ হতে থাকবে। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, বহিরঙ্গ ভাব দেখে বৈষ্ণব সাধকদের বিচার করা কখনো ঠিক নয়। এঁরা বড় চতুর-- আর এঁদের লীলাও বড় গোপন, বড় চাতুর্যপূর্ণ। কোন্ বৈষ্ণব মূর্তিতে কোন্ সমর্থ পুরুষ অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তা সকলের পক্ষে জানা তো সম্ভবপর নয়!"

অল্পকাল পরেই দেখা গেল, একদল, গ্রামবাসী বহু সংখ্যক সাধুর উপযোগী আহার্য নিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সকলকে দণ্ডবৎ করিতেছে।

এইরূপে নানা লীলা ও আনন্দরঙ্গের মধ্য দিয়া কাঠিয়াবাবার যোগৈশ্বর্য বহুস্থানে প্রকটিত হইত।

বৃন্দাবনে কেমারবন অঞ্চলে একটি পুরাতন বাগিচা ছিল। ইহার মালিকেরা আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাঠিয়াবাবাজীকে এটি ব্যবহার করিতে দিতে ইচ্ছুক হন।

বাবাজী তখন যমুনাতীরে গঙ্গাজীর কুঞ্জে বাস করিতেছেন। প্রস্তাবটি শুনিয়া কহিলেন, "আমি যমুনাতীর ছেড়ে ওখানে এসে উঠতে পারি, যদি স্থানটি আমায় একেবারে দান ক'রে দাও।"

মালিকেরা রাজী হইলেন। বাগিচায় এক খড়ের ছাউনি করিয়া কাঠিয়াবাবা তাঁহার আশ্রম স্থাপন করিলেন, এই ক্ষুদ্র কুটিরের মধ্যেই এক ধুনি প্রজ্বলিত করা হইল। ইহাই শ্রীবৃন্দাবনের বহুখ্যাত স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবার নিজস্ব আশ্রমের সূচনা।

আশ্রমিকদের সংখ্যা তখন নিতান্ত সামান্য—শুধু গরীবদাস ও প্রেমদাস এই দুই চেলা, আর এই সঙ্গে রহিয়াছে গঙ্গা নাম্নী একটি পয়স্বিনী গাভী।

সেবক-শিষ্যদের সহিত বাবাজী মহারাজের যে সম্বন্ধ, এ গাভীটির সহিতও তাঁহার সে সম্পর্ক ও যোগসূত্র বর্তমান। সে-বার প্রয়াগে কুম্ভমেলা হইতেছে, কাঠিয়াবাবাজী ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। সঙ্গে শিষ্যগণসহ আশ্রমের গাভী গঙ্গাও সেখানে সেদিন উপস্থিত।

তখন মাঘ মাস, নদীর বালুসৈকতে শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ। একদিন প্রত্যূষে দেখা গেল, বাবাজী মহারাজ নগ্নকায় হইয়া বসিয়া আছেন, আর তাঁহার কম্বলটি জড়ানো রহিয়াছে গাভীটির অঙ্গে।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের এক শিষ্য এ সময়ে কাঠিয়াবাবাকে দণ্ডবৎ করিতে আসিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এ তীব্র শীতে আপনি শুধু শুধু এমন কষ্টভোগ করছেন কেন? গরুটির গায়েই বা নিজের কম্বল কেন চাপিয়েছেন? ওরা তো অনাবৃত থাকতেই অভ্যস্ত।"

উত্তর হইল, "বেটা দেখছো তো, এবার কি রকম শীত পড়েছে। এ পশু মৌনী, মুখে কিছু বলতে পারে না। তাই তো আমাকে এর প্রতি এত দৃষ্টি রাখতে হয়। তাছাড়া, আমার তো ধুনি রয়েছে, গায়ে বিভূতি মাখানো আছে। তেমন কিছু শীত লাগে না।"

"কিন্তু বাবা, সুদূর বৃন্দাবন থেকে গরুটিকে আপনি অনর্থক এ কুম্ভমেলায় টেনে এনেছেন কেন?"

"সে কি গো, আমি টেনে নিয়ে আসবো কেন? এর জন্য আমাকে পায়ে হেঁটে কষ্ট ক'রে আসতে হয়েছে—একলা এলে আমি তো রেলগাড়িতে চড়েই বেশ আরামে আসতে পারতাম! কিন্তু এই গাভীটিই যে যত গোল বাধালো। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে করুণভাবে বললে—'বাবা, তুমি কুম্ভমেলায় চলে যাবে, আর আমায় সঙ্গে ক'রে নেবে না? তোমার সঙ্গে আমারও মেলায় যাবার বড় ইচ্ছে করছে।' কি করি? বাধ্য হয়ে ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়েই পদব্রজে আমায় এতটা দূরের পথ আসতে হল। এতে অবশ্য আমার নিজের তেমন কিছু কষ্ট হয় নি।"

মনুষ্য ও জন্তুজীবনের পার্থক্য এই সমদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দৃষ্টিতে এমনিভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

শিষ্য গরীবদাস কাঠিয়াবাবা মহারাজের সেবায় প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেন। একনিষ্ঠ গুরুসেবার মধ্য দিয়াই অধ্যাত্মসাধনের উচ্চ স্তরে

তিনি উন্নীত হন। অথচ এই নিষ্ঠাবান্ সাধকের সঙ্গে কাঠিয়াবাবাজী কম কঠোর ব্যবহার করিতেন না।

গরীবদাসের উপর আশ্রমের রন্ধনের ভার ছিল। দেখা যাইত, বাবাজী মহারাজ তাঁহার অসাক্ষাতে হাঁড়িকুড়ি ও আহার্য সমস্ত কিছু ওলোট-পালোট করিয়া তারপর তাঁহাকে অযথা নানারূপ তিরস্কার করিতেছেন। প্রায়ই তিনি ছল করিয়া সমস্ত দোষ এই শিষ্যের ঘাড়ে চাপাইতেন।

ব্রজ পরিক্রমার কালে গরীবদাসজীর সেবানিষ্ঠা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়া যাইত।

রৌদ্রতপ্ত সারা দুপুর ভরিয়া গরীবদাস বাবা মহারাজের তৈজস-পত্রাদি স্কন্ধে বহিয়া চলিয়াছেন, অথচ সারাদিন তাঁহার উপবাস, একফোঁটা জলও পেটে পড়ে নাই। তারপর বেলা গড়াইয়া গেলে বাবাজী মহারাজ ও সঙ্গীয় বৈষ্ণবদের জন্য তিনি রান্নাবান্না সমস্ত কিছু শেষ করিলেন।

ইহাই ধৈর্য পরীক্ষার উপযুক্ত সময়। কাঠিয়াবাবা তাই আহারে বসিয়া এক মহা অনর্থের সৃষ্টি করিলেন। রুটি প্রস্তুত করিতে কোথায় কি ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া কঠোর তিরস্কার শুরু করিলেন। অশ্লীল গালাগালির পালাও শেষ হইল, তারপর লাঠি দিয়া গরীবদাসের মস্তকে করিলেন প্রচণ্ড প্রহার!

এত কিছুতেও কিন্তু শিষ্যের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নাই। গুরুর চরণ ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "মহারাজ, অপরাধ সবই আমার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কৃপা ক'রে আমায় এবার ক্ষমা করুন।"

বাহিরের এ উষ্মা কিন্তু বাবাজীর অন্তরের প্রেমবন্ধনকে বিন্দুমাত্র শিথিল করে নাই। প্রহার করার পর গরীবদাসজীর আর্তি দেখিয়া দুই তিন দিন নিজে আহার গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

এ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "গরীবদাস এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমি তার প্রতি সেদিন অত্যন্ত প্রসন্ন হলাম। বুঝলাম, গুরুর কাছ থেকে বর লাভ করার সময় তার এসে গিয়েছে।

আমি এবার তাকে বরদান করবো। কিন্তু তারপর ভেবে দেখলাম, এমন পরম শান্তি সে নিজের ভেতর খুঁজে পেয়ে গিয়েছে যে, তাকে আর এ দুঃখময় সংসারে রেখে ক্লিষ্ট ও তাপিত করা কেন? বৈকুণ্ঠ পাওয়ার উপযুক্ত সে হয়েছে। তবে বৈকুণ্ঠেই চলে যাক না কেন? অন্য বর দিয়ে আর কি হবে?"

সদ্‌গুরু সেদিন ভক্ত গরীবদাসের পরম প্রাপ্তি ও বৈকুণ্ঠ গমনকে বিলম্বিত করিতে চাহেন নাই। শিষ্যও পরম আনন্দে তাই কয়েক-দিনের মধ্যে লোকান্তরে চলিয়া গেলেন।

শিষ্যদের প্রতি কটুবাক্য ও কঠোরতায় যে গুরুর প্রেম প্রকাশ পায়, সংসারের সাধারণ মানুষ কিন্তু তাহা সহজে বুঝতে চাহিবে না। বাবাজী মহারাজের প্রধান চেলা সন্তদাস মহারাজ একবার এ সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন। বড় চমৎকার উত্তর শোনা যায়।

বাবাজী বললেন, "বেটা, এতেই সত্যিকারের প্রেম, কল্যাণবহ প্রেম প্রকাশ পায়। গুরু গালিগালাজ ও প্রহার দেন চিত্তকে নির্মল করবার জন্য, ক্রোধ ও অভিমানের মূলোৎপাটনের জন্য। অথচ দয়াল গুরু এজন্য নিজে নিতান্ত কঠোর ও অত্যাচারী বলেই পরিচিত হন। শিষ্যের প্রতি প্রেমের জন্যই এ দুর্নামের বোঝা তিনি মাথায় তুলে নেন না কি?"

এসব কথা বলিতে গেলে এসময়ে স্বীয় গুরুর স্মৃতি মনে পড়িত, আর কাঠিয়াবাবা মহারাজের চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিত। ভাব-গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি বলিতেন, "আমার গুরুজী ছিলেন পরম দয়াল। তাঁর কোনো মোহ ছিল না শিষ্যের ওপর, ছিল নির্মল কল্যাণকর প্রেম। জেনে রেখো, প্রেম ও মোহ এক বস্তু নয়।"

কাঠিয়া বাবাজীর অন্যতম ভক্ত প্রেমদাসজীকে নিয়া একবার বড় গোল বাধিল। কোনো এক পণ্ডিত সভায় গিয়া ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান-মার্গীয় ব্যাখ্যাদি শুনিয়া প্রেমদাস ভক্তিপথ হইতে কিছুটা বিচ্যুত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞানী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী পুরুষের মতো তখন তাঁহার

মনোভঙ্গী। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে নিয়মনিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তিনি আর মানিতে চাহেন না। সর্বভূতেই তো ব্রহ্ম বিরাজমান, তবে ব্যক্তি বিশেষকে বা বিগ্রহ বিশেষকে শ্রদ্ধা করার দরকার কি—এই শ্রেণীর নানা উক্তি করিয়াও তিনি বেড়ান।

শিষ্যের এ ধরনের কথাবার্তার প্রতি কাঠিয়াবাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। তিনি শুধু সংক্ষেপে কহিলেন, "ওর কথা আর কি শুনবো, ও তো একেবারে পাগলই হয়ে গিয়েছে।"

বাবাজী মহারাজের মুখ হইতে এই কথা কয়টি নির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রেমদাসজীর মধ্যে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিবারাত্র তিনি বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান আর উন্মত্তভাবে চিৎকার করেন।

পথ চলিতে চলিতে গরীবদাসজী সেদিন এ হতভাগ্য গুরুভ্রাতাকে বড় শোচনীয় অবস্থায় দেখিতে পান। বাবাজী মহারাজের নিকট তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া মিনতির সুরে বলিতে থাকেন, "মহারাজ, প্রেমদাস নিতান্তই আপনার এক বালক ছেলে—বালগোপাল। এর প্রতি আপনি কৃপা করুন। এই উন্মাদ রোগের আক্রমণ থেকে একে রক্ষা করুন।"

অনুরোধটি শুনিয়া প্রথমে তো কাঠিয়াবাবা অগ্নিশর্মা! উত্তেজিত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—তিনি তো আর চিকিৎসক নহেন, এসব রোগীর ভার তাঁহার উপর তবে চাপানো কেন ?

কিন্তু গরীবদাসজীর করুণ আবেদন অবশেষে তাঁহাকে টলাইয়া দিল। এবার অনেকটা কোমল হইয়া তিনি বলিলেন, "বেশ, তাই হোক্। ভজন কুটিরের ঐ কোণে ঠাকুরের প্রসাদ রাখা হয়েছে, তাই ওকে খাইয়ে দাও। ব্যাধির কবল থেকে হতভাগা এখনই মুক্তিলাভ করবে। ও অবশ্য ঠাকুরের প্রসাদের মহাত্ম্য কিছুদিন যাবৎ মানছে না। তবু, ওকে খাইয়ে দেখিয়ে দাও। দেখুক, সত্যই মাহাত্ম্য কিছু আছে কিনা।"

ঐ প্রসাদ প্রেমদাসজীর মুখে তখনই তুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু

উন্মাদ প্রেমদাসের জিহ্বায় এ আস্বাদ তখন কেন যেন বড় তিক্ত লাগিতেছে, সামান্য একটু গ্রহণ করিবার পর তিনি আর ইহা খাইতে রাজী নন।

কাঠিয়াবাবা তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "ওরে খা—খা। তুই আর একবার ত্বাখ্, এর স্বাদ কি রকম।"

প্রেমদাসজী ধীরে ধীরে ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এবার কিন্তু তাঁহার মনে হইল ইহার স্বাদ অমৃতোপম। সমগ্র ভোজন পাত্রটি নিঃশেষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, ভক্ত প্রেমদাসের উন্মাদ রোগ একেবারে সারিয়া গিয়াছে।

স্মিতহাস্যে কাঠিয়াবাবা কহিলেন, "ওরে তুই না কত বলে বেড়াতিস্, সর্ব বস্তুই সমান? কেমন, এবার প্রসাদের মাহাত্ম্য ও তার বৈশিষ্ট্য তো দেখলি? এজন্যই বৈষ্ণবদের এত শুদ্ধাচার, এই জন্যই তাঁরা এত পবিত্র হয়ে শ্রীজীর ভোগ দেন। অপর খাদ্যের সঙ্গে এর কি কোনো তুলনা হয় রে? এমন বস্তুর মাহাত্ম্য সবাই বুঝবে কি ক'রে, বল্।"

শিষ্যদের উপর মহারাজের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ ও সতত সজাগ। ইঁহাদের অধ্যাত্ম-রূপান্তর সাধনের প্রয়োজনে নানা অলৌকিকত্বের মধ্য দিয়াও তাঁহার করুণা-লীলা বিস্তারিত হইত। প্রেমদাসজীর মৌনী জীবনের অধ্যায়কে কেন্দ্র করিয়া ইহার অপূর্ব নিদর্শন এক সময়ে দেখা গিয়াছিল।

এই সেবক শিষ্যটি সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ হইলেও কিছুটা কোপনস্বভাব ছিলেন। বিশেষত গঞ্জিকা চরস টানিবার পর তাঁহার ক্রোধের মাত্রা খুবই বাড়িয়া যাইত। একদিন নেশার ঘোরে প্রতিবেশী কয়েকটি ব্রজবাসীকে তিনি যথেচ্ছভাবে গালিগালাজ করিতে থাকেন।

মহারাজ তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "ওরে, তোর ক্রোধটা বড় বেশী, লোকের সঙ্গে কেবলই ঝগড়া করিস। আজ

থেকে মৌনী থাকবি। কারুর সঙ্গে তুই বারো বৎসরের মধ্যে কথা বলবিনে।”

উত্তরকালে মৌনীজী বলিতেন—বাবাজী মহারাজ এ কথা কয়টি বলিবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তাঁহার জিহ্বাতে তালা লাগাইয়া দিল, আর তাঁহার একটি কথা বলিবারও শক্তি রহিল না। বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে সেই সময় হইতে বারো বৎসর কাল মৌনী থাকিতে হয়। মৌনীজী নামেই এই সাধক শ্রীবৃন্দাবনে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

একবার এক বিষাক্ত সর্প মৌনীজীকে দংশন করে। বিস্ময়ের বিষয়, বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িলেও কাঠিয়াবাবার এই শিষ্যের মুখ হইতে যন্ত্রণাসূচক একটি বাক্যও এ সময়ে নির্গত হয় নাই। তাঁহার এই মৌনব্রতের বারো বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বাবাজী মহারাজ এক ভাণ্ডারার অনুষ্ঠান করিলেন।

আশ্রমভবনে কয়েক শত ব্যক্তি সেদিন নিমন্ত্রিত। মৌনীজীকে তাঁহারা কহিতে লাগিলেন, “মৌনীজী, আজ তোমার ব্রত সম্পূর্ণ হয়েছে, তুমি সকলের সঙ্গে এবার কথা কও।”

কিন্তু বলিলে কি হইবে? একটি বর্ণ উচ্চারণেরও সামর্থ্য তাঁহার কোথায়? বারো বৎসর আগে, আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে গুরুজী তাঁহার বাক্‌রোধ করিয়া দিয়াছেন, শব্দোচ্চারণের সমস্ত ক্ষমতাই লোপ পাইয়া গিয়াছে।

মৌনীজী ইঙ্গিত দ্বারা সকলকে জানাইলেন, বাবা মহারাজ যদি কৃপা করিয়া বাক্‌শক্তি প্রদান করেন, তবে তাঁহার পক্ষে কথা বলা সম্ভবপর, নতুবা নয়।

এবার কাঠিয়াবাবাজী নিজে আদেশ দিলেন, “মৌনী, তোমার ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে। তুমি কথা বল।”

মৌনীজীর বোধ হইল, কে যেন জিহ্বার কুলুপটি এই মুহূর্তে খসাইয়া দিয়া গেল। বাক্‌স্ফূর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘শ্রীজী’। ইহার পর নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই সকলের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

এক সময়ে মৌনীজী অভিমানভরে কিছুদিনের জন্য কাঠিয়াবাবা মহারাজের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেন। কিন্তু শীঘ্রই অনুশোচনা ও দুশ্চিন্তায় তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে থাকে। আশ্রমের কাজ কিরূপে চলিতেছে, বাবাজী মহারাজের সেবাই বা কি করিয়া সম্পন্ন হইতেছে —এই সমস্ত ভাবনা তাঁহাকে পাইয়া বসে। ইহার পর অনুতপ্ত হৃদয়ে তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসেন।

বাবাজী মহারাজ এ সময়ে আসনের উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মৌনীজী তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। অনুতপ্ত সেবক শিষ্যের নয়ন দু'টি অশ্রুসজল।

বাবাজী তখন এক অপরূপ লীলাভিনয় শুরু করিলেন। ধীর করুণ কণ্ঠে শিষ্যকে কহিতে লাগিলেন, "ওরে, আমি বুড়ো হয়েছি, তুই আমার কাছে আর থাকবি কেন? আমি কষ্ট পেয়ে মরে যাবো, তারপর তুই আশ্রমে ফিরে আসবি!"

মৌনীজীর নয়ন হইতে তখন দরদর ধারে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। এক হাতে চোখের জল মুছিয়া আর এক হাতে তিনি গুরুজীর চরণসেবা করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু এ কি অলৌকিক কাণ্ড! তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার হস্ত তো বাবাজীর চরণের উপর পড়িতেছে না! শূন্য শয্যায়ই তাহা বার বার নিপতিত হইতেছে। বাবাজী মহারাজের দেহটি শয্যা হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেলে, শিষ্যের হৃদয়ে কান্নার ঢেউ উঠিল। গুরুজীর আকস্মিক অন্তর্ধানে মুহ্যমান হইয়া তিনি অবিরল অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হইবার পর আবার এক নূতনতর বিস্ময়। মৌনীজী দেখিলেন, গুরুমহারাজের দেহ পুনরায় শয্যায় ফিরিয়া আসিয়াছে। পূর্ববৎ বিশ্রাম-শয়নে নিশ্চলভাবে তিনি শায়িত।

এইবার কাঠিয়াবাবা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া অভিমানভরে কহিতে লাগিলেন, "কেমন রে? আমি এভাবে চলে গেলে তুই যদি

হোস্, তবে বল্ আমি চলেই যাই। এ বুড়োকে ছেড়ে তোরা অন্যত্র গেলে—দেহটাকে কে সেবা-শুশ্রূষা করবে বল্ দেখি ?"

মৌনীজী নির্বাক্ বিস্ময়ে শ্রীগুরুকে পরিক্রমণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। বুঝিলেন, মহাসমর্থ গুরুদেবের স্বরূপ ও তাঁহার লীলার তাৎপর্য বুঝিবার মতো সামর্থ্য তিনি এতটুকুও অর্জন করেন নাই।

কাঠিয়াবাবাজীর শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও মানস-সন্তান ছিলেন সন্তদাস মহারাজ। এই শিষ্যের জীবনেও মহাকারুণিক গুরুর অজস্র করুণা ধারা বর্ষিত হয়, অলৌকিক যোগবিভূতির বহুতর লীলা নানাক্ষেত্রে নানারূপে প্রকটিত হইয়া উঠে।

সন্তদাস মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম তারাকিশোর চৌধুরী। কলিকাতা হাইকোর্টের তিনি ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। আধ্যাত্মিক জীবনের পরম প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁহার জীবনে এক সময়ে উদগ্র হইয়া উঠে, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি কাঠিয়াবাবাজীর চরণে আশ্রয় নিয়া ধন্য হন।

তারাকিশোরবাবু তখনও কলিকাতায় আইন ব্যবসায়ে ব্যাপৃত। ইতিমধ্যে শুধু দুই একবার বাবাজী মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, দীক্ষা গ্রহণ তখনো হয় নাই।

মহাপুরুষ তাঁহাকে রাত্রির চতুর্থ প্রহরে ধ্যান করিতে বলেন। কিন্তু পূর্ব অভ্যাসবশত সে সময়ে তারাকিশোরবাবুর পক্ষে জাগিয়া উঠা বড় কঠিন হয়। একদিন ঘরের ভিতর জানালার ধারে মশারি টাঙাইয়া তিনি নিদ্রিত রহিয়াছেন। শেষরাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি শুনিলেন, কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া উচ্চ স্বরে বলিতেছে, "ওরে ওঠ্ ওঠ্।" সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শরীরের উপর একটি ইষ্টকখণ্ড পতিত হইল।

তারাকিশোরবাবু চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। শয্যা হইতে ঢিলটি কুড়াইয়া নিবার পর তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। মশারির

কোথাও কোনো ফাঁক নাই, অথচ এই ইষ্টকখণ্ড কোথা হইতে উহার ভিতর দিয়া গিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিল, তাহা মোটেই বুঝিতে পারিলেন না। নির্দেশিত সময়ে ভক্ত তাহার কর্তব্য পালন করিতেছে না—অতন্দ্র-দৃষ্টি, সমর্থ যোগীপুরুষ কি সেইজন্যই তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন ?

এ ঘটনার পর হইতে রাত্রির শেষ যামে জাগিয়া সাধন-ভজন করিতে তারাকিশোরবাবুর আর ভুল হয় নাই।

বাবাজী মহারাজের করুণাধারা এই মুমুক্ষু সাধকের উপর নানা লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিত। সন্তদাসজী স্বরচিত গুরুর চরিতে এ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন—"এক দিবস ছাদের উপর শুইয়া আছি, শেষরাত্রে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। উঠিয়া বসিলাম এবং বসিবামাত্র দেখিলাম যেন আকাশ ভেদ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজ আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মুহূর্ত মধ্যে তিনি আমার সম্মুখে ছাদের উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং আমাকে আশ্বস্ত করিয়া তখনই একটি মন্ত্র আমার কর্ণকুহরে উপদেশ করিলেন। মন্ত্রোপদেশ করিয়া তিনি আকাশপথে উড্ডীন হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।"

কলিকাতায় থাকিতে তারাকিশোরবাবু একবার প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বর কমিবার তো কোনো লক্ষণই নাই, বরং তাহা কেবল বৃদ্ধির পথেই চলিয়াছে। এই সময়ে তাঁহার এক অদ্ভুত খেয়াল হইল। তিনি ভাবিলেন, 'বাবাজী মহারাজ তো সর্বদাই গাঁজা সেবন করেন, আর তাতেই তিনি পরম প্রীত হন। তবে তাঁকে গাঁজাই ভোগ দিই না কেন ? তারপর তাঁর সেই প্রসাদী ছিলিম পান করলে নিশ্চয়ই এই জ্বর নিরাময় হবে।'

অতঃপর বাজার হইতে নূতন কল্‌কে ও গাঁজা আনিয়া ছিলিম সাজিয়া তাহা নিবেদন করা হইল।

কি জানি কেন, ঐ গাঁজার ছিলিমটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া

তারাকিশোরবাবুর মনে হইল, গুরুজী উহা পান করিতেছেন। কল্কে হইতে তখন সত্যই বেশ ধূম নির্গত হইতেছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি ঐ প্রসাদী গাঁজা নিজে পান করিলেন। বিস্ময়ের কথা, অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার জ্বর ত্যাগ হইয়া গেল।

কিছুদিন পরের কথা। তারাকিশোর বৃন্দাবনের আশ্রমে কাঠিয়া-বাবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। সেদিন বাবাজী মহারাজ কয়েকটি ব্রজবাসীর সহিত বসিয়া সানন্দে গঞ্জিকা সেবন করিতেছেন কিছুকাল পরে তিনি অপর প্রকোষ্ঠ হইতে তারাকিশোরবাবুকে ডাকাইয়া আনিলেন, কহিলেন, "কই হে এসো, এবার তুমি ঐ প্রসাদী ছিলিম নিয়ে পান ক'রে ফেল।"

একজন ব্রজবাসী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবুজীও কি গঞ্জিকায় অভ্যস্ত? কাঠিয়াবাবাজী চতুর হাসি হাসিয়া কহিতে লাগিলেন, "না, বাবুজী গাঁজা বড় একটা খায় না, তবে জ্বরে আক্রান্ত হলে কখনো কখনো বাবা মহারাজকে স্মরণ ক'রে গাঁজার ভোগ দেয়, তারপর অবশ্য সেই প্রসাদটুকু ভক্তিভরে গ্রহণ ক'রে থাকে।"

তারাকিশোরবাবু উপলব্ধি করিলেন, সর্বজ্ঞ গুরুদেবের নিকট তাহার কোনো কিছুই অবিদিত থাকে না। তাছাড়া ইহাও বুঝিলেন, কলিকাতায় জ্বরভোগের সময় সে গঞ্জিকা-ভোগ তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন বাবাজী তাহা সত্যসত্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আশ্রয়দানের পর সদ্‌গুরুকে শিষ্যের অনেক ভারই বহন করিতে হয়—কাঠিয়াবাবা মহারাজের বেলাতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। একবার তারাকিশোরবাবু কর্মোপলক্ষে শহরের বাহিরে গিয়াছেন। কলিকাতায় তাঁহাদের পাড়ায় সে সময়ে চোরের বড় উপদ্রব। গৃহে এসময়ে লোকজন মোটেই নাই। তাই তাঁহার স্ত্রী রাত্রিবেলায় বড় ভয়ে ভয়ে থাকিতেন।

তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের কাল। কিন্তু এত গরমেও তারাকিশোরবাবুর স্ত্রী সাহস করিয়া রাত্রিতে দরজা-জানালা খুলিতে পারেন না। একদিন

রাত্রিতে গরমে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি ঘরের একটি জানালা খুলিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, বাতায়নের অদূরে বাবাজী মহারাজ সহাস্যে দণ্ডায়মান!

মধুর কণ্ঠে বাবাজী বলিয়া উঠিলেন, "মাঈ, তোমার এত ভয় কেন, বল তো? আমি তো সদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকছি।"

পরক্ষণেই দিব্যমূর্তিটি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আপাতকঠোর ও রহস্যময় কাঠিয়াবাবা মহারাজের বহিরঙ্গ আচরণ ছিল বড় দুরবগাহ। আগন্তুক ও স্বল্প পরিচিত লোকের পক্ষে তাহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া বড় সহজ ছিল না। করুণাপরবশ হইয়া বাবাজী মহারাজ যখন নিজের রহস্যাবরণ উন্মোচন করিতেন, তখনই শুধু তাহা সাধারণের বোধগম্য হইত।

কাঠিয়াবাবাজীর বৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীরাধাবিহারীজীর প্রতিষ্ঠার সময়ে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটে। বহু লোক সেদিন এ উৎসব উপলক্ষে প্রসাদ প্রাপ্ত হয় এবং তারপরও প্রচুর লাড্ডু ও কচুরী ভাণ্ডারে জমা থাকে। রাত্রিতে হঠাৎ আরও বহুসংখ্যক সাধু আসিয়া আশ্রম প্রাঙ্গণে আহারার্থ সমবেত হয়। কিন্তু বাবাজী মহারাজ উহাদের দেখিয়াই কেন যেন উগ্রমূর্তি ধারণ করেন। নির্মমভাবে তিরস্কার করিয়া এই আগন্তুকদের তিনি সেদিন বিতাড়িত করিলেন।

কাঠিয়াবাবাজীর অন্যতম শিষ্য, অভয়চরণ রায় সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অভ্যাগত সাধুদের প্রতি বাবাজী মহারাজের এরূপ ব্যবহার তাঁহার চোখে বড় অলৌকিক ও রূঢ় ঠেকিল। মনে মনে ভাবিলেন, 'গুরু মহারাজের এ আচরণ মোটেই ন্যায়সঙ্গত নয়, বিসদৃশও বটে! ভাণ্ডারে তো বহু খাদ্যই বেশী হইয়াছে, তবে এই সাধুদের কিছু কিছু বিতরণ করিতে বাধা কোথায়?'

অন্তর্যামী বাবাজী মহারাজ শিষ্যের অন্তরের চিন্তাধারা সবই জানিয়াছেন, কিন্তু সে সময়ে এ-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই।

দিনান্তের কার্যশেষে অভয়বাবুকে তিনি নিজের ধুনির পার্শ্বে আহ্বান করিলেন। গঞ্জিকার কল্‌কেটিতে টান মারিয়া ধীরে ধীরে

স্নেহপূর্ণস্বরে এই প্রবীণ শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "অভয়, তুমি ভাবছো—এ সাধুদের আমি খাবার না দিয়ে কেন তাড়িয়ে দিয়েছি। বাবা, তুমি নিতান্ত বালক, একেবারে জ্ঞানহীন। কিছু বোঝবার মতো সামর্থ্য তোমার এখনও হয় নি। তুমি জানো না, ওরা কেউ সত্যিকারের সাধু নয়, সাধুবেশধারী মাত্র। ক্ষুধার্তও ওরা নয়, ভোজন ওদের আগেই হয়েছে—এখানে এসেছিল শুধু সঞ্চয়ের জন্য। আর এজন্য তুমি মোটেই খেদ ক'রো না। যথার্থ ক্ষুধার্ত সাধুরা একটু বাদেই আশ্রমে এসে পৌঁছাবে—খুব তৃপ্ত ক'রে তাদের ভোজন করাও।"

সত্যই তাহা ঘটিল। অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে একদল সাধু দর্শন দিলেন। অভয়বাবু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলেন, ইহারা নিষ্কিঞ্চন এবং সাধননিষ্ঠ সাধু, আর সত্যসত্যই ক্ষুধার্ত।

এক দরিদ্র ও অসহায় ব্রাহ্মণকে কাঠিয়াবাবাজী আশ্রমে আশ্রয় দান করেন। লোকটি দুরন্ত হাঁপানি রোগে ভোগে, প্রায়ই তাহাকে এজন্য কষ্ট পাইতে হয়। এই ব্যাধির তাড়নায় বিব্রত থাকিয়াও সে আশ্রমের বহু কার্য সম্পন্ন করে।

একদিন ব্রাহ্মণটি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে, ধুনির সম্মুখে বসিয়া কেবলই ধুঁকিতে থাকে। বাবাজী মহারাজ হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে তিরস্কার করিতে লাগিলেন—"কেন তুই শুধু শুধু এখানে পড়ে আছিস্। পেটের জন্য যারা বৈরাগী, তাদের স্থান এখানে নেই। কেনো কাজ না ক'রে, বসে বসে শুধু সাধুর অন্ন ধ্বংস করিস্, এতে কি তোর লজ্জা হয় না? যা, এখনই তুই আশ্রম থেকে বেরিয়ে যা।"

পূর্বোক্ত অভয়চরণ এবং তারাকিশোর তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত। উভয়েই এ আচরণ দেখিয়া বড় মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। অভয়বাবুর চোখেমুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণটি এযাবৎকাল সাধ্যমতো আশ্রমের সেবা করিয়াছে। এখন সে রোগে পঙ্গু ও ভগ্ন-স্বাস্থ্য। এ অবস্থায় সত্যই আশ্রম হইতে বাহির করিয়া দিলে

তাহার কি উপায় হইবে? অভয়বাবুর কাছে এটি নিতান্তই হৃদয়-হীনের কাজ বলিয়া মনে হইল।

কক্ষান্তরে গিয়া তিনি নিঃশব্দে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন। এমন সময় কাঠিয়াবাবা মহারাজ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সস্নেহে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "অভয়রাম, তুমি নিতান্তই বালক। আসল ব্যাপার যে কি, তাহা তুমি কি ক'রে বুঝবে? আমার আজকের এ নিষ্ঠুর আচরণের গূঢ় অর্থ রয়েছে। ব্রাহ্মণটি বড় সজ্জন, সাধনারও সে একজন প্রকৃত অধিকারী। আগে বড় বেশী দুঃখ দুর্দশায় ছিল, সব সময়ে অন্নাভাবে বিব্রত থাকায় ভগবানের নাম রীতিমতো করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। আমি তাই তার অধ্যাত্মপথের বাধাটি সরিয়ে দিয়েছিলাম—আশ্রমের আশ্রয় পেয়ে তার ভজনের সুযোগ ঘটেছিল। কিন্তু দেখছি, অতি সহজে ভোজন পাবার পর প্রকৃত যে কাজ, সেই ভজনকেই সে ভুলে গিয়েছে। এসময়ে আশ্রমে বাস করলে তার ভজনকার্যে বিঘ্ন ঘটবে, অধ্যাত্ম-জীবনের খুবই ক্ষতি হবে। এখান থেকে তাড়াতাড়ি বিতাড়িত হলেই সে প্রকৃত কল্যাণকে এবার খুঁজে পাবে, নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়ে আবার কাতর হয়ে সে ভগবান্‌কে ডাকবে। ভজন সাধন ঠিক চলতে থাকলে তবে তো তার মুক্তি আসবে? তুমি বালক, এত কথা কি ক'রে বুঝবে? প্রকৃত কল্যাণের যে পথ, তা তো তোমার মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়?"

কথাগুলি শুনামাত্রই অভয়বাবুর ভ্রম দূর হইল, তিনি বড় লজ্জিতও হইলেন। বুঝিলেন, তাঁহার সীমিত দৃষ্টি দ্বারা লোকোত্তর মহাপুরুষের আচরণকে বিচার করিতে গিয়া ধৃষ্টতারই পরিচয় তিনি দিয়াছেন।

মনুষ্য জীবনের প্রকৃত কল্যাণ বলিতে কাঠিয়াবাবা বুঝিতেন—মোহবন্ধন হইতে মুক্তি ও ভগবান্ লাভ। তাই শিষ্যদের অধ্যাত্ম-জীবনের বিকাশ ও পরিণতির দিকে নিবদ্ধ রাখিতেন সদা সতর্ক দৃষ্টি। জৈব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্তি, জাগতিক জীবনের সুখসম্পদ,

এসব ছিল এই মহাজ্ঞানী পুরুষের কাছে একেবারে অর্থহীন। কোনো মানুষের জীবনে ভগবৎ-দর্শন না ঘটিলে উহাকে তিনি 'বন্ধ্যা'-জীবনের মতোই নিষ্ফল বলিয়া গণ্য করিতেন।

বাবাজী মহারাজ একদিন শিষ্যগণসহ আশ্রমে বসিয়া রহিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "পরোপকারকে ওয়াস্তে সন্তন্ ধরে শরীর।"

এ কথার তাৎপর্য বুঝাইতে গিয়া এক প্রতিবেশী প্রাচীন সাধু, কল্যাণদাসজীর কথা উঠিল। কেমারবনের দাবানলকুণ্ডের নিকটস্থ এক আশ্রমের ইনি মোহান্ত। বহু অভ্যাগত সাধু-সন্ত ইহার নিকট সর্বদা আশ্রয় পায়। তাছাড়া, পরোপকারী ও দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধিও যথেষ্ট রহিয়াছে।

কাঠিয়াবাবাজী কিন্তু সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়া কহিলেন, "সাধুদের অনুষ্ঠেয় যে প্রকৃত উপকার তা কিন্তু মোটেই এ শ্রেণীর নয়। এ তো নিতান্ত সামান্য বস্তু। এ উপকার পেয়ে উপকৃত ব্যক্তির কল্যাণ যা হয়, তা খুবই তুচ্ছ। কারণ, পারমার্থিক সম্পদ তো এর ভেতর দিয়ে কখনো আসে না। তাছাড়া, উপকারী ব্যক্তি বা দানব্রতী কর্মকর্তাকে এজন্য আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। পরজন্মে তাঁর বিষয়বৈভব, মানসম্মান প্রভৃতি হয়তো অনেক কিছু হয়। প্রকৃত মহাত্মারা কিন্তু এ শ্রেণীর হিতকর্মে কখনো লিপ্ত হন না, তাঁরা বরং জীবের দুঃখতাপের মূলকে বিনাশ করেন—আর এ ধরনের উপকারই নিয়ে আসে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ। এজন্যই এসব মহাত্মাদের কর্মপ্রণালী ও তার মর্ম পৃথিবীর সাধারণ লোক সহজে বুঝে উঠতে পারে না।"

অভয়চরণ রায় মহাশয় বাবাজী মহারাজের অন্যতম শিষ্য। শেয়ার বাজারে ও ব্যবসায়ে নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এক সময়ে তিনি খুব মুষড়িয়া পড়েন। এই দুরবস্থার সময় নিতান্ত অযাচিতভাবে কাঠিয়াবাবাজীর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন। ইহার পর কিছুকালের জন্য

তিনি অযোধ্যায় বাস করিতে থাকেন। আর্থিক বিপর্যয় ও উত্তমর্ণদের আতঙ্কে এ সময়ে প্রায়ই তাঁহাকে ম্রিয়মাণ দেখা যাইত।

এক রাত্রিতে শয্যায় শুইয়া অভয়বাবু সখেদে নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, 'ভগবান্‌কে অন্তরের বহু মিনতি জানালাম, কিন্তু তিনি তো এসে দেখা দিলেন না, আমার দুঃখমোচনও করলেন না! তাহলে কি তিনি নেই?' সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প স্থির করিলেন, পরদিন সরযূর সেতু হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া চিরতরে সমস্ত কিছু জ্বালাযন্ত্রণার অবসান ঘটাইবেন।

কিছুক্ষণ মধ্যেই এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিল। কাঠিয়াবাবা মহারাজ অকস্মাৎ তাঁহার সেই কক্ষে সশরীরে আবির্ভূত হইলেন। বাবাজী মহারাজ ধীরে ধীরে তিরস্কারপূর্ণ কণ্ঠে অভয়বাবুকে কহিতে লাগিলেন, "অভয়রাম, তুমি এমনি শুয়ে শুয়ে কাল কাটাবে ও খেদোক্তি করতে থাকবে, আর শ্রীভগবান্ তোমাকে দর্শন দেবেন—না? আমি তো তোমায় ইষ্টনাম বলেই দিয়েছি। সে নাম তুমি করছো না কেন? ভগবান্ হচ্ছেন দুর্লভ বস্তু, পরম ধন—তাঁকে কি অমনি পাওয়া যায়?"

অভয়বাবু ত্রস্তেব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া তখনই গুরুদত্ত নাম জপ করিতে লাগিলেন। এক অপূর্ব দিব্য আনন্দের জ্যোতি তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে তাঁহার সর্ব দুঃখ ও দুশ্চিন্তা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, আর তৎস্থলে উদ্ভূত হইয়াছে এক অপূর্ব মানসিক প্রশান্তি।

কিছুদিন পরের কথা। অভয়চরণ অযোধ্যা হইতে বৃন্দাবনে চলিয়া আসিয়াছেন। কাঠিয়াবাবা মহারাজ তাঁহাকে দেখা মাত্রই বলিয়া উঠিলেন, "কি হে অভয়রাম, ভগবান্ আছেন—এ বিশ্বাস এখন কতকটা হয়েছে তো? বাবা, তোমার কোনো চিন্তার প্রয়োজন নেই। তুমি আপন ঘরে গিয়ে বাস করো, নাম জপ ক'রে যাও, তোমার পাওনাদারেরা অসদ্ব্যবহার করবে না।"

কলিকাতায় ফিরিয়া অভয়বাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন। উত্তমর্ণগণ

তাঁহার প্রতি যথেষ্ট উদারতা ও সহানুভূতিই প্রকাশ করিতে লাগিল। অতঃপর গৃহে বসিয়া তিনি সাধনায় রত হইলেন।

কাঠিয়াবাবা মহারাজ অভয়বাবুকে এ সময়ে স্বপ্নযোগে দর্শন দান করেন। মধুর হাসি ছড়াইয়া, অঙ্গুলি সংকেতে একটি জটাজুট সমন্বিত সাধুর আলেখ্য তাঁহাকে প্রদর্শন করান, আর এই সঙ্গে বিশেষভাবে বলিয়া দেন, "ইনি এক মহাত্মা। এঁর সঙ্গে তুমি মাঝে মাঝে বাস করতে পার, তোমার তাতে যথেষ্ট কল্যাণ হবে।"

কিছুকাল পরে অভয়চরণ রায় বৃন্দাবনধামে আসেন এবং একদিন ঘটনাচক্রে কোনো ভক্তের কুঞ্জে উপনীত হন। এইস্থানে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের সহিত হঠাৎ তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। প্রভুপাদকে দেখিয়াই অভয়বাবু চিনিলেন, এ মহাত্মার মূর্তিই কাঠিয়াবাবা তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন করাইয়াছেন।

অতঃপর কাঠিয়াবাবাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে মহাপুরুষ চকিতে বলিয়া উঠিলেন, "অভয়রাম, স্বপ্নে তোমায় আমি ঠিকই দেখা দিয়েছিলাম।' আজ বোধহয় তার যথার্থতা বেশ বুঝতে পেরেছো। আমার নির্দেশিত সে মহাত্মার সাথেও তোমার দেখা হয়েছে। ওর সঙ্গ তুমি ক'রে যাবে। সাচ্চা সাধু যাকে বলা হয় উনি তাই। আচ্ছা চল, আজ এখান তোমার সাথে গিয়ে আমিও তাঁর সাথে আলাপ ক'রে আসি।"

বাবাজী মহারাজ তখনি শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এইদিন কিন্তু কাঠিয়াবাবাজীর আচরণ ও চালচলন দেখিয়া অভয়বাবুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। যে প্রভুপাদের সঙ্গে অলৌকিক ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া মিলন ঘটাইয়া দিলেন, তাঁহার সঙ্গে যেন কোনো পরিচয়ই নাই; অপরিচিত ব্যক্তির মতোই কথা কহিতেছেন। কোথায় তাঁহার পূর্বাশ্রমের দেশ, বৃন্দাবনে আগমন কেন; কি করিয়া ভিক্ষা নির্বাহ হইতেছে, গোস্বামীজীকে এসব প্রশ্নই তিনি করিতে লাগিলেন।

কাঠিয়াবাবা চলিয়া গেলে গোস্বামীজী নিজ পরিকরদের সেদিন বলিয়াছিলেন, "ছাখো, যে মহাপুরুষ আজ এখানে কৃপা ক'রে এসেছিলেন, তিনি সত্যই অসামান্য। গর্গ ও নারদ শ্রেণীর ব্রহ্মবিদ্ ইনি।"

স্বেচ্ছামতো, অলৌকিকভাবে দর্শনাদি দিয়া কাঠিয়াবাবা মহারাজ সাধনার উপযুক্ত অধিকারীদের অনেক সময় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিতেন। এ সম্পর্কে প্রচলিত নানা কাহিনীর মধ্যে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কিত ঘটনাটি বড় কৌতূহলোদ্দীপক। বিজয়বাবু তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের (সন্তদাস মহারাজ) এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অধ্যাত্ম-সাধনার দিক দিয়া তখন তিনি খুব উন্নত।

একদিন তিনি কলিকাতায় তারা কিশোরবাবুর গৃহে গিয়াছেন। বৈঠকখানায় ঢুকিয়াই তো তিনি অবাক্! দেওয়ালে এক সাধুর ছবি। তিনি ব্যগ্রভাবে এ সাধুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে জানা গেল, ইনি তারাকিশোরবাবুর গুরুদেব, বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ মোহান্ত —রামদাস কাঠিয়াবাবা।

বিজয়বাবু অতঃপর এ মহাত্মা সম্পর্কে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে লাগিলেন তাহাতে কক্ষস্থিত ব্যক্তিদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি কহিলেন, "আমি সম্প্রতি স্বাস্থ্যলাভের জন্য সাঁওতাল পরগনায় গিয়েছিলাম। যেখানে আমি থাকতাম তার নিকটে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় আমি এঁকে দর্শন ক'রে এসেছি। পুরো তিন দিন তিনি ঐ গাছতলার ধুনি জ্বালিয়ে আসন ক'রে বসেছিলেন। আমি রোজই চরণতলে গিয়ে বসতাম, আর আমায় কত স্নেহ, কত আদর-যত্ন করতেন!"

স্থূলদেহটি নিয়া কাঠিয়াবাবা কিন্তু তখন বৃন্দাবনধাম ছাড়িয়া অন্য কোথাও গমন করেন নাই। তারাকিশোরবাবু যতই বলেন,—বাবাজী মহারাজের পক্ষে এ সময়ে সাঁওতাল পরগনায় উপস্থিত হওয়া নিতান্ত অবিশ্বাস্য কথা,—বিজয়বাবু ততই জোর দিয়া বলিতে থাকেন,

এই মহাপুরুষকে তিনি তিন দিবস ব্যাপিয়া ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দেখিয়া আসিয়াছেন, এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিছুদিন পরে বৃন্দাবনে আসিয়া তারাকিশোরবাবু কাঠিয়াবাবাজীকে প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। বাবাজী মহারাজ স্মিতহাস্যে উত্তর দেন, "বাবা, আমি এখানে অবস্থান করলেও অনেক সময় অন্য স্থানে বহুলোক আমার এ মূর্তিকে দর্শন ক'রে থাকে। এ রহস্য এখন তুমি বুঝবে না, পরে বুঝতে পারবে।"

ভক্ত ও আর্তজনেরা কাঠিয়াবাবাকে দেখিত এক করুণাঘন মহাপুরুষরূপে। আবার স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে বিপরীত মূর্তির প্রকাশও তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত। সন্তদাস মহারাজ এ সম্পর্কিত ঘটনার বর্ণনা তাঁহার লিখিত জীবনচরিতে দিয়াছেন :

বাবাজী একদিন শিষ্য পরিবৃত হইয়া আশ্রমে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে শ্রীহট্টের এক বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী সেখানে আসিয়া উপস্থিত। মহাপুরুষ সে সময়ে এক অদ্ভুত অভিনয় শুরু করিয়া দিলেন। তিনি যেন এক আকস্মিক ব্যাধিতে তখন আক্রান্ত—দৈহিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বার বার কেবল কাতরোক্তি করিতেছেন। আগন্তুক ভদ্রলোকটি এ দৃশ্য দেখিয়া বড় ঘাবড়াইয়া গেলেন। চাঞ্চল্য ও বেদনার্ত চিৎকারের মধ্যে বিভ্রান্ত হইয়া তিনি কিছুক্ষণের মধ্যে স্থান ত্যাগ করেন। বাবাজী মহারাজকে প্রণাম করার কথাও তিনি বিস্মৃত হন।

ভদ্রলোকটির বিদায় গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু কাঠিয়াবাবার কাতরোক্তি ও আর্তনাদ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রিয় ভক্তদের সহিত আবার তিনি পূর্ববৎ নানা হাসিঠাট্টা ও রঙ্গরস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সন্তদাসজীর বুঝিতে বাকী রহিল না, আগন্তুক বড় হতভাগ্য—বাবাজী মহারাজের চরণ বন্দনা করিবার অধিকারটুকুও সে লাভ করিতে পারিল না। মহাপুরুষ তাহাকে সেদিন ছলনা করিয়াই বিদায় দিলেন।

বাহ্য আচরণ দেখিয়া এই বিরাট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে বুঝিবার উপায় কাহারো ছিল না। লোকচক্ষুর অন্তরালে, লোকোত্তর মহাজীবনের নিগূঢ় লোকেই তিনি আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন। শুধু বিশেষ বিশেষ করুণার ক্ষেত্রে দেখা যাইত, তাঁহার অলৌকিক যোগৈশ্বর্য মুহূর্তমধ্যে ঝলকিয়া উঠিয়াছে। বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে আশেপাশের ভক্ত ও সাধারণ মানুষ তখন এ বিরাট পুরুষের চরণতলে লুটাইয়া পড়িত।

এই শক্তিধর মহাপুরুষের জীবনে সাধারণ ও অসাধারণ—লৌকিক ও অলৌকিক এই দ্বৈতসত্তার এক অপরূপ মিলন সাধিত হইতে দেখি। বহির্জগতের প্রয়োজন ও পরিবেশ অনুযায়ী সহজ সাধারণ আচরণই তিনি করিতেন। সেই সঙ্গে আপন সাধনসত্তার গভীরে লুক্কায়িত রাখিতেন অপরিমেয় শক্তির উৎস, প্রচ্ছন্ন রাখিতেন দ্বন্দ্বাতীত চৈতন্যলোকের অখণ্ড বোধ।

আপন জীবনের দ্বৈতসত্তার এক চমৎকার ব্যাখ্যা কাঠিয়াবাবাজী শিষ্য সন্তদাস মহারাজের নিকট বিবৃত করেন। তিনি বলেন, "বাবা হাতীকো দো দাঁত রহতা হ্যায়—এক বাহারমে দেখানেকে লিয়ে, দুসরা ভিতরমে খানেকে লিয়ে। ভিতরকা দাঁত দুসরা আদমীকো মালুম নহীঁ পড়তা হ্যায়। সন্তকো ইসী তরহ্ দো বৃত্তি রহতী হ্যায়—এক বাহার দেখানেকো, দুসরা আপনা ভিতরমে, উসকা খবর কভী কিসিকো নহীঁ মিলতা হ্যায়।" অর্থাৎ—বাবা হাতির দুইটি দাঁত রয়েছে—একটি বাইরের লোককে দেখাবার, আর একটি ভেতরের, যা দিয়ে সে তার খাদ্যবস্তু চিবিয়ে খায়। ঐ ভেতরের দাঁত কিন্তু বাইরের অন্য কোনো লোকেরই চোখে পড়ে না। প্রকৃত সমর্থ সাধুদেরও এমনি দুইটি বৃত্তি থাকে। একটি বাহ্য—বাইরের মানুষকে দেখাবার জন্য, দ্বিতীয়টি তাঁর অন্তরস্থ নিগূঢ় সত্তা। এই দ্বিতীয়টির সংবাদ বহিরঙ্গ লোকের অনেকের ভাগ্যেই মিলে না!

বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ আচরণের এই বৈপরীত্যের মধ্য দিয়াই বাবাজীর লীলা চাতুর্যের প্রকাশ দেখা যাইত।

কাঠিয়াবাবাজীর খ্যাতি শুনিয়া বাহির হইতে অনেকে ব্যগ্রভাবে

তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। কিন্তু কেমারবনের আশ্রমে প্রবেশ করিবার পর তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না।

বাবাজী মহারাজের মধ্যে সমাধিবান্ মহাসাধকের লক্ষণ সহসা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। প্রশান্ত গম্ভীর মহাযোগীর দিব্য মহিমার যে কথা শুনা যায়, তাহা চোখে পড়ে কই? নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতোই নিজে তিনি দৈনিক বাজারের দ্রব্যাদি ক্রয় করেন। শাক-তরকারি কিনিতে গিয়া দর কষাকষিতে প্রকাশ পায় তাঁহার প্রবল উৎসাহ। আবার আশ্রমের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অপরে কখনো কিনিয়া আনিলে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া পাকা বৈষয়িক গৃহস্থের মতো তাহার হিসাব গ্রহণ করেন, এক পয়সা চুরি বা অপব্যয় যেন না হয়। এমনি তাঁহার সতর্কতা।

সেবাকুঞ্জের সম্মুখে গঞ্জিকা-চক্রের মধ্যমণিরূপে বাবাজী রাস্তায় উপবিষ্ট থাকেন। হঠাৎ দেখিয়া কে তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারিবে? কে সত্য সত্যই ধারণা করিতে পাবিবে যে, ইনিই অধ্যাত্ম-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, অসামান্য যোগ-বিভূতির অধিকারী ১০৮ স্বামী শ্রীকাঠিয়াবাবা!

পথের পার্শ্বে, বৃক্ষের ছায়ায় বাবাজী মহারাজ উপর্যুপরি গাঁজা চরস পান করিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গী সাথীদের মধ্যে ভবঘুরে চোর-বদমায়েসও যে দুই-চারিজন নাই তাহাও নয়। তীর্থযাত্রীর দল এ গঞ্জিকাসেবীদের সমীপস্থ হইলে দুই-একজন উঠিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি নির্দেশে কাঠিয়াবাবাকে দেখাইয়া দেয়। বার বার তাহারা হাঁকিয়া বলিতে থাকে, "আরে দেখো দেখো, ইয়ে দুধাহারী বাবা হ্যায়। খালি দুধ পীকর্ রহ্তে হেঁ। ইন্‌কো কুছ প্রণামী তো চড়হাও।"—অর্থাৎ দেখ দেখ ভাইসব, ইনি—দুধাহারীবাবা। কেবল দুধ পান ক'রেই জীবনধারণ করেন। এঁর জন্য তোমরা কিছু কিছু প্রণামী দাও।

প্রণামীর টাকায় গাঁজা-চরসের ব্যয় সংকুলানটা অন্তত হইবে, এই জন্যই হয়তো বাবার প্রণামী সংগ্রহের জন্য সঙ্গীদের এমন আগ্রহ। বাবা মহারাজও তেমনি এই বিচিত্র অভিনয়ের সম্মুখে নিঃশব্দে বসিয়া

প্রসন্ন হাসি হাসিতেছেন। ভাবখানা এই—তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া সঙ্গীদের গাঁজার আসরের খরচটা যদি কিছু জুটিয়াই যায়, আপত্তি কি ? তাছাড়া, কিছু অর্থ আশ্রমের খরচের জন্য পাওয়া গেলেও মন্দ কথা নয়। তীর্থকামী গৃহস্থেরা সাধুদের জন্য দু-একটা টাকা খরচ করুক না কেন, তাতে তাহাদের কল্যাণই হইবে।

এরূপে সংগৃহীত অর্থ হইতে উদ্‌বৃত্ত যাহা কিছু থাকে, কাঠিয়াবাবা মহারাজ সতর্কতার সহিত কোমরে বাঁধিয়া আশ্রমে নিয়া আসেন। এ অর্থের নিরাপত্তার জন্যও তিনি যেন সর্বদাই মহা উৎকণ্ঠিত। আশ্রমিকদের পক্ষে সম্ভব নয় যে, এই যত্নরক্ষিত পয়সাকড়ি তাহারা কোনোমতে স্পর্শ করে।

সায়ংসন্ধ্যার পরে আশ্রমের বারান্দায় বসিয়া বাবাজী মহারাজ যে সব কথাবার্তা সাধারণত বলেন, তাহাও বড় বিভ্রান্তিকর। কোনো ধর্মালোচনা বা তত্ত্বোপদেশ তাহাতে নাই। ভগবৎ প্রসঙ্গের স্থলে প্রায়ই আলোচিত হয় অতি সাধারণ বৈষয়িক কথা। স্থানীয় বাজারে খাবারের দাম কেন চড়িতেছে, গাঁজার সরবরাহ শীঘ্র বাড়িবে কিনা, ইত্যাদি কথায়ই বেশী সময় কাটিয়া যায়।

কোন্ রাজা বা লক্ষপতি শেঠ বৃন্দাবনে আসিয়া বাবাজীকে প্রণামী দিয়া গিয়াছে, ইহা নিয়াও তাঁহার যেন গৌরব প্রকাশের অন্ত নাই। কোথাকার এক দানশীল মহারাজা বৃন্দাবনে আসিতেছেন, আশ্রমের জন্য প্রত্যহ নিশ্চয় তিনি পাঁচ মূর্তির খোরাক পাঠাইয়া দিবেন, এ আশার কথা বাবাজী বার বার সবাইকে জানাইতে থাকেন, যেন এই দানের উপর তিনি কত নির্ভর করিয়া আছেন !

কোন্ শেঠ কত টাকার ভাণ্ডারা দিবে, ধুমধাম করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে, ইহা নিয়াও বিতর্কে মাতিয়া উঠেন, প্রবল উৎসাহ দেখান। যাহারা আশ্রমে আসিয়া প্রণামীর টাকা বেশী দেয়, তাহাদের প্রশংসায় তিনি একেবারে পঞ্চমুখ। বাহ্য আচরণ দেখিয়া মনে হয়, বাবাজী নিতান্তই এক অর্থলুব্ধ সাধু, গ্রাম্য পাকা বিষয়ীর মনোবৃত্তি নিয়াই এ ক্ষুদ্র আশ্রমটির পরিচালনা করিতেছেন।

অথচ ধনাঢ্য শেঠ ও রাজারাজড়াদের সম্মুখীন হইবার প্রস্তাব শুনিলেই বাবাজী মহারাজের মধ্যে দেখা যায় এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। কেহ আসিয়া হয়তো জানায়, বৃন্দাবনধামে এক দানশীল মহারাজা আসিয়াছেন। শহরের প্রসিদ্ধ মন্দির ও সাধুসন্তদের তিনি দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন—অবশ্যই তিনি বাবাজীর জন্যও ভেট ও পূজা নিয়া শীঘ্র এদিকে আসিবেন।

কথাটি শুনামাত্র ফুটিয়া উঠে বাবাজীর আর এক রূপ, ক্রোধে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। নবাগত মহারাজার সঙ্গে যেন দীর্ঘ দিনের শত্রুতা রহিয়াছে, এমনই তাঁহার মনোভঙ্গী। সরবে উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি কহিতে থাকেন, "শালা ইহা আওয়েগা তো এক চিমটা লাগা দেঙ্গে! হাম্ ক্যা উস্‌কা মর্যাদা করেঙ্গে? হামরা সাথ উস্‌কা ক্যা মতলব? চলা যা যমলোকমে। হামারী পিছে উহ্ কেঁও পড়তা হ্যায়?" অর্থাৎ—সে শালা এখানে এলে, এক চিমটার বাড়ি মেরে দেব। আমি কেন তার সম্মান ও অভ্যর্থনা করতে যাবো? মরুকগে সে ব্যাটা,—আমার পিছনে ঘুরবার তার কি দরকার?

উষ্মা শুধু এখানেই শেষ হয় না, আরও যে সব অশ্লীল ভাষা বাবাজী এই অচেনা অতিথির প্রতি প্রয়োগ করেন, তাহা শুনিলে অনেকেই কানে আঙুল দিবে।

তীর্থ দর্শনকালে বৃন্দাবনে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজ একদিন কেমারবন আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত। উদ্দেশ্য, ভারত-বিখ্যাত ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ কাঠিয়াবাবাজীর চরণ দর্শন।

কিন্তু আশ্রমে সর্বসমক্ষে সেদিন এক শোচনীয় দৃশ্যের অবতারণা হইল। এই সম্মানীয় অতিথিকে সামান্যতম সৌজন্য ও কৃপা প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে অকারণে নানা প্রকার গালাগালি দিয়া দূর করিয়া দিলেন। নিজের অমাত্য ও সঙ্গীদের সামনে এই অপ্রত্যাশিত অপমানে মহারাজা সেদিন একেবারে লজ্জায় মাটিতে মিশিয়া গেলেন।

রাজ-অতিথির কোন্ ত্রুটি বা ভুল সেদিন অন্তর্যামী কাঠিয়াবাবাকে এমন রূঢ় করিয়া তুলিয়াছিল তাহা কে বলিবে ?

আশ্রমের শ্রীবিগ্রহ ও কাঠিয়াবাবাজীর উদ্দেশে ভক্তেরা নানা দ্রব্যাদি উপস্থিত করিত। ভেটের এ সমস্ত বস্তুতে যাহাতে আশ্রমবাসী ভক্ত শিষ্যদের ভোগলিপ্সা না জন্মায় সেদিকে বাবাজীর সতর্কতার অন্ত ছিল না। এক শ্রেণীর মোহান্তের ধারণা, তাঁহাদের স্থাপিত বিগ্রহ ও আশ্রমের জন্য ভোগ্যবস্তুর যোগান দেওয়া গৃহস্থ ভক্তদের এক বড় কর্তব্য। বাবাজী কিন্তু এ মনোভাবকে বড় নিন্দনীয় মনে করিতেন। গৃহস্থদের প্রদত্ত বস্তুর প্রতি আশ্রমিকেরা যাহাতে প্রলুব্ধ না হয়, তাহার ব্যবস্থাও তাঁহাকে কঠোরভাবে, সতর্কতার সহিত করিতে দেখা যাইত। অধ্যাত্মসাধনার ব্যাপারে ভগবৎনিষ্ঠা ও আভ্যন্তরীণ শুদ্ধতার উপরই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন।

দূরে অবস্থিত ভক্তেরা ভেট হিসাবে আশ্রমে কাপড় চাদর ইত্যাদি পাঠাইত। বাবাজী এগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে সযত্নে লুকাইয়া রাখিতেন। দয়া করিয়া কখনো কখনো গৃহস্থ শিষ্যদের ইহার দুই একখণ্ড দান করিলেও আশ্রমবাসী সাধুদের অদৃষ্টে কোনো কালেই কিছু জুটিবার উপায় ছিল না। একান্ত প্রয়োজনের সময় বা অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায়ও তিনি তাহাদের ইহা দিতেন না। অনেক সময় দেখা যাইত, সঞ্চিত বস্ত্রাদি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার ফলে কীটদষ্ট হইয়া একেবারে অব্যবহার্য হইয়া গিয়াছে।

বলা বাহুল্য, তরুণ শিষ্যদের ভোগেচ্ছা দমনের জন্যই বাবাজী মহারাজের এই ব্যবস্থা। এজন্য অনেকের নিন্দা সমালোচনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত।

শেষ রাত্রে জাগিয়া উঠিয়া সাধন-ভজন ও আশ্রম-কর্ম করা সাধু ভক্তদের অবশ্য কর্তব্য। তাহাদের এ কাজকে সহজতর করিয়া তুলিতে বাবাজীর ছলাকলা ও কৌশলের—অন্ত ছিল না। অনেক সময় অযথা হৈ-চৈ তুলিয়া দিয়া বলিতেন, "রাত্রে আজকাল

চোরের বড় আনাগোনা, সতর্ক হয়ে সবাই সারারাত জেগে থাকো।”

রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই বাবাজী মহারাজ সকলকে আশ্রম-কার্যে লাগাইয়া দিতেন। এজন্য ছল করিয়া শেষ রাত্রিতে তিনি নিজের আহারের প্রথাও প্রবর্তন করেন। তাই বাধ্য হইয়াই সকলে সে সময়ে ঠাকুরসেবা ও ভোগরাগের বন্দোবস্তের জন্য তৎপর হইত। নিদ্রা সারা দিনে দুই-তিন ঘণ্টা, আর অন্নাহার দিবারাত্রির মধ্যে মাত্র একবার, ইহাই ছিল শিষ্যদের উপর বাবাজী মহারাজের নির্দেশ। লঘু ও অনলস দেহ নিয়া সাধনায় অগ্রসর হওয়ার উপরই তিনি অত্যধিক জোর দিতেন। অধ্যাত্মজীবনের শুদ্ধতা ও শুচিতা সম্পাদনেও তাঁহার সতর্কতার অন্ত ছিল না। সিদ্ধিকামী প্রকৃত সাধকদের কৃচ্ছ্র ও ত্যাগ-তিতিক্ষার দহনে পরিশুদ্ধ করিয়া নেওয়াই ছিল তাঁহার মূল নীতি।

কাঠিয়াবাবা ভারতবিশ্রুত মহাপুরুষরূপে কীর্তিত, কিন্তু তাঁহার আশ্রমটি নিতান্ত সাধারণ ও ক্ষুদ্রায়তন। উহার ভিতরকার ভজন প্রকোষ্ঠ এবং পরিবেশ ছিল বড় অদ্ভুত। হনুমানজীর এক পরম পবিত্র বিগ্রহ আশ্রমে স্থাপিত রহিয়াছে। এ বিগ্রহের কক্ষটি অতি অপরিসর। ইহার পাশে দুইটি ক্ষুদ্র অন্ধকারময় চোরকুঠরী। স্থানে স্থানে বহুতর গর্ত, গোখরো ও রক্তবংশী সাপের দল সেখানে স্বেচ্ছামতো ঘুরিয়া বেড়ায়। সম্মুখস্থ একফালি ছোট বারান্দার উপর রহিয়াছে বাবাজী মহারাজের নিজের শয়নের স্থান। প্রতিবেশী সর্পদলের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। উহাদের গতিবিধি ও মনোভাব এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ যেমন বুঝিতে পারেন, উহারাও তেমনি তাঁহার নির্দেশাদি নির্বিচারে মানিয়া নেয়।

প্রভাতে উঠিয়া কাঠিয়াবাবা হনুমানজী বিগ্রহের গায়ে সিঁদুর লেপন করেন, তারপর ফুলের মালা পরাইয়া দেন। কিন্তু প্রতিদিনই

প্রত্যূষে দেখা যায়, একটি প্রকাণ্ড দুর্ধর্ষ রক্তবংশী সাপ হনুমান-বিগ্রহের দেহটি জড়াইয়া পরমানন্দে নিদ্রিত রহিয়াছে। একটি লাঠির মাথায় কাপড় জড়াইয়া বাবাজী সস্নেহে সাপটিকে ধীরে ধীরে ঠেলিয়া দেন, আর বলিতে থাকেন, "আরে জল্‌দি হঠ্‌ যা, হঠ্‌ যা।"

সুখসুষুপ্তি ভঙ্গের পর নাগপ্রবর ধীরে সুস্থে নামিয়া গিয়া তাহার নিজ গর্তে অন্তর্ধান করে। বাবাজী মহারাজের নিত্যকার কৃত্যাদি ইহার পর শুরু হয়।

শুধু সর্পদল কেন, আশ্রমের বৃক্ষলতাদি হইতে শুরু করিয়া চড়ুই পাখিগুলিও যেন তাঁহার পরম বান্ধব। কোনো মানুষের সখ্য হইতে ইহাদের সখ্য এই মহাপুরুষের কম কাম্য নয়। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নেহসিক্ত হৃদয়ে তিনি ইহাদের সান্নিধ্যে গিয়া বসেন। বৃক্ষলতাদির গোড়ার মৃত্তিকা সযত্নে খুঁড়িয়া তাহাতে জল সিঞ্চন করেন, আবার পোষ্য চড়ুইদলের সম্মুখে রুটির টুক্‌রা ছড়াইয়া বসিয়া অপার সন্তোষে লক্ষ্য করেন তাহাদের আহার-পর্ব।

এই বিরাট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের প্রজ্ঞানঘন দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, চেতন ও অচেতন সব কিছু যেন একাকার হইয়া গিয়াছে। এক ও অখণ্ড বোধ সেখানে ওতপ্রোত, তাই সমস্ত কিছু ভেদবিভেদের গণ্ডিরেখা একেবারে হইয়াছে বিলুপ্ত।

কাঠিয়াবাবাজীর বাহ্যিক আচরণ, বিশেষত টাকাকড়ি বিষয়ে তাঁহার কৃপণতার অভিনয়, বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিত। কেহ কেহ সত্য সত্যই ভাবিত, বাবাজী মহারাজ অর্থাদি সম্পর্কে সর্বদা যেরূপ সচেতন, নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট গোপন ধন সঞ্চয় বেশ কিছু রহিয়াছে। আশ্রমের রসুইয়া পুষ্করদাস বড় অর্থলোভী, বহুদিন তাহার এমনি এক সন্দেহ বর্তমান ছিল। গুপ্তধন চুরি করার জন্য এ লোকটি তিন-চারবার কাঠিয়াবাবার প্রাণনাশেরও চেষ্টা করে।

সে-বার মঠে তিনজন বিশিষ্ট মোহান্তের আগমন হয়। বাবাজী মহারাজ ইহাদের সঙ্গে বসিয়া প্রচুর পরিমাণ ভাঙের শরবত পান

করেন। সুযোগ বুঝিয়া পুষ্করদাস ইঁহাদের পানীয়ের সহিত এ সময়ে বেশ খানিকটা আর্সেনিক বিষ মিশ্রিত করিয়া দেয়। মোহান্ত তিনজন কিছুক্ষণ বাদেই অচেতন হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়েন। অথচ প্রচুর বিষসহ ভাঙের শরবত পান করিয়াও কাঠিয়াবাবা মহারাজের কোনো নেশা বা ভাব বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় নাই।

সংজ্ঞাহীন এই মোহান্তদের দেহে তাড়াতাড়ি নিজ কমণ্ডলুর জল ছিটাইয়া দিয়া তিনি কি যেন এক প্রক্রিয়া করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের চেতনা ফিরিয়া আসিল।

অভ্যাগতের দল সন্দেহ করিলেন যে, পুষ্করদাসই সকলের অর্থ লুণ্ঠন ও প্রাণনাশের জন্য গোপনে বিষ দিয়াছে। দুষ্কৃতীকে তখনি তাঁহারা পুলিসের হাতে দিতে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু কাঠিয়াবাবাজী কিছুতেই রাজী নহেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা সবাই তো চেতনা লাভ করেছো, কোনো অনিষ্টই তোমাদের হয় নি। যে দুষ্ট, সে নিজেই কৃতকর্মের জন্য ফল ভোগ করবে। তবে তাকে পুলিসের হাতে দেবার কি প্রয়োজন?"

ক্রুদ্ধ মোহান্তগণ কিন্তু পুষ্করদাসকে ছাড়িয়া দিতে রাজি নন, তাঁহারা বার বার জোর করিতে লাগিলেন।

বাবাজী মহারাজ এবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ, তোমাদের যা অভিরুচি হয়, তাই করো। কিন্তু পুলিসের হাঙ্গামা বাধিয়ে কোনো ফল হবে না, এ কথা নিশ্চয় জেনো। আমি পুলিসকে বলবো, এক সাথে বসে একই ভাঙের শরবত আমিও পান করেছি। তোমাদের চাইতে অনেক বেশী পরিমাণেই পান করেছি। অথচ আমার তো কোনো অনিষ্ট হয় নি! দেখবে, তোমাদের অভিযোগ মোটেই টিকবে না, ফলে তোমরাই বরং উল্টো বিপদে পড়বে।"

অগত্যা মোহান্তেরা নিরস্ত হন। নির্বোধ, অর্থলোভী সেবককে কৃপাময় বাবাজী সেবার এমনি করিয়াই রক্ষা করেন।

ইহার পরও আর একবার এই রসুইয়া ব্রাহ্মণ কাঠিয়াবাবাজীকে

হত্যার চেষ্টা করে। সেবার সে বাবাজী মহারাজের রুটিতে বিষ গুলিয়া দেয়, আর নীরবে এ তীব্র বিষ হজম করিয়া ফেলিয়া বাবাজী পুষ্করদাসের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন। ঘটনাটি ঘটার বহু পরে শিষ্যদের তিনি এ কথাটি বলিয়াছিলেন।

একবার বাবাজী মহারাজ তাঁহার শিষ্যবর্গসহ আগ্রায় গিয়াছেন। পুষ্করদাসের জন্মভূমি এই অঞ্চলে। এখানকার পূর্ব পরিচিত কয়েকটি দুর্বৃত্তের সহযোগিতায় পুষ্করদাস আবার একদিন কাঠিয়াবাবাকে হত্যার সংকল্প করে।

বাবাজী মহারাজ সেদিন গভীর রাত্রে আসনের উপর নিদ্রিত রহিয়াছেন। এ সময়ে পুষ্করদাসের নিয়োজিত দুর্বৃত্তগণ এক উচ্চ স্থান হইতে তাঁহার নিদ্রিত দেহের উপর খুব ভারী প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া ফেলে। বাবাজী আহত হইয়াও লাঠি হস্তে এই দুষ্টদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকেন, ভয়ে তাহারা পলায়ন করে।

প্রস্তরের আঘাতে কাঠিয়াবাবার বাহুর একটি শিরা কাটিয়া যায় এবং দীর্ঘদিন তাঁহাকে ইহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়।

দুর্ঘটনার পরক্ষণেই কিন্তু দুষ্ট পুষ্করদাস তাহার গোপন স্থান হইতে আত্মপ্রকাশ করে, তারপর বাবাজী মহারাজকে বার বার সমবেদনা জানাইতে থাকে। ক্ষমাসুন্দর মহাপুরুষ হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এই পাচককে একটি কথাও সেদিন বলেন নাই। অতঃপর তাহাকে সঙ্গে নিয়া অবিলম্বে তিনি আগ্রা ত্যাগ করেন।

আশ্চর্যের বিষয় যে, এত কিছুর পরও কাঠিয়াবাবা মহারাজ তাহার এ কুখ্যাত রসুইয়াটিকে ত্যাগ করেন নাই। শুধু তাহাই নয়, পাপকার্যের জন্য এই দুষ্কৃতকারীকে নিজে তিনি কোনোদিন ভর্ৎসনাও করেন নাই। পূর্ববৎ সহজভাবে সে আশ্রমে চলাফেরা করিত, আর রন্ধনকার্যের ভারও ছিল তাহার উপরই ন্যস্ত।

পুষ্করদাসের এ সব জঘন্য অপরাধের প্রতি বাবাজী মহারাজের ছিল এক উদাসীন ও নির্বিকার ভাব। অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে এটা কিন্তু বড় দুর্বোধ্য ছিল। এ পাপাচারীকে কেন তিনি উপযুক্ত শাস্তি

দিতেছেন না, ভক্ত তারাকিশোর (সন্তদাসজী) একবার এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেন।

কাঠিয়াবাবাজী উত্তরে বলেন, "আচ্ছা বাবা, কেউ কি কাউকে সত্যি সত্যিই দুঃখ দিতে পারে? আপন আপন কর্ম অনুসারেই আমাদের সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাছাড়া, ভেবে দেখ, পুষ্করদাস আমার কি কোনো ক্ষতি সাধন করতে পেরেছে? আমি তো এক ও অখণ্ড সর্বদাই রয়েছি। সেই যে সত্যিকার 'আমি', পুষ্করদাস তার কোন্ অনিষ্ট করবার ক্ষমতা রাখে?—তবে আমি ওকে আশ্রম থেকে বার ক'রে দেব কেন? তিরস্কারই বা করবো কেন? বাবা, তোমায় আমি সত্যি বলছি—আমার শরীরে সুখ-দুঃখের কোনো কিছু খবর নেই, কোনো কিছু বৈলক্ষণ্যও এতে নেই।"

হতবাক্ হইয়া তারাকিশোরবাবুর এই দেব-মানবের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

পুষ্করদাসের অর্থগৃধ্নুতা ক্রমেই কিন্তু বাড়িয়া চলিল। তাহার দৃঢ় ধারণা,—কাঠিয়াবাবাজীর কোমরের আড়বন্ধের মধ্যেই সঞ্চিত ধন লুক্কায়িত রহিয়াছে; তাঁহার প্রাণনাশ করিলেই সে উহা হস্তগত করিতে পারিবে।

শেষ চেষ্টা হিসাবে একদিন সে বাবাজী মহারাজের রুটির সঙ্গে আর্সেনিক বিষ মিশাইয়া দিল। পরিমাণ প্রায় দুই ভরি। এবারকার পরিস্থিতিটি বড় জটিল হইয়া পড়ে। বাবাজী মহারাজ এ বিষক্রিয়ার ফলে মাটিতে পড়িয়া যান ও মস্তকে গুরুতর আঘাত পান। পাকস্থলীর গোলযোগও চরমে উঠে।

পেট ফাঁপিয়া উঠিবার ফলে বাবাজী মহারাজ কোমরের কাঠের আড়বন্ধের চাপ সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। সেবকেরা সেদিন তাঁহার অনুমতি নিয়া ঐ আড়বন্ধটি করাত দিয়া চিরিয়া ফেলে। বলা বাহুল্য, খণ্ডিত কাষ্ঠ-বন্ধনীর মধ্যে গুপ্ত সোনাদানার কোনো সন্ধান না পাইয়া পুষ্করদাসকে হতাশ হইতে হয়।

কাঠিয়াবাবার গুরুতর পীড়ার সংবাদে তারাকিশোরবাবু ব্যস্তসমস্ত হইয়া কলিকাতা হইতে বৃন্দাবনে ছুটিয়া যান।

বাবাজীর সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্র প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদের কিন্তু বলেন, "সে কি কথা ? কাঠিয়াবাবাজীর সিদ্ধ দেহে রোগ হবার তো কোনো সম্ভাবনা নেই। নিশ্চয় কোনো সাধু তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছে।" তারাকিশোর গোঁসাইজীর এই কথা শুনিয়া আসিয়াছেন, বড় উৎকণ্ঠিতও হইয়াছেন।

বাবাজী মহারাজের রোগশয্যার পাশে পৌঁছিয়াই তারাকিশোরবাবু তাঁহাকে গোঁসাইজীর ঐ মন্তব্যটির কথা বলেন। বাবাজী এবার সহাস্যে কহিতে থাকেন, "দেখো, দেখো কলকাত্তামে হী রয়কে মহাত্মাকো ক্যায়সা ইঁহাকা খবর মিল্ গিয়া। হাঁ বাবা, পুষ্করদাসনে ইস বার দো ভরি সঁখিয়া হামকো রোটিকে সাথ দে দিয়া। অব্ হামারা শরীর বুঢ্ঢা হো গিয়া। ইস্ ওয়াস্তে সঁখিয়া ভী শরীরকে ইয়ে বহুৎ বড়া দুখ্ দিয়া"—অর্থাৎ, দেখ, কলকাতায় বসে থেকেও মহাত্মা এখানকার খবর কেমন পেয়ে গিয়েছেন। ঠিক কথাই তিনি বলেছেন। এবার পুষ্করদাস আমার রুটির সঙ্গে দু ভরি শঙ্খিয়া বিষ (আর্সেনিক) দিয়েছিল। আজকাল আমার শরীর বৃদ্ধ ও অপটু, কাজেই শঙ্খিয়া বিষ এটাকে কষ্ট দিতে পেরেছে।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, এত কিছু অপকর্মের নায়ক, পুষ্করদাস তখনও আশ্রমের রন্ধনকার্যে পূর্ববৎ নিযুক্ত রহিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, রোগশয্যায় শায়িত কাঠিয়াবাবার পথ্যাদি দিবার সব কিছু দায়িত্বও তাহারই উপর ন্যস্ত।

তারাকিশোর ও অন্যান্য শিষ্যগণ এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবার জোর আন্দোলন চালান—এ দুরাত্মাকে এখনই আশ্রম হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। বাবাজীকে তারাকিশোর সকলের এ অভিমত স্পষ্টরূপে জানাইয়া দিলেন।

কাঠিয়াবাবা উত্তরে বলিলেন, "বেটা, অব্ ইস্‌কা ভ্রম সব মিট গিয়া। ইস্‌কা মন্‌মে থা কি হামারি আড়বন্ধকা ভিতর বহুত সোনেকা

আশরফি হ্যায়, আর হামকো মার্‌কর্‌ উহ্‌ সব লেলেগা। অব্‌ আড়বন্ধ কাট গিয়া—উস্‌কা ভ্রম ভী মিট্‌ গিয়া!—লেকিন তুমহারী মর্জি হোয় তো ইসকো অবহী নিকাল দেও।" অর্থাৎ—বাবা, এর ভ্রম এবার একেবারে দূর হয়েছে। এ মনেভেবেছিল, আমার কোমরের আড়বন্ধের ভেতর বহু মোহর লুকানো আছে। আমায় মেরে ফেলে সব কিছু অধিকার ক'রে বসবে—এই অভিসন্ধিই এর ছিল। আড়বন্ধ কেটে ফেলার পর সে ধারণা এখন আর নেই। তবে তোমাদের সকলের যদি অভিমত হয়, তবে একে এখনি এই আশ্রম থেকে বার ক'রে দাও।

ইহার পর কি যেন ভাবিয়া কাঠিয়াবাবা নিজেই পুষ্করদাসকে বিতাড়িত করিতে গেলেন। উত্তেজিত স্বরে তাহাকে কহিলেন, "তুম্‌সে রসোই কুছ নহীঁ বন্‌তা হ্যায়। হর বখৎ তুম্‌ রসোই মে জ্যাদা রামরস ডাল্‌ দেতে হো—ঔর তুম্‌ হামকো জহর ভী পিলায়া। তুম্‌ আশ্‌রম্‌মে আওর মৎ রহনা। আভী ইহাসে নিকাল যাও!" অর্থাৎ, তোমাকে দিয়ে রান্না ঠিকমত হবার যো নেই। সর্বদা তুমি রান্নায় অত্যধিক নুন দাও—তাছাড়া তুমি আমায় বিষও খাইয়েছ। যাও, এ আশ্রমে তুমি থাকতে পাবে না, এখনই বিদায় হও।

পুষ্করদাস বুঝিল, আশ্রমের সকলে এবার তাহার উপর ক্ষেপিয়া গিয়াছে, আর এখানে তাহার থাকিবার উপায় নাই। নতশিরে সকলের সম্মুখ দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

আশ্রমিকগণ তখন সবিস্ময়ে কেবলই কাঠিয়াবাবাজীর কথাগুলি ভাবিতেছিলেন। আহার্যের মধ্যে অত্যধিক নুন মিশ্রণ ও বিষ প্রয়োগ যাহার নিকট সমান, সে মহাপুরুষের মহিমা ও অধ্যাত্মশক্তির পরিমাপ কে করিবে?

বাবাজীর সমদর্শিতার আরও নানা বিচিত্র কাহিনী রহিয়াছে। একবার এক তীর্থকামী দেশীয় নৃপতি বৃন্দাবনে আসিয়া কিছুদিন বাস করেন। বাবাজী সম্বন্ধে বহুতর অলৌকিক কাহিনী শুনিয়া ইনি তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হন।

এই মহারাজটি খুব ভক্তিপরায়ণ। তাছাড়া, সাধুসেবায় তাঁহার আন্তরিকতার অবধি নাই। সাদর আমন্ত্রণ পাইয়া বাবাজী সেদিন তাঁহার ভবনে গিয়া উপস্থিত। সমারোহের সহিত মহারাজা তাঁহার সংবর্ধনা করিলেন, শ্রদ্ধাভরে বহু বস্তু ভেট দিলেন।

রাজঅতিথি বাবাজী মহারাজকে কিন্তু কিছুক্ষণ পর এক অদ্ভুত আচরণ করিতে দেখা গেল। বিদায় নিয়া প্রাসাদ হইতে তিনি বাহির হইতেছেন, হঠাৎ নৃপতির এক দারোয়ানের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। লোকটি বড় ধর্মনিষ্ঠ ও ভক্তিমান্—ভাগ্যবান্ও সে বটে, কারণ অযাচিতভাবে সেদিন কাঠিয়াবাবা তাহাকে যে কৃপা প্রদর্শন করেন, সবাই তাহা দেখিয়া বিস্মিত হয়।

লোকটি ভক্তিভরে বাবাজীকে প্রণাম করিল, আর সদানন্দময় মহাপুরুষ অমনি তাহার পাশে রাজভবনের দ্বারদেশে বসিয়া পড়িলেন। থলিয়া হইতে কল্‌কে ও গাঁজার মোড়ক খুলিয়া ছিলিম সাজা হইল। তারপর দারোয়ানের সঙ্গে বসিয়া বাবাজী ছিলিমের পর ছিলিম উড়াইতে লাগিলেন। সকলে তো অবাক্। খোসগল্প ও হাসি তামাশা দেখিয়া মনে হইবে, লোকটি তাঁহার অন্তরঙ্গ বয়স্য।

কিছুক্ষণ এইভাবে গঞ্জিকা সেবন ও আনন্দরঙ্গে কাটানোর পর তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

রাজা বাহাদুর এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ চুপচাপ দাঁড়াইয়া এতক্ষণ বাবাজী মহারাজের এই বিচিত্র লীলা দেখিতেছিলেন। বলা বাহুল্য কাহারো বুঝিতে বাকী রহিল না, সমদর্শী মহাপুরুষের দৃষ্টিতে রাজা ও রাজভৃত্যের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই।

ব্রহ্মবিদ্ কাঠিয়াবাবার বালকবৎ ভাবটিও ছিল বড় মনোহর। একদিন স্নানান্তে তিলক কাটিবার পর একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। নিকটস্থ এক ভক্ত তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাঃ বাঃ! মহারাজ, আজ আপনাকে বড় খুবসুরত দেখা যাচ্ছে।"

শিশুসুলভ আনন্দে বাবাজী যেন গলিয়া গেলেন। সোৎসাহে

বার বার সবাইকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিতে লাগিলেন, “এছাড়া আমার একটা বনাতের আল্‌ফি আছে, সেটা যখন আমি পরি, তখন যে কি খুবসুরত আমায় দেখায়, তা তো কেউ দেখো নি। একবারটি দেখলে বুঝতে পারতে—কি চমৎকার !”

ত্রিপুরার রাজবাড়ির মেয়েরা সূচীশিল্প সমন্বিত একটি সুদৃশ্য চাদর কঠিয়াবাবাকে ভেট পাঠাইয়াছেন। রঙীন চটকদার বস্তুটি দেখিয়া বাবাজীর আনন্দ আর ধরে না। প্রচণ্ড উৎসাহের চোটে উহা শালের মতো করিয়া গায়ে দিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “আমি এটা এমনি গায়ে জড়িয়ে রাখবো—আর বৃন্দাবনের সবাইকে এখনই দেখিয়ে আসবো !”

ব্রজবাসীমাত্রেই তাঁহার পরম সখা ! তাই এ বস্তু তাহাদের না দেখালেই বা চলিবে কেন ? যে কথা সেই কাজ। বাবাজী বালকের মতো আহ্লাদে আটখানা হইয়া ছুটিতে ছুটিতে নিকটস্থ বাজারে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এবার গর্ব করিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন, “দ্যাখো দ্যাখো, এই সুন্দর কাপড়খানা আমার জন্য ভেট এসেছে। আর জানো ? ত্রিপুরার রাজবাড়ির মেয়েরা এটা আমার জন্য বুনে দিয়েছে ! হাঁ, তারা নিজ হাতে বুনেছে।”

বাজারের ব্রজবাসীরাও বাবাজী মহারাজের এই বালকপনায় পরম আনন্দিত। বার বার আশ্বাস দিয়া, মাথা নাড়িয়া, তাহারা কহিতে লাগিল, “সত্যি মহারাজ, এ কাপড়খানা বড় চমৎকার হয়েছে। এ রকমটি আর কোথাও দেখা যায় না !”

সেদিন ভোরে আশ্রম সীমানায় গোলমাল শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। দেখা গেল, প্রতিবেশী আখড়ায় কোনো একটি বালক-সাধুর সঙ্গে কাঠিয়াবাবা মহারাজ তুমুল ঝগড়া শুরু করিয়া দিয়াছেন। বাবাজীর আশ্রম হইতে সে কিছু ডালিম পাতা নিতে আসিয়াছে, কি একটি ঔষধে নাকি তা ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু বাবাজীর ধনুর্ভঙ্গ পণ—কিছুতেই তিনি ডালিম পাতা কাটি নিতে দিবেন না।

বালকের সঙ্গে সমভাবে প্রচণ্ড ঝগড়া করিয়া চলিলেন, যেন এই পাতা ক'টির উপরই সেদিন তাঁহার আশ্রমের বাঁচা-মরা সব নির্ভর করিতেছে।

বাবাজী চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কেন তুমি এ পাতা ছিঁড়বে ? আমার গাছ ছোট—কিছুতেই এ দেওয়া হবে না। চোখের মাথা কি খেয়ে বসেছো ? অন্য কোথাও যেতে পারো না !"

বালকটিও ছাড়িবার পাত্র নয়। উত্তেজিত হইয়া সে গালাগালি শুরু করে, বাবাজীও সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ অশ্লীল গালি দেন।

বাগানের প্রান্ত হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া এবার তিনি ছিলিম সাজিলেন। আশ্রমের ভক্তদের শুনাইয়া শুনাইয়া সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন, "আমার ডালিম গাছের পাতা নিয়ে চলে যাবে ! ইস্, এত সহজেই নেওয়া যায় আর কি ? দেখলে তো। আমিও ওকে ছেড়ে দিই নি। জোর গালি দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি !"

এখনি একটা যুদ্ধ জয় করিয়া এবং প্রকাণ্ড সম্পদ বাঁচাইয়া তিনি গৃহে ফিরিয়াছেন—ভাবটা ঠিক এমনই !

আবার এই মহাত্মার মধ্যেই দেখা যায় এই সহজ বালক ভাবেরই এক বিপরীত রূপ। অধ্যাত্ম-শক্তির ধারক ও বাহক—এক মহা-শক্তিধর যোগীরূপে তিনি তখন শিষ্যদের সম্মুখে বিরাজমান।

কাঠিয়াবাবার শিষ্য, সন্তদাস মহারাজ সে সময়ে আধ্যাত্মিক সাধনার নানা স্তর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। কুণ্ডলিনী শক্তির ঊর্ধ্বগতির প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় বিব্রত হইয়া বাবাজীকে একদিন তিনি কহিলেন, "মহারাজ, আমার বুকের ভেতর শক্তি যেন বেধে যাচ্ছে।"

বাবাজী মহারাজ, নিতান্ত সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "হাঁ—হাঁ, উহা কমল রহ্‌তা হ্যায়, উহ্ রোক দেতা হ্যায়।" অর্থাৎ ঐ স্তরে চক্র বিরাজিত রয়েছে, শক্তির ঊর্ধ্বগতিতে তাই তো এমন ক'রে আজ ওখানে বাধা পড়ছে।

সাধক তারাকিশোর ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেন, গ্রন্থির এ বাধা কি গুরুদেব কৃপা করিয়া ছাড়াইয়া দিবেন না ?

কাঠিয়াবাবা অমনি শিষ্যকে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, কিছুতেই একাজ করিতে এখন তিনি রাজী নন। ইহার কারণও তিনি কিয়ৎপরে জানাইয়া দিলেন— এখনি যদি এ গ্রন্থি ছাড়াইয়া দেন, তবে শিষ্যের পক্ষে ঈশ্বরনির্দিষ্ট কোনো কাজ করা আর সম্ভব হইয়া উঠিবে না। অথচ গুরুজী জানেন, সংসারে এই শিষ্যের যে যথেষ্ট কর্ম রহিয়াছে। সময় আসিলেই তিনি এই গ্রন্থিভেদ করাইয়া দিবেন, এ আশ্বাসও তাঁহাকে তিনি দিলেন।

রঙীন কাপড় ভেট পাইয়া বালকের মতো আনন্দে যিনি বাজারে ছুটিয়া যান, কয়েকটা কচি ডালিম পাতার জন্য প্রতিবেশী বালকের সঙ্গে যিনি মুহূর্তে তুমুল বিরোধ বাধাইয়া বসেন—এ আবার তাঁহার কোন্ অলৌকিক যোগবিভূতিময় রূপ !

শক্তিধর গুরুরূপে তাঁহার এ প্রকাশটি বড় মহিমময়। চিন্ময় লোকের চাবিকাঠি যে রহিয়াছে তাঁহারই হাতে, তাই সাধক শিষ্যের গ্রন্থিভেদ অবলীলায় তিনি করাইতে পারেন !

কাঠিয়াবাবাজীর এই বালকবৎ ভাব, এই লীলা অভিনয়, দেখিয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ত্ব অনেক সময় বুঝিয়া উঠা কঠিন ছিল। তিনি যে এক অসাধারণ যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ তাহা অনেক দর্শনার্থীর ধারণায় আসিত না। আবার এই মহাসমর্থ যোগীর অন্তর-সত্তায় প্রেমযমুনার অমৃতধারাটি যে সদা তরঙ্গিত হইত, সে সংবাদই বা কয়জন রাখিত ?

সন্তদাসজীর লেখনীতে ইহার এক অপরূপ আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে সেদিন আশ্রমের ঠাকুর শ্রীবিহারীজী ও শ্রীরাধিকাজীকে নিয়া বৃন্দাবন ধামে শোভাযাত্রা হইতেছে। হঠাৎ দেখা গেল, কাঠিয়াবাবাজীর প্রতি রোমকূপ হইতে অবিশ্রান্ত ধারায় বাহির হইতেছে ঘর্মস্রোত সন্ত দাসজী তাড়াতাড়ি পাখা নিয়া গুরুদেবকে ব্যজন করিতে বসিলেন।

বাবাজী তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া হাস্যভরে বলিতে লাগিলেন, "বেটা, যা ভাবছো তা নয়। এ কিন্তু গ্রীষ্মের ঘাম নয়, হাওয়া ক'রে একে নিবারণ করা যাবে না। আসলে এ হচ্ছে এক প্রকার প্রেমজ্বর। শ্রীরাধিকাজী বিগ্রহের চারদিকে বৃন্দাবনের গোপীদের দর্শন করাতেই এ প্রেমজ্বরের উৎপত্তি। এরূপ প্রেমজ্বর আমার এই প্রথম নয়, আরও অনেকবার হয়েছে। একবার এ দেহে এটা প্রায় একমাস কাল অবধি ছিল, কিন্তু তখন শরীর থেকে জল বিন্দুমাত্রও নির্গত হয় নি, সমস্ত শরীর আগুনের মতো উত্তপ্ত থাকতো। তাছাড়া, শরীরের রোম আর জটা অহর্নিশি কাঁটার মতো খাড়া হয়ে থাকত।"

চাক্ষুষভাবে সেদিন প্রেমের এ সাত্ত্বিক বিকার দর্শনে সন্তদাসজীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

উচ্চকোটির সিদ্ধ সাধকগণ কাঠিয়াবাবাজীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করিতে আসিতেন। মহাপুরুষের প্রকৃত মহিমা প্রধানত ইহাদেরই ছিল বোধগম্য। এই সাধকদের আচরণ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়া অনেক সময় বাবাজী মহারাজের অধ্যাত্মজীবনের রেখাচিত্র কিছুটা ফুটিয়া উঠিত।

যত বড় সাধক বা ব্রহ্মজ্ঞপুরুষই কাঠিয়াবাবার নিকট উপস্থিত হোন না কেন, বাবাজীর ভাবভঙ্গী ও আচরণে সাধারণত কোনো তারতম্য দেখা যাইত না।

বৃন্দাবনে যোগবিভূতিসম্পন্ন এক ক্ষুদ্রকায় সাধু বাস করিতেন। ইঁহার বয়সের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সাধকসমাজে প্রসিদ্ধি ছিল এবং এজন্য অনেকে তাঁহাকে কল্পান্তী নামে অভিহিত করিতেন। বিভিন্ন মঠ ও সাধুর আখ্‌ড়ায় এই মহাপুরুষের তখন খুব মর্যাদা। কিন্তু ইঁহার সহিত কাঠিয়াবাবার আচরণ ছিল নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক। আর পাঁচজন লোকের সঙ্গে যেমন ব্যবহার তিনি করিতেন, এই মহাত্মার সহিতও ছিল তেমনই ব্যবহার।

কাঠিয়াবাবার সহিত পরিচিত হইবার পর, বৃন্দাবনে থাকা কালে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে আশ্রমে উপনীত হইতেন। উদ্দেশ্য,

বাবাজীর চরণ দর্শন করা। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, উভয়ের মধ্যে কোনো কথাবার্তা প্রায়ই হইত না। গোস্বামী-প্রভু বাবাজী মহারাজকে ভক্তিভরে দণ্ডবৎ করার পর অপর সকলের সঙ্গে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতেন; তারপর প্রণামান্তে আবার তেমনি মৌনভাবে তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখা যাইত।

উভয়ের মধ্যে কোনো কথাবার্তা বা তত্ত্বালোচনা হয় না, ইহা লক্ষ্য করিয়া জনৈক ভক্ত গোস্বামীজীকে প্রশ্ন করেন।

উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি তো বাবাজী মহারাজের সঙ্গে রোজই আলাপ ক'রে যাচ্ছি? তিনি যে মৌনী থেকেই আমার সব প্রশ্নের উত্তর দেন আমায় প্রেরণা যোগান। বাইরের কোনো লোকের কথাবার্তা যেমন আমি শুনি, বাবাজীর নীরব বাণী আর তাঁর নির্দেশ আমি তেমন স্পষ্টরূপে বুঝতে পারি।"

পরমহংসজী নামে এক প্রাচীন সিদ্ধপুরুষ ব্রজভূমি অঞ্চলে বাস করিতেন। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধু বলিয়া তাঁহার বিরাট খ্যাতি ছিল। একবার ব্রজপরিক্রমার সময়ে সাধু জমায়েতের সঙ্গে এই পরমহংসজীও আসিয়া উপস্থিত। বড় বড় মোহান্ত ও সাধকদের নিকট ইহার ছিল অসামান্য মর্যাদা। একদিন কাঠিয়াবাবার তাঁবুতে শ্রীবিহারীজীর আরতি হইতেছে, এমন সময় ঐ পরমহংসজীকেও সেখানে দেখা গেল। আরতি অন্তে তিনি কাঠিয়াবাবা মহারাজকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

আশ্রমের শিষ্যদের মধ্যে দু-একজন এ সময়ে এই পরমহংসজীকে উপযুক্ত আদর আপ্যায়ন করিতে ইচ্ছুক হন। বাবাজী মহারাজের নিকট এ প্রস্তাব তখনি জানানো হইল। নিতান্ত নিরস ভঙ্গীতে তিনি বলিলেন, "বেটা পরমহংসজীকে সমাদর জ্ঞাপনে আমার নিজের দিক দিয়ে কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি কেন, তাঁর গুরুদেব এলেও তাঁকে আমার আসনের কাছে সংবর্ধনা ক'রে আনতে আমি যেতুম না। তবে তোমাদের যদি তাঁকে ভালো লেগে থাকে, তাহলে ডাকতে পার। আমাদের এখানে তো তামাক, গাঁজা, সুল্‌ফা, ভাঙ সব

রয়েছে, তাঁর আদর আপ্যায়ন করো। আমার দিক দিয়ে কোনোই বারণ নেই।"

এ কথা শোনার পর পরমহংসজীকে সংবর্ধনা জানানোর উৎসাহ আর কাহারো রহিল না। দেখা গেল, ঐ মহাসমর্থ সাধু, প্রাচীন অন্যান্য সাধারণ ভক্তদের মতোই, দূর হইতে কাঠিয়াবাবার আসনের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া, আর একবার তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বাবাজী মহারাজ সে-বার কলকাতায় আসিয়াছেন। এ সময়ে কয়েকজন শিষ্যসহ ভোলাগিরিজী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। গিরি মহারাজের খ্যাতি প্রতিপত্তি তখন চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু এই বহুলখ্যাত মহাপুরুষের আগমনে কাঠিয়াবাবার আচরণে কোনো তারতম্যই লক্ষিত হইল না। নির্বিকারভাবে বিপরীত দিকে মুখ করিয়া তিনি নিঃশব্দে শয়ন করিয়া রহিলেন।

ভোলাগিরিজী কক্ষে ঢুকিয়াই করজোড়ে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। বাবাজীর সহিত তাঁহার সামান্য কিছু কথাবার্তা হইল। অতঃপর দুই-চারিজন ভক্তের অনুরোধে গিরিমহারাজ তাঁহাদের কিছু তত্ত্বোপদেশ দিলেন। কাঠিয়াবাবা এসময়ে স্মিতহাস্যে সংক্ষেপে শুধু বলিলেন, "এ-রকম উপদেশের ফল কিছু আছে কি? শ্রোতাদের জীবনে এসব কি কোনো কার্যকরী হবে?"

মাননীয় অতিথির এবার বিদায় গ্রহণের পালা। কাঠিয়াবাবা শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবার ভোলাগিরিজীর কাঁধে হাত রাখিয়া তিনি তাঁহার সাথে নানা হাস্যকৌতুক করিতে লাগিলেন—গিরিমহারাজ যেন তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ বয়স্য।

কুম্ভমেলার সময় কাঠিয়াবাবা মহারাজের তাঁবুতে অগণিত সাধুর সমাবেশ হইতে দেখা যাইত। বহু সিদ্ধদেহ সাধক এ মহাপুরুষের চরণ দর্শনে অভিলাষী হইয়া সেখানে উপস্থিত হইতেন। এই সব সমর্থ সাধুদের উপস্থিতিতেও বাবাজীর আচরণে কিন্তু কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা যাইত না। সাধারণ দর্শনার্থীদের তিনি যেমন হস্ত উত্তোলন করিয়া

আশীর্বাদ জানাইতেন, আগন্তুক মহাপুরুষদের বেলায়ও ছিল তেমনি তাঁহার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

১৩১৬ সালের ৮ই মাঘ। ঘন শীতের কুহেলীতে সারা ব্রজধাম ছাইয়া গিয়াছে। গভীর রাত্রিতে চারিদিক সুপ্তিমগ্ন। কাঠিয়াবাবাজীর প্রতীক্ষিত মহাপ্রয়াণের লগ্নটি সেদিন সমাগত।

মধ্য রাত্রিতে উঠিয়া বাবাজী মহারাজ তাঁহার সেবক রামফলকে ডাকিয়া কিছুটা পানীয় জল চাহিলেন। পান শেষে সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "রামফল, লে ভাই। তোরা হাথ্‌কা জলভী অব্‌পী লিয়া। তু শো যা, হামভী অব্‌ যায়েঙ্গে।"

মহাপুরুষের মহাযাত্রার এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ভক্ত রামফল কি করিয়া বুঝিবে? রাত জাগিয়া এ কয়দিন গুরু মহারাজের সেবা করিতে হইয়াছে, দেহ তাহার বড়ই ক্লান্ত। অতঃপর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িল।

একটু পরেই আশ্রমের দুইটি ভক্ত সাধক হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর জাগিয়া উঠিয়াছেন। উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন, আশ্রমের অঙ্গন এক অপূর্ব দিব্য জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখনই বাবাজী মহারাজের কক্ষে তাঁহারা ছুটিয়া গেলেন। দেখিলেন, মরদেহ ত্যাগ করিয়া তিনি অমৃতলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

কাঠিয়াবাবা মহারাজের মানসসন্তান, পরমপ্রিয় শিষ্য সন্তদাসজী এ সংবাদ পাইয়া দুই দিন পরে বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন।

আসিয়া দেখিলেন, গুরু মহারাজ দেহরক্ষা করিবার পর সমগ্র আশ্রমটি যেন প্রাণশক্তিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। আশ্রমপতির অদর্শনে গাভীগুলিও শোকাকুল, চোখে তাহাদের নিরন্তর অশ্রু ঝরিতেছে। আশ্রমের বিগ্রহে—শ্রীরাধিকাজীর কপোলেও গড়াইয়া পড়িতেছে ফোঁটা ফোঁটা নয়নবারি।

আর একটি অলৌকিক দৃশ্যের কথাও সন্তদাস মহারাজ তাঁহার গুরুজীর জীবনচরিতে লিখিয়া গিয়াছেন,—"স্থানীয় প্রথানুসারে

ত্রয়োদশ দিবসে শ্রীযুক্ত বাবাজী মহারাজের উদ্দেশে ভাণ্ডারা করা হয়। সেই দিবস হইতে আশ্রমস্থ শ্রীরাধিকাজীর নেত্র হইতে অশ্রুর ন্যায় রসধারা প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হয় এবং উভয় দেবমূর্তির মলিন ভাব অদৃশ্য হয়। পূর্বোক্ত প্রকার রসধারা কয়েক দিবস ধরিয়া বিগলিত হওয়াতে শ্রীরাধিকার নেত্র কিঞ্চিৎ বিরূপ হইয়া যায়। তজ্জন্য তাহা পরিবর্তন করিয়া অন্য নেত্র বসাইতে আমরা বাধ্য হইয়াছিলাম।"

মর্ত্যলোকচারী দেবমানব কাঠিয়াবাবার তিরোধানে চৈতন্যময়ী দেবীবিগ্রহের এ এক অত্যাশ্চর্য বিরহ-লীলা।

বামাক্ষেপা

নিঝুম নিশীথ রাত্রি। নাটোরের রাজপ্রাসাদে রানী গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছেন। সহসা এক দুঃস্বপ্ন দেখার পর তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভয়ে বিহ্বল হইয়া পালঙ্কে উঠিয়া বসিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—একি ভয়ঙ্কর কথা! তারাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—মা-তারা আজ চারদিন যাবৎ উপবাসী!

স্বপ্নযোগে দেবী এইমাত্র তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন। আননে তাঁহার বিষাদের ছাপ, সকাতরে বলিলেন, "যুগযুগান্ত ধরে এ সিদ্ধপীঠে আমি বিরাজ করছি। কিন্তু এবার দেখছি, বিদায় না নিয়ে আর উপায় নেই। মন্দিরের পুরোহিত আর তোমার দারোয়ান আমার প্রিয় পুত্র ক্ষেপাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে। তাদের এ আঘাত পড়েছে আমারই গায়ে—এই ছাখো, আমার পিঠে রক্তের দাগ। আর এ প্রহার বড় তুচ্ছ কারণে। মন্দিরে আমার বিগ্রহের কাছে তখন ভোগ নিবেদন করা হয়েছে। আমার পাগল ছেলেকে ডেকে বললাম—ক্ষেপা আয়, আমার সঙ্গে খাবি। তাই সে মন্দিরে ঢুকে খেতে বসেছিল। এই তার অপরাধ! ক্ষেপাকে আজ চারদিন প্রসাদ দেয় নি, অনাহারে সে শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরে, ছেলে না খেলে কি, মা খেতে পারে? তাই আমিও রয়েছি উপবাসী।"

রানী বেদনার্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। তারপর তাঁহার মিনতি শুনিয়া দেবী কহিলেন, "আচ্ছা, আমি তারাপীঠ ছেড়ে যাবো না। কিন্তু এখন থেকে ব্যবস্থা কর, রোজ আমার ভোগের আগে আমার প্রিয় পুত্র ক্ষেপাকে খেতে দেওয়া হবে।"

বলা বাহুল্য, রানী তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন—এখন হইতে তারাপীঠে ভোগ নিবেদনের আগে দেবীর এই নির্দেশই পালিত হইবে। তাছাড়া, ক্ষেপার সেবা-পরিচর্যায়ও আর কখনো কোনো ত্রুটি হইবে না।

ভয়ে বিস্ময়ে সে রাত্রির মতো রানীর ঘুম টুটিয়া গিয়াছে। শয্যায় শুইয়া বার বার কেবলই এই স্বপ্নের কথা তিনি মনোমধ্যে আলোড়ন করিতেছেন। তাছাড়া, আরও ভাবিতেছেন—কে এই ক্ষেপা? কি মহা ভাগ্যবান্ সাধক সে! ব্রহ্মময়ী তারামায়ের সে আদরের দুলাল হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ব একান্তকতা এই ক্ষেপার সহিত জগজ্জননী তারাদেবীর! নহিলে তাহার পিঠের আঘাত মায়ের দিব্য অঙ্গে কেন এমন করিয়া লাগে?

প্রত্যূষেই নাটোর প্রাসাদে দেওয়ানজীকে আহ্বান করা হইল। অশ্রু ছলছল চোখে রানী তাঁহার স্বপ্নের কাহিনী বিবৃত করিলেন। তারপর কহিলেন, "কত ক্ষতি স্বীকার ক'রে নাটোরের নিজস্ব মৌজার বিনিময়ে রাজা আসাদুল্লা খাঁর মৌজা তারাপীঠকে এই রাজসরকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সিদ্ধ পীঠের কোনো অবমাননা না হয়, মায়ের সেবায় কোনোরূপ বিঘ্ন না হয়, সেজন্যই এটা করা হয়েছিল। অথচ আমাদেরই সেবা-ব্যবস্থার মধ্যে থেকে মা আমার আজ চারদিন যাবৎ উপবাসী!"

রাজসরকারের হুকুম ও নির্দেশাদিসহ দুইজন বিশিষ্ট কর্মচারী ভোরবেলায়ই তারাপীঠে রওনা হইয়া গেলেন। সঙ্গে চলিল পূজা ও ভোগের প্রচুর উপকরণ।

দেবীর স্বপ্নাদেশ আর রানীর হুকুম শুনিয়া তারাপীঠের সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। মন্দিরের পুরোহিত ও দারোয়ানকে সেদিনই দণ্ডিত করা হইল।

কিন্তু এত কিছু কাণ্ডের যিনি নায়ক, সেই ক্ষেপা-বাবা কোথায়? রাজপুরুষদের আগমনের কথা শুনিয়া বালকবৎ মহাসাধক ভয়ে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া তবে তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল।

কর্মচারীদ্বয় তখন জোড়হাতে নাটোর-রাজের তরফ হইতে এই মহাপুরুষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ষোড়শোপচারে তারামায়ের পূজা ও ভোগ দেওয়া হইল। ক্ষেপা প্রধান কোলের

পদে বৃত হইলেন। স্থায়ী নির্দেশ রহিল, এখন হইতে তারামায়ের ভোগের আগে মায়ের ছেলে ক্ষেপাকে ভোজন করাইতে হইবে।

আর একবারের ঘটনা। ক্ষেপাবাবা তখন প্রায়ই ধ্যানাবস্থা ও সমাধিতে মগ্ন থাকেন। কখনো বাহ্যজ্ঞানহীন, কখনো বা একেবারে বালকবৎ ভাব। একদিন তো ভাবোন্মত্ত অবস্থায় তিনি মন্দির বিগ্রহের গায়ে মূত্রত্যাগ করিয়াই বসিলেন।

পুরোহিত ও পাণ্ডার দল তখন 'হায় হায়' করিয়া চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল। ক্ষেপাকে অনুযোগ ও গালাগালি দেওয়া হইলে তিনি পরমানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "বেশ করেছি, আমার মায়ের গায়ে আমি মুতেছি, তোদের তাতে কিরে, শালারা!"

সকলে এক মহাসংকটে পড়িলেন। তারাদেবীর পবিত্র বিগ্রহ অপবিত্র করা হইয়াছে। ফল কি হইবে কে জানে? শুদ্ধিকরণের বিশেষ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান ও পূজা-পদ্ধতির মধ্য দিয়া আবার তাঁহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা দরকার। নাটোর রাজসরকারে সেইদিনই সংবাদ পাঠানো হইল।

এবারও আসে মায়ের আর এক প্রত্যাদেশ! কর্তৃপক্ষ তারাপীঠে লোক পাঠাইয়া জানাইয়া দিলেন, মায়ের পূজা পূর্ববৎই চলিতে থাকিবে, ক্ষেপাবাবা স্বেচ্ছাময় স্বতন্ত্র পুরুষ, মায়ের আদরের দুলাল। তাঁহার কোনো কাজেরই ত্রুটি ধরিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষেত্রে দেবীবিগ্রহ অপবিত্র করার প্রশ্ন উঠে না, মায়ে-পোয়ের ব্যাপারে অপরের মাথা ঘামানোরও দরকার নাই।

তারামায়ের এ প্রিয় পাগলা ছেলেই বহুবিশ্রুত তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বামাক্ষেপা। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় শক্তিসাধনার এক অগ্নি-শিখারূপে আবির্ভূত হন ক্ষেপাবাবা, তাঁহার এই অগ্নির আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে বহু ভাগ্যবান্ সাধকের তপস্যাপূত জীবন।

মন্দির চত্বরের শেষে, বিস্তীর্ণ বালুতটে, তারাপীঠের মহাশ্মশান খরস্রোতা দ্বারকা নদী অর্ধচন্দ্রাকারে এটি বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এ শ্মশানই শিবকল্প মহাসাধক বামার বিচরণভূমি, তাঁহার তপোক্ষেত্র।

এই তপোক্ষেত্রের পটভূমিকায় দিনের পর দিন ফুটিয়া উঠিয়াছে তারাপীঠের মহাকৌলের মহিমময় রূপ।

অমাবস্থার নিশি দ্বারকাতটে ঘনাইয়া আসে। নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরিয়া ঘন ঘন ধ্বনিত হয় শকুনী গৃধিনীর বুকফাটা আর্তনাদ। চিতাধুম ও পূতিগন্ধ চারিদিকে ছড়ানো। লোকের বিশ্বাস, তারাপীঠ-শ্মশানে মৃতের দেহাস্থি রাখিলে মুক্তি অবধারিত, চিতাগ্নি এখানে তাই কখনো নিভিবার অবসর পায় না। তাছাড়া, এ শ্মশানের প্রথা-মতো শবকে প্রায়ই চিতায় অর্ধদগ্ধ করিয়া রাখা হয়, সেগুলি টানিয়া ছিঁড়িয়া উদরস্থ করে শকুনি, শৃগাল ও কুকুরের দল। পূতিগন্ধময় পচা শব ও কঙ্কাল করোটিতে সমগ্র অঞ্চল সমাচ্ছন্ন—আর সম্মুখে শিমুলতলায় বশিষ্ঠদেবের পঞ্চমুণ্ডী আসনের কোল ঘেঁষিয়া শায়িত থাকেন বামাক্ষেপা—এই শক্তিপীঠের জীবন্ত ভৈরব।

ক্ষেপা একেবারে দিগম্বর। দীর্ঘ কৃষ্ণকায় দেহটি ভূমিতে এলায়িত। সারা অঙ্গে তাঁহার ফুটিয়া উঠিয়াছে ভীম ভৈরব কান্তি। সুরা ও গঞ্জিকার প্রসাদে আয়ত চোখ দুটিতে রক্তজবার রং। কিন্তু সত্যকার অনুসন্ধানী সাধকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে—ঐ ভীমকান্তি দেহের ভিতরে উঁকি মারিয়া ফিরিতেছে এক আত্মভোলা দেবশিশু, নয়নে তাঁহার সদা বিচ্ছুরিত স্বর্গীয় আনন্দের দ্যুতি!

ক্ষেপাবাবার কোল ঘেঁষিয়া সানন্দে খেলিয়া বেড়ায়—কালো, ভুলো, লালি, শ্বেতফুলি—তাঁহার প্রিয় পার্ষদ, কুকুরের দল। বাবার ভক্তেরা শ্মশানে ইহাদের খাবার ঢালিয়া দেয়, শুরু হয় চিৎকার, ছুটাছুটি। মৃতের হাড় মাংসেও ইহাদের রুচি কম নয়—টানাটানিতে কখনো দু-একটা টুক্‌রা ক্ষেপার আসনের কাছেও ছিট্‌কাইয়া পড়ে।

মহাপুরুষ কখনো কুকুরদের আদর করিয়া কোলে টানিয়া নেন, কখনো বা সরোষে তাড়াইয়া দেন। তাঁহার এই সারমেয় বয়স্যেরা মাঝে মাঝে বিগড়াইয়া গিয়া আঁচড় কামড়ও দেয়। শুধু খুব বেশী রক্তপাত হইলেই ক্ষেপা চটিয়া যান। শাসাইয়া বলেন,—"বোদে শালারা, তোদের দেখছি বাড় বেড়েছে!"

ভক্ত ও দর্শনার্থীর দল আশেপাশে দণ্ডায়মান। পিশাচ-বালকবৎ এই ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষের দিকে তাকাইয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

কাহারও প্রতি প্রসন্ন হইলে ক্ষেপাবাবা মাঝে মাঝে বলিয়া বসেন, "এই শালা, মাল্‌টাল্ কিছু এনেছিস্ তো বার কর্!"

কারণ বা গঞ্জিকা—একটা কিছু মিলিলেই তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকে না। খেয়ালী পুরুষের সবই দুর্জ্ঞেয়! আচার আচরণের অর্থ বুঝা দায়। হয়তো দেখা যায়, সেই একই সময়ে মদ গাঁজা ভেট দিতে উদ্যত অপর ব্যক্তিকে অকারণে গালি দিয়া তাড়াইতেছেন।

তারামন্দিরের আরতি-অনুষ্ঠান শেষ হয়। এবার মন্দিরের পাণ্ডা ক্ষেপাবাবার জন্য শ্মশানে বালুর উপর পাতায় করিয়া ভোগ প্রসাদ রাখিয়া যান। বাবার রোজকার আহারের সঙ্গী তাঁহার প্রিয় বয়স্য-গোষ্ঠী, কেলো-ভুলোর দল। কুকুরের দল যে পাতে হুটোপুটি করিয়া খায়, মহামান্য বামাক্ষেপাও সেই পাতেই মহানন্দে হন ভোজনরত। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

শব-শিবা-সারমেয় পরিবৃত, শ্মশানচারী ক্ষেপাবাবার মহাজীবনে রহিয়াছে নানা বিপরীত ভাবের সমাবেশ। কখনো তিনি উন্মাদ, কখনো বালক, আবার কখনো বা আচরণ করেন পিশাচবৎ। কিন্তু শক্তিধর মহাপুরুষের অন্তস্তলে সদাই বহিতেছে প্রজ্ঞা ও প্রেমের অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা। এ রস-সম্পদের সন্ধান পায় শুধু সেই সাধকের দল—ক্ষেপার কৃপায় যাঁহাদের আত্মিক দৃষ্টি হইয়াছে উন্মোচিত। মহাতান্ত্রিকের বহির্জীবনের আবরণটি অনেকের কাছেই বিভ্রান্তিকর; শুধু ক্ষেত্রবিশেষে কখনো কখনো এটিকে খসিয়া পড়িতে দেখা যায়।

তারাপীঠে এ সময়ে তন্ত্র সাধনার বহু উত্তম অধিকারী একের পর এক উপস্থিত হইতে থাকেন। কৌলবরিষ্ঠ ক্ষেপাবাবার কৃপা-প্রসাদে তন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া তাঁহাদের অনেকে ধন্য হন।

ক্ষেপার আবির্ভাবভূমি বীরভূমের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বহুকালের।

একদিকে যেমন বেগবতী তন্ত্রসাধনার ধারা এখানে বহিয়া চলিয়াছে, তেমনি আর একদিকে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে প্রেমরসের তরঙ্গ-ভঙ্গ। জয়দেব, চণ্ডীদাস বীরভূমেরই সন্তান। এখানকারই একচাকা গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন অবধূত নিত্যানন্দ। শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়েরই সাধনক্ষেত্র এই বীরভূম, কিন্তু তন্ত্রসাধনার মধ্য দিয়াই এখানকার অধ্যাত্মপ্রতিভা উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পুরাণোক্ত একান্ন শক্তিপীঠের ভিতর পাঁচটিই রহিয়াছে এই অঞ্চলে। তা ছাড়া, নানা সিদ্ধপীঠ ও উপপীঠও ইতস্তত এখানে কম ছড়ানো নাই। বশিষ্ঠদেব হইতে শুরু করিয়া বামাক্ষেপা অবধি—উচ্চকোটির সিদ্ধকৌলেরা আবির্ভূত হইয়াছেন এখানকার তারাপীঠে, বিস্তারিত করিয়াছেন তন্ত্র সাধনার আলো। তন্ত্রসাধনার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে এই পীঠ যুগ যুগ ধরিয়া কীর্তিত হইয়া আছে।

পুরাণ-শাস্ত্রমতে বশিষ্ঠ, ভৃগু, দত্তাত্রেয়, দুর্বাসা—ইহারা সবাই তারা-সিদ্ধ। সারা ভারতে মহাবিদ্যা তারাদেবীর আটটি সিদ্ধপীঠ চিহ্নিত রহিয়াছে এবং শাক্ত-সাধকদের তপস্যা ও সিদ্ধির মধ্য দিয়া এই পীঠগুলি আজো রহিয়াছে পরম জাগ্রত।

জনশ্রুতি আছে, ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠদেব তারা-সিদ্ধ হইয়া দেবীর শিলাময়ী প্রতীক এখানে প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

তারাপীঠ কিন্তু পুরাণোক্ত একান্ন পীঠের অন্তর্ভুক্ত নয়, সিদ্ধপীঠ-রূপেই এটি গণ্য। মহাতান্ত্রিক ঋষি, বশিষ্ঠদেবই ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর যুগযুগান্তের ধারা বাহিয়া তারাপীঠের মহাশ্মশানে উপস্থিত হইয়াছেন সমর্থ শক্তিসাধকের দল ইহাদের অনেকেরই স্মৃতি আজ লোকচৈতন্য হইতে বিলুপ্ত। কিন্তু কৌলসাধনার অন্তঃ-সলিলা ধারাটি বরাবরই এখানে বহিয়া চলিয়াছে।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বের কথা। তারাপীঠে তখন বিশে ক্ষ্যাপা নামে এক বিরাট শক্তিসাধকের আবির্ভাব হয়। ইহার পর আসেন কৌলাচার্য আনন্দনাথ, তিনি ছিলেন রাজা রামকৃষ্ণের সমকালীন। নানা ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়া তারাপীঠের সেবা ও পরিচালনার ভার

নাটোররাজের উপর পতিত হয়, রাজা রামকৃষ্ণও পরম আগ্রহভরে এই সিদ্ধপীঠের সমস্ত কিছু দায়িত্বের ভার গ্রহণ করেন। শুনা যায়, তারা-সিদ্ধ মহাপুরুষ আনন্দনাথের নিকট হইতে রাজা রামকৃষ্ণ নানা নিগূঢ় সাধন-নির্দেশ গ্রহণ করিতেন। কিছুকাল এখানকার পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসিয়া তিনি তপস্যাও করিয়াছিলেন।

আনন্দনাথের প্রশিষ্য ছিলেন আচার্য মোক্ষদানন্দ। তাঁহার সময়েই তারাপীঠে স্বনাধন্য সাধক কৈলাসপতি বাবার আবির্ভাব ঘটে। এই শক্তিমান্ মহাপুরুষের সাধনার জ্যোতিতেই মহাসধক ক্ষেপা উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন। তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব আধারে কৈলাসপতি-বাবা নিজের সাধন-জীবনের ঐশ্বর্য অকৃপণ করে ঢালিয়া দেন, বামাক্ষেপা হন তারাসিদ্ধ। তন্ত্রসাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকরূপে ঘটে তাঁহার অভ্যুদয়।

তারাপীঠের সন্নিকটে আটলা গ্রামে বামাক্ষেপার জন্ম হয়। ক্ষুদ্র এই গ্রামটিতে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। প্রধানত যজন-যাজন ও ক্ষেত-খামারের আয়ে তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হইত।

ক্ষেপার পিতা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অতি সাধারণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। ঘরে তাঁহার সচ্ছলতা না থাকিলেও অভাব-অনটন তেমন বেশী ছিল না। সর্বানন্দ বড় ধর্মভীরু, পবিত্রচেতা ও সরল মানুষ অল্প বয়সে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়া তারা-মায়ের আরাধনায় তিনি ডুবিয়া যান। ধর্মপ্রাণা পত্নী রাজকুমারী ও কয়েকটি পুত্র-কন্যা নিয়া তাঁহার সংসার। এই সর্বানন্দের দ্বিতীয় পুত্রই বামাক্ষেপা।

১২৪৪ সনের ১২ই ফাল্গুন। ক্ষেপা এই শুভ দিনটিতে ভূমিষ্ঠ হন। শৈশব হইতেই তিনি আপনভোলা। পবিত্রতা ও সরলতার প্রতিমূর্তি। এত সরল বলিয়াই প্রতিবেশীরা বলিত 'হাউড়ে'— নির্বুদ্ধি। বিন্দুমাত্র সাংসারিক বোধ যাহার নাই, সংসারী লোকের চোখে বোকা এবং পাগল ছাড়া সে আর কি হইতে পারে? তাহার সরলতা যে জন্মান্তরের তপস্যার ফল তাহাই বা কে বুঝিতে চাহিত?

স্বভাবভক্ত বামাচরণের আচরণ বড় অদ্ভুত। প্রতিবেশীদের ঠাকুর-ঘরের যত বিগ্রহ সব গোপনে সরাইয়া আনিয়া নদীতীরে সে পূজার অভিনয় করিত। এই খেলাধুলা সাঙ্গ হইবার পর কোন্ বিগ্রহ কোথায় হারাইয়া যাইত তাহার ঠিক ছিল না। তাই কাহারও বাড়িতে বিগ্রহ হারাইয়া গেলে অমনি খোঁজ পড়িত বামাচরণের। 'হাউড়ে'কেই সকলে চাপিয়া ধরিত, আর প্রায়ই ভাগ্যে তাহার জুটিত তিরস্কার এবং লাঞ্ছনা।

বালককালে বামের খেয়ালীপনা ও অন্যমনস্কতার নানা অদ্ভুত কাহিনী শুনা যায়। একবার তো তাহার আগুনে পুড়িয়া মরিবার যো-ই হইয়াছিল। গ্রামের প্রান্তে এক খড়ের গাদা ছিল তাহার প্রিয় খেলার স্থান। ভাবতন্ময় 'হাউড়ে' পরম নিশ্চিন্তে সেদিন সেখানে বসিয়া আছে, হঠাৎ এক সময় খড়ের গাদার নিচে আগুন লাগিয়া যায়। পাড়ার লোকে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, আগুন কোন্‌দিকে ছড়ায় কে জানে? চারিদিকে মহা সোরগোল। নিচে হইতে খড় সব পুড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু বামাচরণের সেদিকে কোনো হুঁশই নাই। আগুন নিভাইতে আসিয়া সকলে দেখিল, 'হাউড়ে' এ সময়ে এই খড়ের গাদার উপর মনের আনন্দে বসিয়া আছে। সৌভাগ্যক্রমে এ অগ্নিদাহে সেদিন তাহার কোনো ক্ষতি হয় নাই।

পাঠশালার পাঠ শেষ হইয়া যায়। কিন্তু বামাচরণের ভাগ্যে উচ্চ বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ হয় কই? ঘরে যে বড় অর্থাভাব।

পিতা সর্বানন্দের সংসার তখন বড় হইয়াছে, অনটনও বাড়িয়াছে। তাই অর্থাগমের জন্য এক নূতন উপায় তাঁহাকে উদ্ভাবন করিতে হয়। তাঁহার নিজের বেশ সংগীত-প্রতিভা রহিয়াছে। সুমিষ্ট গান যেমন করিতে পারেন, বেহালা বাজাইতেও তেমনই পারদর্শী। পুত্রদ্বয় বাম ও রামেরও সংগীতে দখল কম নয়। ইহাদের নিয়া সর্বানন্দ এক কৃষ্ণযাত্রার দল গঠন করিলেন।

অভিনয়ে বামাচরণ কখনো কৃষ্ণ কখনো রাম প্রভৃতি সাজেন।

ঠাকুর দেবতার বেশে সজ্জিত হইয়া রামায়ণ, কৃষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীর গাথা তিনি গান করেন। অভিনয়ের মধ্য দিয়া স্বভাবভক্ত বামের মধ্যে জাগ্রত হয় এক অপূর্ব আনন্দাবেশ, ভাবতন্ময় বালক এক একদিন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন।

বামাচরণের পড়াশুনার তেমন বেশী সুযোগ হয় নাই। কিন্তু অভিনয় করিয়া ও অভিনয় দেখিয়াই ক্রমে ক্রমে ব্যাস-বাল্মীকির পুরাণে তাঁহার ব্যুৎপত্তি হইতে থাকে। তাছাড়া, পাঁচালী, কাশীরাম-কৃত্তিবাসের কাব্য প্রভৃতির মাধ্যমে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীটি তাঁহার গড়িয়া উঠে। কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের সংগীতঝঙ্কার বালক-হৃদয়ে সদাই তোলে অনুরণন। উত্তরকালে এইসব সংগীত ও লীলা-আখ্যান ভক্তদের কাছে ক্ষেপা সোৎসাহে গাহিতেন।

বামের বড় ভগ্নী, জয়কালী দেবী বড় ভক্তিমতী। ইঁহার প্রভাবও গোড়ার দিকে তাঁহার জীবনে অনেকটা পড়িয়াছিল। দিদি ছিলেন সত্যকার এক সাধিকা। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া তিনি সন্ন্যাসিনী হন, যৌবনে তারাপীঠে গিয়া কিছুকাল সাধনাও করেন। তারপর আটলা গ্রামে মায়ের কাছে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। শুনা যায়, তারা-সাধিকা এই নারী একটি নির্দিষ্ট দিনে নিজের দেহরক্ষার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তারাপীঠে তাঁহাকে বহন করিয়া আনার পর তারা-নাম জপিতে জপিতে তাঁহার লোকান্তর ঘটে।

উত্তরকালে কখনো এ কথার উল্লেখ করিলে বামের আয়ত নয়ন দুটি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত। বলিতেন, "দিদি আমার বড় আশ্চর্য মেয়ে ছিলেন গো, তাঁর মরণটা ঘটলো আশ্চর্য রকমে।"

দিদির ধর্মজীবনের স্পর্শ বালক বামাচরণের জীবনে, গোড়ার দিকে, নূতন পথের ইঙ্গিত আনিয়া দিয়াছিল।

প্রতিবেশী দুর্গাদাস সরকার ছিলেন নাটোর-রাজের কর্মচারী। তারা-মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার তখন তাঁহার উপর অর্পিত। তারা-পীঠের তন্ত্রসাধক কৈলাসপতি বাবার পায়ের ধুলা প্রায়ই তাঁহার বাড়িতে পড়িত। সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে তখন কৈলাসপতির খ্যাতির

সীমা নাই। সরকার মহাশয়ের গৃহে তিনি আসিলেই বাম কি যেন এক অজ্ঞাত আকর্ষণে সেখানে ছুটিয়া যাইতেন। এই মহাপুরুষের ছোটখাট সেবাযত্নের ভার পাইলে তাঁহার আনন্দের অবধি থাকিত না। তিনি ও বালককে প্রায়ই ডাকিয়া পাঠাইতেন, স্নেহসম্ভাষণ ও আদরযত্ন করিতেন। শক্তিসাধনার যে অঙ্কুরটি বামাচরণের মধ্যে রহিয়াছে, তাহা কৈলাসপতি বাবার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই।

বামাচরণ যখন পিতৃহারা হন তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর। কৃষ্ণযাত্রার দলটি ভাঙিবার পর জননী রাজকুমারী দেবীর মাথায়ও আকাশ ভাঙিয়া পড়ে। সর্বানন্দের চেষ্টায় কোনো প্রকারে এতদিন দিন গুজরান হইতেছিল, এইবার তাঁহার অভাবে এতগুলি পোষ্য নিয়া তিনি বিষম বিপাকে পড়িলেন। সামান্য জোতজমি যাহা রহিয়াছে তাহাতে মোটেই কুলায় না। তদুপরি 'হাউড়ে' বামার সাংসারিক বুদ্ধির অভাবে বিপদ বাড়িয়াই চলে।

কৃষাণেরা জমিতে কাজ করিতে আসে। জননী বামাকে মাঠে পাঠাইয়া দেন, সে তাহাদের খাবার দিয়া আসবে, তত্ত্বাবধান করিবে। বাম নিত্যকার কাজে উপস্থিত হন ঠিকই, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে আকাশের দূর দিগন্তে। আকাশ-তারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া সারা সময়টা কাটাইয়া দেন। মাঠের কাজ মাঠেই পড়িয়া থাকে, কৃষাণদের খাবার প্রায়ই সময়মতো পৌঁছায় না। ফলে, রুষ্ট হইয়া মায়ের কাছে তাহারা রোজ অভিযোগ জানাইতে আসে। মা বুঝিতে পারেন, এ হাউড়ে ছেলেকে দিয়া তাঁহার কোনো কাজ চলিবে না।

সংসার চালানো কঠিন হইয়াছে, রাজকুমারী তাই নিরুপায় হইয়া দুই ছেলেকে তাহাদের মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। মাতুল পাকা বিষয়ী, ভাগিনেয়দের বিদ্যালয়ে পড়িতে দিয়া নিজের অর্থ অপচয় করিতে তিনি রাজী নন। তাই তাহাদের গোচারণে লাগাইয়া দিলেন।

মাঠে গিয়া বামাচরণ আপন ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া থাকেন, আর তাঁহার এ উনমনস্কতার সুযোগ নিয়া গরুগুলি নির্বিচারে শস্য নষ্ট করে। দিনের পর দিন লোকের অভিযোগে মাতুল অস্থির হইয়া উঠেন, বামের উপর চলিতে থাকে নির্যাতন।

দুঃখিনী মা সব কথাই শুনিলেন; হতভাগ্য পুত্রদের গৃহে ফিরাইয়া না আনিয়া আর উপায় রহিল না। ভাইকে নিয়া বামাচরণ স্বগ্রাম আটলায় ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এখানে পৌঁছিয়া তাঁহার ভাবান্তর দেখা দেয় আরও ব্যাপকভাবে—জাগতিক সকল কিছু কাজেই দেখা যায় কর্মবিমুখতা। গোচারণ, চাষবাস, হাটবাজার কোনো কিছুই আর তাঁহার দ্বারা হইবার নয়। সাংসারিক জীবনের উপর আসিয়া গিয়াছে প্রবল নৈরাশ্য।

শুধু দেখা যায়, দেবী পূজাতে বামাচরণের পরম উৎসাহ। ইহাতে কোনো বিধিবিধান, শুদ্ধাচার অথবা মন্ত্রতন্ত্রের বালাই তাঁহার নাই। চাঁপা করবী, ঘেঁটুফুল পথ চলিতে যাহা মিলে তাহাই কচুপাতায় সাজাইয়া সানন্দে তিনি তারা মায়ের নামে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া দেন। 'মা-তারা' নিনাদে গ্রামের পথঘাট মুখরিত হয়। স্বভাব-সরল হাউড়ে বামার জীবনের সাথে, তাঁহার সারা অস্তিত্বের সাথে, ওতপ্রোত হইয়া উঠে তারা-মায়ের দিব্য সত্তা। সবার অলক্ষিতে, নিজেরও অজ্ঞাতে, তরুণ সাধক এবার হইয়া উঠেন তারা-ময়।

আপন খেয়াল খুশীতে বামাচরণ গ্রামময় ঘুরিয়া বেড়ান, কখনও বা আচম্বিতে তারাপীঠে তারামায়ের মন্দিরে ছুটিয়া চলিয়া যান। যুগ যুগ ধরিয়া এখানকার শিলাসনে মায়ের পাদপদ্ম দুটি অঙ্কিত রহিয়াছে, পাগল বামাচরণ তাহার উপর ঢালিয়া দেন রাশি রাশি বুনোফুল আর বেলপাতার অঞ্জলি।

তারাপীঠের শ্মশানে তখন বহু তন্ত্রসাধকের আনাগোনা। তাছাড়া, এখানকার প্রধান কৌলপদে রহিয়াছেন মোক্ষদানন্দ। সিদ্ধ মহাপুরুষ কৈলাসপতি বাবাও এখানে উপস্থিত। তারাপীঠে গেলেই বামাচরণ এই মহাত্মাদের স্নেহ ও সাহচর্য লাভ করিয়া ধন্য হন।

কৈলাসপতি বাবার দিব্যদৃষ্টি সজাগ সতর্ক প্রহরীর মতো নিরন্তর তাঁহাকে যেন বেষ্টন করিয়া রাখে। স্নিগ্ধমধুর মমত্বে ও আদর-যত্নে কৈলাসপতি বামাচরণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, তারাপীঠ শ্মশানে না আসিলে তাই তাঁহার স্বস্তি নাই। অজানা অমোঘ এক আকর্ষণে বার বার তিনি মহাশ্মশানে ছুটিয়া আসেন, মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই সিদ্ধকৌলের কাছে বসিয়া তাঁহার কথা শ্রবণ করেন। প্রাণ ঢালিয়া রত হন তাঁহার সেবা-পরিচর্যায়।

কিছুদিন পরের কথা। তারা মায়ের জন্য বাম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। হাউড়েকে লোকে এবার তাই ডাকিতেছে 'ক্ষেপা' নামে। জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কার ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে, অন্তরে দেখা দিয়াছে তীব্র ব্যাকুলতা। মাতৃদর্শনের জন্য তিনি অধীর। জননী রাজকুমারীর শঙ্কার অবধি নাই, সতর্কভাবে বামকে তিনি ঘরের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখেন। পাগল ছেলে কখন কোথায় উধাও হইয়া যায়, কে জানে?

ক্ষেপা কখনো আপন ঘরে বসিয়া নিভৃতে তারাদেবীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, কখনো বা ধ্যানের পর জাগে ইষ্ট বিচ্ছেদের দুঃসহ যন্ত্রণা, 'তারা --তারা' বলিয়া জ্ঞানহারা হইয়া যান।

বড় অদ্ভুত তাঁহার এই দিব্যোন্মাদের অবস্থা। কখনো দেখা যায় চক্ষুতারকা দুইটি উর্ধ্বে স্থির হইয়া গিয়াছে, দেহটি নিঃসাড়, মুখ দিয়া অবিরত ফেনা নির্গত হইতেছে! ভীত হইয়া জননী তাড়াতাড়ি প্রতিবেশীদের ডাকিয়া জড়ো করেন।

পুত্র সংবিৎ পাইলে বামাচরণকে কত অনুনয় করিয়া বুঝান, "ওরে, এই সংসারের ভার আর কে বইবে বল্? তোদের সবাইকে নিয়ে এবার যে অন্নাভাবে মরতে হবে।"

মাতৃভক্ত বাম মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া উঠেন। মাকে প্রবোধ দেন, "বামুনের ছেলে, কোথাও কি একটা ঠাকুর পুজোর কাজ জুটবে না? ঘুরে এলে রোজগার হবেই—তুমি ভেবো না, মা।"

কাজের চেষ্টায় বাম বাহির হইলেন। কিন্তু সংসার-জীবনে তিনি যেমন অনভিজ্ঞ, তেমনই নিরাসক্ত। অন্তরে সদাই তৈলধারাবৎ চলিতেছে মা-তারার স্মরণ-মনন-ধ্যান। আপনভোলা এই পাগল কি করিয়া পূজা অর্চনা যথানিয়মে করিবেন ?

এক জায়গায় দুই চারিদিন পূজারীর চাকুরী করিলেন। তারপর কাজ ছাড়িয়া দিয়া আটলায় ফিরিয়া আসিতে হইল।

ইষ্টদেবীর অবিরাম স্মরণ-মননে বাম তখন উন্মাদ সাধুতে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। জগজ্জননীর অমৃতসত্তার আস্বাদ তিনি পাইয়াছেন, পাগল হইয়াছেন পরমপ্রাপ্তির জন্য।

ইষ্টদেবী তারা-মা এবার এ পরম অধিকারী সাধককে জানাইলেন আহ্বান। ক্ষেপা বামের পূর্বজন্মের সাধন-সংস্কার জাগিয়া উঠিয়াছে, আন্তর সাধনার ফলটিও হইয়াছে পরিপক্ব। বৈরাগ্যের পাগ্‌লা হাওয়ায় সংসারের যোগসূত্রের শীর্ণ বোঁটা এবার খসিয়া পড়িল। ঘর-সংসার সব কিছু ঠেলিয়া ফেলিয়া তিনি সেদিন তারাপীঠের মহা-শ্মশানে ছুটিয়া চলিলেন।

বালুকাময় শ্মশানভূমি বিধৌত করিয়া খরস্রোতা দ্বারকার জল ছুটিয়া চলিয়াছে। বন্যার জলোচ্ছ্বাসে সেদিন তাহার বুকে নামিয়াছে উত্তাল উদ্দামতা। বৈরাগ্যচঞ্চল বামাচরণের হৃদয়ও তেমনি হইয়া উঠিয়াছে তরঙ্গায়িত। অধীর হইয়া তিনি নদীতে ঝাঁপ দিলেন, সাঁতার কাটিয়া পৌঁছিলেন অপর তীরে।

বালুচরের ভাঙা ঘাটের নিকটেই কৈলাসপতিবাবার কুটির। ভাবোন্মত্ত বামাচরণ তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন।

তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ সেদিন যেন তাঁহারই অপেক্ষায় ছিলেন। গৃহত্যাগী তরুণকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "বাবা বামাচরণ, অস্থির হ'য়ো না। যে পরম ধন পাবার জন্য তুমি ব্যাকুল হয়েছ, তা শিগ্‌গীরই মিলবে। তুমি যে তারা ব্রহ্মময়ীর কৃপার উত্তম অধিকারী!"

এখন হইতে ক্ষেপা তারাপীঠের মহাশ্মশানেই রহিয়া গেলেন। কৈলাসপতির সান্নিধ্যে দিনগুলি তাঁহার মধুময় হইয়া উঠিল। শ্মশানে

ও দ্বারকাতটে দিনের পর দিন মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ান, কৈলাস-পতির কাছে নির্দেশাদি নিয়া মা-তারার ধ্যানে মগ্ন হন। রাত্রির আকাশে তাঁহার মাতৃনামের আরাবে মুখরিত হইয়া উঠে।

কৈলাসপতি ছিলেন ঋদ্ধি-সিদ্ধিযুক্ত সাধক। বহুতর চমকপ্রদ বিভূতির লীলা প্রায়ই ক্ষেপা তাঁহার মধ্যে দেখিতেন। একবার সবিস্ময়ে দেখিলেন, দ্বারকা নদীতে বন্যার ঢল্ নামিয়াছে, পারাপারের উপায় নাই। কি আশ্চর্য! এ সময়ে ওপার হইতে কৈলাসপতি অব-লীলায় খড়ম-পায়ে হাঁটিয়া এপারের সৈকতে অবতরণ করিতেছেন।

আর একবারের কথা। কৈলাসপতি বাবা সেদিন সদ্য ধ্যান হইতে ব্যুত্থিত হইয়াছেন। শ্মশানের পাশেই রহিয়াছে মরা তুলসীর ঝাড়। এটি দেখাইয়া ক্ষেপাকে কহিলেন,—"ক্ষেপা, এটা মৃত না জীবিত?"

"বাবা, এ যে একেবারে শুকনো, মরা গাছ।"

"জীবন আর মৃত্যু কিন্তু একই বাবা—তুলসী জিউ, তুলসী জিউ।" একথা বলিয়া মহাপুরুষ কমণ্ডলু হইতে জল ঢালিয়া দিলেন। কথিত আছে, এই প্রাণহীন শুষ্ক তুলসীর ঝাড় সিদ্ধ তন্ত্রসাধকের মুখনিঃসৃত বাণীর ফলে সেদিন ধীরে ধীরে মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। উত্তরকালে এ ধরনের নানা কাহিনী ক্ষেপা বলিতেন, গুরুদেবের অলৌকিক বিভূতি-লীলা বর্ণনা করিতে করিতে উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন, আর তাঁহার আয়ত নয়ন দুটি ভরিয়া উঠিত পুলকাশ্রুতে।

সাধক হিসাবে বামাচরণ অনন্যসাধারণ—এক পরম শুদ্ধ আধার। নিবিড় স্নেহে কৈলাসপতিবাবা তাই তাঁহাকে বুকে টানিয়া নিয়াছেন। কৌলমার্গের নিগূঢ় মন্ত্র ও ক্রিয়াদির ভিতর দিয়া শুরু করাইয়াছেন বামাচরণের শক্তি-সাধনা।

এদিকে পাগলা ছেলের জন্য রাজকুমারীর দুশ্চিন্তার অবধি নাই—আহার-নিদ্রা প্রায় ত্যাগ হইয়াছে। ক্ষেপা তারাপীঠে গিয়া সন্ন্যাস নিয়াছেন, এ সংবাদ শুনিয়া তিনি ত্রস্তপদে ছুটিয়া আসিলেন। বার বার বুঝাইতে লাগিলেন, নিতান্ত অপরিণত বয়স তাঁহার—শুধু শুধু কেন এই দুশ্চর তপস্যার পথে আসা? তাছাড়া, ভূতপ্রেত-শব-শিবা সঙ্কুল

এই শ্মশানে কে প্রতিদিন তাঁহার দেখাশুনা করিবে? কে আহার যোগাইবে? অসুখে বিসুখে শুশ্রূষাই বা করিবে কে? এদিকে সংসারের অভাব-অনটন চরমে পৌঁছিয়াছে। মা ও ভাই-বোনেরা প্রায়ই থাকে অর্ধাশনে, তাহাদের ভারই বা কে নিবে?

শ্মশানচারী ক্ষেপা তখন তারা-ধ্যানে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার দেহ মন প্রাণ সাধনার গভীরে নিমজ্জিত। জননীর ক্রন্দন কিছুটা কানে পৌঁছিল, কিছুটা পৌঁছিল না।

এবার প্রিয় শিষ্য ক্ষেপার সমর্থনে অগ্রসর হইয়া আসিলেন কৈলাসপতি। সমগ্র বীরভূম অঞ্চলে তখন এই মহাপুরুষের বিরাট প্রভাব, ক্ষেপার জননীও তাঁহাকে কম সমীহ করেন না।

কৈলাসপতি ক্ষেপার জননীকে কহিলেন—"মা, তোমার এ ছেলে যে নিত্যমুক্ত, পরম বৈরাগ্যবান্ পুরুষ। দেখছো তো, আজ অবধি তোমার সংসারে সে কোনো কাজেই আসে নি। কারণ, সংসার তার জন্য নয়। এখন ঘরে ফিরে গেলেও তোমার কোনো কাজেই সে লাগবে না। অধ্যাত্মসাধনার পথে যে বিরাট সম্ভাবনা তার রয়েছে, তা যে তাকে ফলাতে হবে। অগণিত মুমুক্ষুকে তোমার এই ছেলে মুক্তিদান করবে, বহুজনের কল্যাণ হবে তার এই সাধক-জীবনের ভেতর দিয়ে। আমি বলছি, এ ছেলের সাধনা ও সিদ্ধিতে তোমার কুল পবিত্র হবে, ধন্য হবে। কোনো ভয় নেই মা, তোমার হাউড়ে ছেলের ভার আজ থেকে আমিই নিয়ে নিলাম।" জননী সাশ্রুনয়নে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

ক্ষেপা তো ঘর-সংসার সব কিছু ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু জননী ও ভাই-ভগিনীদের কি উপায় হইবে? কি করিয়াই বা তাহাদের ভরণ-পোষণ চলিবে? প্রতিবেশী দুর্গাদাস সরকার তারা-মন্দিরের কর্মচারী, নিঃসহায়া রাজকুমারীর সংসার যাহাতে চলে সেজন্য তিনি উদ্যোগী হইলেন। স্থির হইল, বামাচরণ তারাদেবীর অর্চনার জন্য রোজ ফুল সংগ্রহ করিবেন, এজন্য মাসে তাঁহাকে কয়েকটা টাকা দেওয়া যাইবে। তবু তো ইহা দিয়া মায়ের কিছুটা সাহায্য হইবে।

কিন্তু ক্ষেপাকে নিয়াই যত গোল বাধিল। বাহ্য জীবনের সমস্ত কিছু কাজকর্মের অতীত তিনি। ফুলের সাজি নিয়া রোজ বাগানে যান, কোনো কোনো দিন ফুল তোলার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়—বেহুঁশ হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাঙাজবার ডালটি ধরিয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। রক্তজবা দেখিলেই মনে পড়িয়া যায় তারামায়ের রাতুল চরণ; অমনি ভাববিহ্বল ও বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া পড়েন। মন্দিরের পূজারীর হইয়াছে বিপদ। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি গালাগাল দেন, তারপর নিজেই ফুল তুলিয়া আনিয়া কাজ চালান।

দুর্গাদাস ভাবিলেন, ক্ষেপার হয়তো এ কাজ ভালো লাগিতেছে না, তারা-মায়ের মন্দিরের কাজে তিনি বেশী আনন্দ পাইবেন, মনোযোগও হয়তো দিবেন। নূতন কাজ শুরু হয়। এবার হইতে তাঁহার উপর ভার পড়ে মন্দিরের কাজের জন্য উপচার সংগ্রহ করার, চন্দন, নৈবেদ্য ইত্যাদি যোগাড় তৈরি করার।

কিন্তু আত্মসমাহিত সাধকের পক্ষে এ কাজই বা সম্ভব হয় কই? মাতৃধ্যানে সদা বিভোর বাম কোনো কাজই করিতে পারেন না। বেহুঁশ অবস্থায় পূজার উপকরণ এক একদিন নষ্ট করিয়া ফেলেন, অদৃষ্টে জুটে তীব্র ভৎসনা।

দুর্গাদাস বুঝিলেন, বাহিরের বন্ধন টুটিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপার বাহিরের কাজও ঘুচিয়া গিয়াছে—তাই এই কর্মবিমুখতা। সবাইকে বলিয়া দিলেন, এখন হইতে ক্ষেপার কোনো নির্দিষ্ট কাজ থাকিবে না। কেউ কোনো কাজের ভার যেন তাহাকে না দেয়, সে ইচ্ছামতো কাজ করিবে ও মায়ের কাছে পড়িয়া থাকিবে।

তারা-মায়ের ছেলে তারামায়েরই সঙ্গে মহাশ্মশানে চিরদিনের জন্য রহিয়া গেলেন। ইহার পর আপনভোলা ক্ষেপার সাধন-জীবনে দেখা দিল চরম বৈরাগ্যের পালা।

শরীরের দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নাই, আহার-বিহারেও দেখা যায় যদৃচ্ছাচার। মাথা গুঁজিবার জন্য যে একটা পর্ণকুটিরের প্রয়োজন, সে বোধও তাঁহার আজ আর নাই। নিচে তারা-মায়ের সিদ্ধপীঠ

মহাশ্মশান, আর উপরে উদার আকাশের মহাবিস্তার। মুক্ত বিহঙ্গের মতো ক্ষেপা এখানে স্বেচ্ছাবিহার করিতে থাকেন। মাথার উপর দিয়া শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার প্রকোপ অলক্ষ্যে চলিয়া যায়। আনন্দময়ী মায়ের ধ্যানানন্দে তিনি দিন-রজনী যাপন করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে দেখা দিল এক দুর্দৈব। কিছুদিন রোগভোগের পর জননী রাজকুমারী দেহত্যাগ করিলেন।

ক্ষেপা সেদিন শ্মশানঘাটে স্নান করিতে নামিয়াছেন। দেখিলেন, ওপারে আত্মীয়স্বজনদের ভিড়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচরণ জননীর মৃতদেহ নিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বর্ষাবিক্ষুব্ধ উত্তাল নদী পার হওয়া সহজ নয়, তাই নদীর অপর তীরেই দাহকার্যের ব্যবস্থা চলিতেছে।

মুহূর্তমধ্যে ক্ষেপার অন্তরে খেলিয়া যায় চিন্তার বিদ্যুৎচমক। সেকি কথা? জননীর সৎকার কি তারা-মায়ের সিদ্ধপীঠের এ শ্মশানে সম্পন্ন হইবে না? দেহাস্থি তাঁহার তারাপীঠের পবিত্র ক্ষেত্রে রাখা হইবে না? তীব্র উত্তেজনায় সাধক বামাচরণের ভিতরকার 'ক্ষেপা' এবার জাগিয়া উঠিল।

ব্যাকুল কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "মা-তারা, দেখিস, আমার মা যেন তোর এ শ্মশানে ঠাঁই পায়।" সঙ্গে সঙ্গে খরস্রোতা দ্বারকা নদীতে দিলেন ঝাঁপ! শবদেহটি তাঁহাকে যে এপারের এই পবিত্র সিদ্ধপীঠে নিয়া আসিতেই হইবে।

শবযাত্রীরা অপর তীরে চিতায় অগ্নিসংযোগে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে ক্ষেপাকে সাঁতরাইয়া আসিতে দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। কি কাণ্ড সে ঘটাইবে তাহা কে জানে!

ক্ষিপ্রগতিতে সাঁতরাইয়া ক্ষেপা ওপারে পৌঁছিলেন, মায়ের শবদেহটি কাড়িয়া নিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তারপর একখণ্ড বস্ত্র দিয়া উহা পিঠে বাঁধিলেন, খরস্রোতা দ্বারকার জলে দিলেন ঝাঁপ। আত্মীয়স্বজন ও শ্মশানবন্ধুর দল এ দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে ভয়ে একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন।

উত্তাল তরঙ্গবক্ষে সন্তরণ করিয়া নয়, তারানামের তরীতেই যেন ক্ষেপা সেদিন বন্যা-বিক্ষুব্ধ নদী পার হইয়া আসেন।

তারাপীঠের পবিত্র ভূমিতে জননীর দেহ দাহ করার পর তাঁহাকে শান্ত ভাব ধারণ করিতে দেখা যায়।

মায়ের সৎকারের পর কিছুদিন কাটিয়া গিয়াছে। ক্ষেপা পূর্বের মতোই আনন্দে শ্মশানে স্বেচ্ছাবিহার করিতেছেন। আদ্যশ্রাদ্ধের আর মাত্র দুই দিন বাকী। হঠাৎ সেদিন কনিষ্ঠ রামচরণকে আদেশ দিয়া বসিলেন, "ওরে দ্যাখ্, মায়ের শ্রাদ্ধ কিন্তু অমনি ফাঁকি দিয়ে করবিনে। ক'খানা গাঁয়ের লোক নেমন্তন্ন ক'রে খাইয়ে দে।"

রামচরণ চমকিয়া উঠিলেন। দাদার এ আবার কোন্ পাগলামী? ঘরে এক কানাকড়িও নাই, অতিকষ্টে দিন চলিতেছে, তবে এত লোক খাওয়ানোর প্রশ্ন কি করিয়া আসে?

দাদার খেয়ালীপনা তিনি জানেন, তাই কথার কোনো উত্তর দিলেন না। প্রতিবেশীরাও অর্থহীন প্রলাপ বলিয়া একথা উড়াইয়া দিলেন, অনেকে শ্লেষের হাসিও হাসিলেন। কিন্তু ক্ষেপার একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ, জননীর শ্রাদ্ধে সমারোহ করিতে হইবে, বহু লোককে ভোজন করাইতে হইবে। আটলাতে গৃহের সংলগ্ন একখণ্ড পতিত জমি রহিয়াছে, ক্ষেপা নিজ হাতেই একদিন তাহা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া আসিলেন। ভাবখানা এই—সমাজ-খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত তাঁহার দিক দিয়া একেবারে স্থির, নড়চড় হইবার জো নাই।

শ্রাদ্ধকার্যের দিন কিন্তু এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। ক্ষেপা পূর্ববৎ শ্মশানে বসিয়া আছেন, আর এদিকে ভারে ভারে বহু উপচার ও খাদ্যসম্ভার আটলায় রামচরণের নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে। তরুণ সাধক ক্ষেপার জানা অজানা সুহৃদ্ ও ভক্তজনের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্যের যেন বান ডাকিয়াছে। প্রচুর ভোজ্য দ্রব্যে গৃহ অঙ্গন ভরিয়া উঠিল। এ যেন এক ইন্দ্রজাল।

শ্রাদ্ধের দিন গৃহে শত শত অতিথি আসিয়া জড়ো হইয়াছেন। ভ্রাতা রামচরণ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি সব শেষ করিয়া ফেলিলেন। এইবার ব্রাহ্মণ ভোজনের পালা।

বর্ষার মেঘগম্ভীর আকাশ হঠাৎ এ সময়ে বড় বিরূপ হইয়া উঠিল। তবে কি প্রবল ঝড়বৃষ্টি আসন্ন। নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভোজন অসম্পূর্ণ থাকিবে? মায়ের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে তবে কি বিঘ্ন ঘটিবে? ভয়ে ভাবনায় রামচরণ মুষড়িয়া পড়িলেন।

এদিকে তারাপীঠের শ্মশানে বামাক্ষেপা রহিয়াছেন ধ্যানাবিষ্ট। আকাশে হঠাৎ মেঘসমারোহ দেখিয়া তিনি উচ্চকিত হইয়া উঠিলেন। জননীর পারলৌকিক কার্য সুসম্পন্ন হইবে না? সে কি কথা? দ্রুতপদে উপস্থিত হইলেন শ্রাদ্ধবাসরে।

ক্ষেপাকে দেখিয়াই রামচরণ কাঁদিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "দাদা, শ্রাদ্ধের এ বিরাট আয়োজন তোমার জন্যই সম্ভব হয়েছে। ঐ ত্যাখো, ঝড়-বৃষ্টি তেড়ে আসছে। মায়ের কাজ কি পণ্ড হবে?"

ভ্রাতাকে সান্ত্বনা দিয়া ক্ষেপা বলিয়া উঠিলেন, "ওরে, আমার তারা-মায়ের প্রসাদে অভ্যাগতদের ভোজনে কোনো বিঘ্ন হবে না, তুই শান্ত হ'।"

এবারে উচ্চ স্বরে তারা-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষেপা ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। অঙ্গনে বহু লোকের সমাবেশ। এ সময়ে তরুণ শক্তিসাধকের অলৌকিক বিভূতি প্রকাশিত হইতে দেখা গেল। আটলা গ্রামের নিকটে ও দূরে সর্বত্র তখন ঝড়-বাদলের প্রচণ্ড মাতামাতি। অথচ শ্রাদ্ধবাসরে এক ফোঁটা বারিপাতও হইল না। কয়েকখানা গ্রামের লোক ভোজনে বসিয়াছে; তাহাদের ভূরিভোজনের মধ্য দিয়া ক্ষেপার মায়ের কাজ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। ক্ষেপার এ অলৌকিক সিদ্ধাই সেদিন এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল।

সন্ন্যাসের পর হইতেই শ্মশানে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসিয়া ক্ষেপা তন্ত্র সাধনায় নানা অভিচার ও ক্রিয়া-পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে থাকেন।

তন্ত্রসিদ্ধ, শক্তিধর মহাপুরুষ কৈলাসপতিবাবা ও মন্দিরের প্রধান কৌলাচার্য মোক্ষদানন্দের পদতলে বসিয়া তাঁহার সাধনা অগ্রসর হইয়া চলে। ক্রমপর্যায়ে তন্ত্রোক্ত সমস্ত কিছু ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান তিনি শেষ করিতে থাকেন। শক্তির পর শক্তির স্তর অবলীলায় তিনি অতিক্রম করিয়া যান। তাঁহার সাধনার এ অগ্রগতি প্রবীণ আচার্যদেরও বিস্মিত করিয়া তোলে।

ক্ষেপা শুদ্ধসত্ত্ব, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, শক্তিসাধনার পথে সবেগে তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু বাহ্য মৈথুনাদির প্রয়োজন এ দিব্যচারী সাধকের কখনো হয় নাই। সিদ্ধদেহের ভিতরে উদ্‌গত হইয়াছে যে অমৃতময় রসধারা তাহাই করিয়াছে তাঁহাকে সাহায্য! ক্ষেপাকে তাই বলিতে শুনা যাইত, "তারা-মা বড় আশ্চর্য ভৈরবী।"

মানুষের ভিড় এড়ানোর জন্য ক্ষেপা প্রায়ই এক অদ্ভুত পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া রাখিতেন। কিন্তু তাঁহার আচার-বিচারহীন ভীম ভৈরব ভঙ্গীর অন্তস্তলে লুকানো থাকিত পরম দিব্যভাব ও দিব্যাচার। তারা ব্রহ্মময়ীর আসনটি ছিল তাঁহার হৃদয়ে চিরস্থায়ী। জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কারের বলে, কঠোর তপস্যার বলে, এবার তাঁহাব জীবনে ঘটিতে থাকে বিস্ময়কর রূপান্তর।

ক্ষেপার কারণ-পান ছিল যেন কুলকুণ্ডলিনীতে কারণ হোমের অনুষ্ঠান। কিন্তু কারণের দাস কখনও তিনি ছিলেন না। ভক্তেরা সম্মুখে উপস্থিত হইলেই সুরা আনয়নের হুকুম হইত। এজন্য ব্যগ্রতাও হয়তো দেখাইতেন। কিন্তু অপর্যাপ্ত পরিমাণে এ বস্তু পান করিলেও কখনো তাঁহার ভাববৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই।

ক্ষেপা চিরকুমার—সন্ন্যাসী। সাধনজীবনে কখনো বাহ্য ভৈরবী গ্রহণের আবশ্যকতা তিনি বোধ করেন নাই। সে-বার কিন্তু তারাপীঠে এক ভৈরবী আসিয়া উপস্থিত। ভৈরবীটি তরুণী ও রূপলাবণ্যবতী। ক্ষেপার প্রতি এই সাধিকা এক তীব্র আকর্ষণ বোধ করিতে থাকে, তাঁহাকে বশ করার জন্য নানা ছলনারও আশ্রয় নেয়।

একদিন নিশীথ রাত্রে রমণী নিভৃতে তাঁহার কুটিরে উপস্থিত হয়,

নীরবে পদসেবা শুরু করিয়া দেয়। ক্ষেপা চমকিয়া উঠেন, তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, "মা, আমার ভৈরবীতে দরকার নেই। আমার এখানে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। তুমি এখান থেকে যাও।"

সাধিকা রমণীটি কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সেখান হইতে নড়িবার কোনো আগ্রহ তাহার দেখা গেল না। ক্ষেপা এবার নিজের উগ্রমূর্তি প্রকাশ করিলেন, রোষদৃপ্ত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দাঁড়া তো বেটি, আমার চিম্‌টা নিয়ে আসছি " এই রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ভৈরবী ভীত হইয়া চরণে লুটাইয়া পড়ে। কৃপালু ক্ষেপার আশীর্বাদে অতঃপর তাহার জীবনে ঘটে আধ্যাত্মিক রূপান্তর।

বামাক্ষেপা সত্যসত্যই কামজয়ী পুরুষ কিনা ইহা পরীক্ষার জন্য তারাপীঠের তহ্শীলদার একবার এক সুন্দরী বারাঙ্গনাকে নিয়োজিত করে। কিন্তু মহাপুরুষকে প্রলুব্ধ করার এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সেদিন গভীর রাত্রিতে ক্ষেপা শ্মশানে রহিয়াছেন, এমন সময় এই গণিকা হঠাৎ আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে। নির্লজ্জা নারী কিন্তু ক্ষেপার পুরুষাঙ্গটি খোঁজ করিতে গিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে। সে দেখে, মহাপুরুষের এ অঙ্গটির কোনো চিহ্নই নাই। ইন্দ্রজাল-বলে দেহ হইতে উহা যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্ষেপা এতক্ষণ ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়াছিলেন। এবার চোখ মেলিয়া চাহিলেন। তারপর 'আমার মা এসেছিস, মা এসেছিস' বলিয়া বালকবৎ উৎসাহে সেই নারীর স্তন্য পান করা শুরু করিলেন। সে কি তীব্র শোষণ। ইহার ফলে স্তন হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে রক্তধারা। ক্ষণপরে "মলাম মলাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া রমণী মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া যায়। গণিকাটি জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে ক্ষেপাবাবা সস্নেহে তাঁহাকে কাছে ডাকেন, শান্তস্বরে বলেন, "নে মা, এখন ঘরে যা। ছেলের সঙ্গে আর কখনো এমনটা করিস নে।"

মহাপুরুষের চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া ভয়বিহ্বলা রমণী বলিতে থাকে, "বাবা, আমার পাপের যে অন্ত নেই, বলে দাও আমার কি গতি হবে? আমায় তুমি কৃপা ক'রে উদ্ধার করো।"

আশ্রিতের করুণ ক্রন্দনে ক্ষেপা বিগলিত হইয়া গেলেন। কহিলেন, "আচ্ছা, এখন যা মা, তারা-মা তোকে কৃপা করবে।"

মহাপুরুষের অঙ্গ স্পর্শের পর হইতে ঐ গণিকা পবিত্র জীবন যাপন শুরু করে।

শিমুলতলার পঞ্চমণ্ডী আসনে ক্ষেপা প্রায়ই ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন। শক্তিধর আচার্যদ্বয়ের কৃপায় তিনি পরিণত হইয়াছেন উচ্চকোটির সাধকে, তারামন্ত্রে হইয়াছেন সিদ্ধ। ইষ্টদেবীর সঙ্গে এখন তাঁহার বড় অন্তরঙ্গতা।

ইতিমধ্যে একদিন মহাশ্মশানের ধারে এক নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। তন্ত্রাচার্য কৈলাসপতিকে ক্ষেপা প্রায়ই গঞ্জিকা সাজিয়া দেন। সজ্জিত কল্‌কেটি প্রতিদিনের অভ্যাসমতো বাবা-মহারাজ প্রথমে তাঁহার ইষ্টদেবীকে নিবেদন করেন, তারপর নিজে গ্রহণ করেন। ক্ষেপা তাঁহার প্রসাদ পান।

সেদিন আদেশমতো ক্ষেপা গুরুর কল্‌কেটি সাজিয়া আনিয়াছেন, কৈলাসপতিও চক্ষু মুদিয়া উহা ইষ্টদেবীকে নিবেদন করিতেছেন। এই অবসরে ক্ষেপা নিশ্চিন্ত আরামে গঞ্জিকার কল্‌কেটি উঠাইয়া সেবন শুরু করিয়া দিলেন।

এ কি কাণ্ড! কৈলাসপতি চমকিয়া উঠিলেন। একনিষ্ঠ শিষ্য ক্ষেপা তো এভাবে কখনো গুরুর মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে পারে না! এ যে অসম্ভব। এই বিপরীত আচরণের কারণ খুঁজিতে গিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল দৈবী সংকেত। গুরু বুঝিলেন, যে বীজ তিনি রোপণ করিয়াছিলেন তাহা লাভ করিয়াছে বনস্পতির পূর্ণ পরিণতি।

কৈলাসপতি মনে মনে বিচার করিলেন—কথাটা সত্যই এবার ভাবিবার। বাম সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এবার দুই সিদ্ধ কৌলের এক শক্তিপীঠে থাকার তো প্রয়োজন নাই। বেশ তো, ক্ষেপার সাধনা তাঁহার নিজস্ব পথে চলুক, গুরুশিষ্যে একত্রে আর বাস করা নয়।

আননে আত্মতৃপ্তির হাসি টানিয়া কৈলাসপতি শুধু বলিলেন, "বাবা, তা হলে তোমাকেই যে এখানকার ভার নিয়ে এবার বসতে হয়। আমি আজ তবে চলি।"

ক্ষেপা উত্তরকালে বলিতেন, "গুরু আমার যেন পাখির মতন আকাশে উড়ে চলে গেলেন।" সন্ধ্যাকাশের অপস্রিয়মান রক্তিম আভা তখন দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—মহাসাধক কৈলাসপতিবাবা তারাপীঠ হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। অনেকে বলিত, তিনি কৈলাসের পথে গিয়াছেন; কিন্তু কোনো সন্ধান তাঁহার আর মিলে নাই।

মোক্ষদানন্দও ইহার পর বিদায় নেন। অতঃপর ক্ষেপাবাবাই বৃত হন তারাপীঠের প্রধান কৌলপদে। পীঠস্থলীর অধিনায়কত্ব তিনি করিতেন বটে, কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের শুদ্ধাশুদ্ধ, খাদ্যাখাদ্য, জাত-বেজাতের কোনো বালাই ছিল না। দেবতা ও মানুষে, মানুষ ও কুকুরে তাঁহার যেমন ভেদজ্ঞান ছিল না, দেবভোগ্য প্রসাদে আর পশুর খাদ্যেও তেমনি রুচি-অরুচির প্রশ্ন কখনো উঠিত না। সমগ্র সত্তা তখন এক দিব্য চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ—পরম অখণ্ড বোধে সব কিছু একাকার হইয়া উঠিয়াছে।

প্রায়ই দেখা যাইত, ভাবাবিষ্ট ক্ষেপা প্রিয় কুকুরদের সঙ্গে হুটোপুটি করিয়া তাহাদেরই খাদ্য খাইতেছেন। আবার কখনো বা তাঁহার জন্য রক্ষিত প্রসাদান্ন প্রিয় পারিষদ কেলো ভুলো প্রভৃতি কুকুরদের সঙ্গে ভাগ করিয়া খাইতেছেন। আচমনের যেমন বালাই নাই, স্নানশুদ্ধির প্রয়োজনও তাঁহার কাছে তেমনই নিরর্থক হইয়া গিয়াছে।

তারামন্দিরের অভ্যন্তরে বসিয়া সারা রাত্রি ক্ষেপা 'তারা-তারা' আরাবে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তোলেন। আবার মাঝে মাঝে দেবীবিগ্রহের সম্মুখে হন তিনি সমাধিমগ্ন। সমাধি ভাঙিয়া যায়, ক্ষেপা অনেকক্ষণ অবসন্ন দেহে জড়বৎ বসিয়া থাকেন। এ অবস্থায় শুচি-অশুচির ভেদজ্ঞান কিছুই নাই। এক একদিন এই অবস্থায় মন্দির প্রকোষ্ঠ ক্ষেপার মলমূত্র ও থুতুতে নোংরা হইয়া উঠিত, দুর্গন্ধে

কাহারও কাছে যাইবার উপায় থাকিত না। খণ্ড ও অখণ্ডের সীমা-রেখা তাঁহার কাছে বিলুপ্ত, ভেদবুদ্ধির পরপারে নিরন্তর তিনি করিতেছেন অবস্থান। তারা-মায়ের কোলের আদরের সন্তান ক্ষেপা। তাই তো বাহ্য আচার-আচরণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই।

কিন্তু মহাপুরুষের এই বালকবৎ এবং পিশাচবৎ ভাব সংসারের সাধারণ জীব বুঝিতে চাহিবে কেন? মন্দিরের কর্মচারীরা ক্ষেপাকে একদিন কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করিতে থাকে। তারাপীঠের একদল লোক তুমুল আন্দোলন শুরু করিয়া দেয়,—ক্ষেপা তারা-মায়ের মন্দির অপবিত্র করিয়া দিয়াছেন।

নাটোররাজের কর্মচারীদের মনে অনুরূপ ঘটনার স্মৃতি জাগরূক আছে, আন্দোলনকারীদের উৎসাহ তাই তাঁহারা থামাইয়া দিলেন। আপনভোলা ক্ষেপা কিন্তু অকুতোভয়, পরমানন্দে স্বেচ্ছামতো তিনি শ্মশানে বিহার করিয়া চলিয়াছেন।

তারা-মায়ের সিদ্ধ সাধকরূপে বামাক্ষেপা খ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন। ক্রমে তাঁহার শক্তি-বিভূতির কথা দিকে দিকে প্রচারিত হইতে থাকে। তারাপীঠে শোক-দুঃখ ক্লিষ্ট নরনারী ও মুমুক্ষু সাধকদের ভিড় লাগিয়া যায়। শক্তিধর ক্ষেপা সদাই থাকেন খেয়ালখুশীতে, স্বাভাবিক আনন্দের উচ্ছ্বাসে দুই হাতে ছড়াইতে থাকেন ঐশী কৃপা।

যে কোনো আর্তভক্ত একবার কাঁদিয়া কাটিয়া ক্ষেপাবাবার শরণ নেয়, লাভ করে তাহার প্রার্থিত বস্তু। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষের পদতলে বসিয়া এ সময়ে কত জননী মৃতকল্প পুত্র ফিরিয়া পাইয়াছে, কত নারী এড়াইয়াছে বৈধব্যের অভিশাপ।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ ক্ষেপার বালকবৎ আচরণের নানা কৌতুককর কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে। দূর-দুরান্ত হইতে তাঁহার কাছে বহু ভক্ত ও দর্শনার্থী আসিতেন। শ্রদ্ধাভরে অনেকে তাঁহাকে কিছু কিছু টাকাও ভেট দিতেন। ভক্তদের এইসব প্রণামী সঞ্চয় করিয়া রাখার জন্য তিনি তাঁহার এক নিত্যসঙ্গী ভক্তকে ভার দেন। ক্ষেপার ইচ্ছা, এই অর্থে

তারা-মায়ের পীঠস্থানের খানিকটা উন্নতি সাধন করা হইবে। ভক্তটি কিন্তু লোভের বশে এই গচ্ছিত অর্থ ধীরে ধীরে অপহরণ করিয়া বসে।

বাবার এক ভক্ত স্থানীয় উকিল, তাঁহার উৎসাহে এই ব্যক্তিটি আদালতে অভিযুক্ত হয়।

হাকিম ক্ষেপাবাবাকে শ্রদ্ধা করিতেন, তাই কঠোরভাবেই মামলাটি তিনি বিচার করিতেছেন। হঠাৎ একদিন ক্ষেপা নিজেই এজলাসে আসিয়া উপস্থিত। করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "হাকিম বাবা, তুমি ওকে এবারকার মতো ছেড়ে দাও।" হাকিম ও আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তদ্বিরকারী উকিল ভক্তটি তো প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু এই মুক্তি-প্রার্থনার কারণ কি, আদালত হইতে ক্ষেপাকে এ প্রশ্ন করা হইলে তিনি করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, ওর জেল হলে আমার সিদ্ধি আর কারণ কে তৈরি ক'রে দেবে? তাছাড়া, আমি কথা কইব কার সঙ্গে?"

বলাবাহুল্য, ক্ষেপার আগ্রহাতিশয্যে এবং ভক্ত উকিল-মোক্তারদের চেষ্টায় অপরাধীটি মুক্তিলাভ করে। ক্ষেপার কেলো-ভুলো কুকুরদের সঙ্গে এই তস্করের পার্ষদ-গিরিও অব্যাহত থাকিয়া যায়।

রামপুরহাটের ডাঃ হরিচরণ ব্যানার্জি ক্ষেপার এক ভক্ত। সেদিন তিনি বড় ত্রস্তেব্যস্তে বাড়ি ফিরিতেছেন। শিবিকাটি তারাপীঠের নিকটে পৌঁছিলে বাবাকে প্রণাম করিতে গেলেন।

ক্ষেপা বার বারই সেদিন তাঁহাকে তারাপীঠে বিশ্রাম করিয়া বাড়ি ফিরিতে বলিতেছেন। দারুণ গ্রীষ্মের দিন। রৌদ্রের উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। পথে তাঁহার যে বড় কষ্ট হইবে! ডাক্তারের জন্য বাবার স্নেহ সেদিন যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। ভক্তের সমাদরের জন্য তিনি অতিমাত্রায় উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন।

সঙ্গীয় ভক্তেরা ক্ষেপার এ আচরণে বিস্মিত হইলেন। সর্ব বিষয়ে যিনি নিরাসক্ত, তাঁহার পক্ষে এ ধরনের জাগতিক অনুরোধ যে বড় অস্বাভাবিক! ডাক্তারবাবুও কিছুটা ভড়কাইয়া গেলেন।

বাড়িতে তাঁহার কন্যা ডিপ্‌থেরিয়ায় আক্রান্ত, দেরি করিবার উপায় নাই, তাই তাড়াতাড়ি রওনা হইতে হইল।

ক্ষেপা কোনোমতেই তাঁহাকে ছাড়িতে চান না। শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন, আর কহিতেছেন, "বাবা, সামান্য কিছু খেয়ে যাও!" ভক্তটিকে ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া সেদিন তাঁহার কি দুঃখ!

বাড়ি ফিরিয়া ডাক্তার শুনিলেন, তাঁহার কন্যাটির মৃত্যু হইয়াছে। বুঝিলেন, তাঁহার এ পারিবারিক দুর্দৈবের কথা অন্তর্যামী ক্ষেপা পূর্বেই জানিয়াছিলেন, তাই বুঝি তাঁহাকে এমন ব্যাকুল হইয়া নিজের কাছে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছিলেন।

ক্ষেপা ছিলেন স্বেচ্ছাময়। গালাগালি দিয়াই কত দুরারোগ্য ব্যাধি তিনি সারাইয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত তারা-মায়ের চরণামৃত ও শ্মশানের মাটি প্রাণরক্ষা করিয়াছে বহু নরনারীর।

মন্দিরের সোপানে বসিয়া মরণাপন্ন এক ব্যক্তি সেদিন ধুঁকিতেছে, আর অবিরাম করিতেছে অশ্রুপাত। ক্ষেপা কাছ দিয়া যাইতেছিলেন, সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিগো বাবু, আনন্দময়ীর দুয়ারে এসে এমনতর নিরানন্দ কেন?"

রুগ্ন লোকটি দেবীর প্রসাদ পাইতে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃসহ রোগযন্ত্রণায় সে কাতর, প্রসাদ নিবার মতো অবস্থা তাহার নাই? ক্ষেপার হৃদয় বিগলিত হয় এবং সেদিন তাঁহার স্পর্শে মৃত্যু-পথযাত্রী এই রোগীটি একেবারে রোগমুক্ত হইয়া উঠে। অতঃপর আকুণ্ঠ পুরিয়া তারা-মায়ের প্রসাদ সে গ্রহণ করে।

সুস্থ হইবার পর লোকটি ক্ষেপাবাবাকে কহিল, "বাবা, তুমি কি সাক্ষাৎ ভগবান্? তোমার ছোঁয়া পাবার পরমুহূর্তেই আমার মৃত্যুসম যন্ত্রণা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।"

উত্তর হইল, "ভগবান্ তোকে ছুঁলে তুই শালা কি খাবার জন্য এমন ক'রে ছটফট করতিস রে? তোর সব যে একাকার হয়ে যেত? আমি হলাম তারা-মায়ের পায়ের ধুলোর ধুলো।"

নন্দ হাড়ি ক্ষেপার একজন অনুগত ভক্ত। দুই হাতে তাহার জঘন্য কুষ্ঠরোগ। ইহা নিয়াই রোজ সে ক্ষেপাবাবার সেবা পরিচর্যা করে। বাবার পানীয় জল আনা হইতে শুরু করিয়া কেলো-ভুলো কুকুর-গোষ্ঠীর দেখাশোনা অনেক কিছু কাজ নন্দই করিয়া থাকে।

সেদিন এক ভক্ত প্রশ্ন করেন, "বাবা, এ ব্যাটা জাতে হাড়ি, তাতে আবার কুষ্ঠরোগী। আপনি কেন ওর হাতের জল খাচ্ছেন ?"

ক্ষেপা চটপট উত্তর দিলেন, "আমি ওর হাতের জল খাই—আমার ইচ্ছে। তাতে তোর শালা কি ?"

বিস্ময়ের বিষয়, নন্দের উপর এত স্নেহ থাকা সত্ত্বেও বাবা তাহার এই ঘৃণ্য রোগটি উঠাইয়া নিতেছেন না। নন্দও এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কোনোদিন কিছু বলে না।

সে-বার নন্দ হাড়ির এ ব্যাধির আক্রমণ খুব বাড়িয়া উঠিল। প্রায় পাঁচ সাতদিন যাবৎ সে তারাপীঠ শ্মশানে আসিতেছে না, ক্ষেপাবাবা তাহার জন্য বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কয়েকজন ভক্ত ধরিয়া বসিলেন, "বাবা, নন্দ আপনার এমন অনুগত ভক্ত, এবার সে বড় কষ্ট পাচ্ছে, তাকে রোগমুক্ত আপনাকে করতেই হবে।" অনুমতি পাইয়া সকলে নন্দকে নিয়া আসিলেন।

সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র ক্ষেপাবাবা উত্তেজিত কণ্ঠে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, "শালা! পাপ করবার সময় মনে থাকে না ? যেমন কর্ম তেমন ফল। যা বেটা এখান থেকে! তোর ঐ হাত পচে গলে খসে খসে পড়বে।"

করুণাময় ক্ষেপাবাবার একি কঠোর ব্যবহার! নন্দ হাড়ি তো অভিমানে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল মহাপুরুষের আর এক মূর্তি। নন্দকে নিকটে ডাকিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, সান্ত্বনা দিয়া সস্নেহে কহিলেন, "বাবা, এখন থেকে পাপ পথে আর যাবিনে, কেবল তারা-মায়ের নাম করবি। যা-তোর রোগ সেরে যাবে, ঐ শ্মশানের মাটি রোজ দু-হাতে মাখবি।" নন্দের কুষ্ঠরোগ মাসখানেকের মধ্যেই নিরাময় হইয়া গেল।

বেলেগ্রামের নিমাই দীর্ঘদিন যাবৎ হার্নিয়া রোগে ভুগিতেছে। একে নিজের রোগযন্ত্রণা, তদুপরি দারিদ্র্যের বিভীষিকা কোনোরকম কাজকর্মই সে করিতে পারে না, স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ কি করিয়া করিবে ? শেষকালে মরিয়া হইয়া সে স্থির করিয়া ফেলিল, গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিবে।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। নিমাই সেদিন তারাপীঠ শ্মশানের পাশে এক জঙ্গলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, হাতে তাহার একগাছি রজ্জু। নিকটে জনমানব কোথাও নাই। বট গাছের ডালে রজ্জুটি লাগাইয়া সে আজ এখনি ঝুলিয়া পড়িবে, নতুবা এই জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতির পথ নাই।

গলায় ফাঁসি লাগাইতে যাইবে, ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল এক হৃৎকম্পকারী নিনাদ, 'তারা—তারা !' নিমাই-এর হাত হইতে তৎক্ষণাৎ ফাঁসির দড়িটি খসিয়া পড়িয়া গেল। সভয়ে চাহিয়া সে দেখে, স্বয়ং ক্ষেপাবাবা তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

গম্ভীর কণ্ঠে মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন, "ওরে শালা, আত্মঘাতী হওয়া যে মহাপাপ ! শিগ্‌গীর এখান থেকে পালা —পালা।"

নিমাইয়ের মরা আর হইল না। কিন্তু সেদিন হইতে স্থির করিল, আর সে গৃহে ফিরিয়া যাইবে না, তারা-মায়ের মন্দির চত্বরে থাকিয়া দর্শনার্থীদের কাছে ভিক্ষা করিবে ও দিন কাটাইবে।

একদিন ক্ষেপাবাবা নিকটেই কোথায় গিয়াছেন, শিমুলতলায় তাঁহার আসনের সম্মুখস্থ ধুনিটি তখনও জ্বলিতেছে। নিমাই ভাবিল, এই ফাঁকে ধুনি হইতে গাঁজার কল্‌কেতে একটু আগুন নেওয়া যাক। এক টুকরা অঙ্গার টানিয়া নিবার সাথে সাথেই ঘটিল ভীম-ভৈরব-কান্তি ক্ষেপার আবির্ভাব ! সম্মুখে আসিয়াই নিমাইয়ের তলপেটে সজোরে তিনি এক লাথি মারিয়া বসিলেন। তৎক্ষণাৎ সে একেবারে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। বাহ্যজ্ঞান হওয়ার পর নিমাই সবিস্ময়ে দেখে, তাহার প্রাণান্তকর হার্নিয়া রোগ আর নাই। ইহার পর বহুদিন সুস্থ শরীরে থাকিয়া সে সংসারের কাজকর্ম করিয়া গিয়াছে।

শিমুলতলায় ক্ষেপা সেদিন নীরবে শুইয়া আছেন। একটি খাটিয়া বহন করিয়া এ সময়ে কয়েকজন লোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। খাটিয়াটি নামানোর পর দেখা গেল এক করুণ দৃশ্য। একটি যক্ষ্মারোগী মৃতকল্প হইয়া ধুঁকিতেছে।

ক্ষেপা রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কিরে, এটাকে আবার শ্মশানে নিয়ে এলি কেন? জ্যান্ত পোড়াবি নাকি? তা, শালা পাপ করেছে অনেক, জ্যান্তই ঠেঙিয়ে ওকে পোড়া।"

রোগীর এক নিকট আত্মীয় করজোড়ে কাতর স্বরে কহিল, "সেকি বাবা! একে যে আপনার চরণতলে ফেলে রাখবার জন্যেই নিয়ে এসেছি। কোনো চিকিৎসায়ই আজ অবধি ফল হয় নি। মায়ের একমাত্র সন্তান। দয়া ক'রে আপনি ওকে বাঁচান, বাবা।"

"দূর হ' বোদে শালারা! আমি কি ডাক্তার না কবরেজ? তবে আমার কাছে আনা কেন?"

ভক্তেরা ছাড়িবেন না। উত্ত্যক্ত হইয়া ক্ষেপাবাবা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। হঠাৎ রোগীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত দিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বল্ শালা! আর কখনো পাপ করবি?"

এদিকে তো শ্বাসরুদ্ধ হইয়া রোগীর প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম। সকলে আতঙ্কিত হইয়া তখনি খাটিয়ার কাছে ছুটিয়া গেল। সেকি? শেষটায় ক্ষেপাবাবা কি খুনের দায়ে পড়িবেন? ইতিমধ্যে রোগীটি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন, "যা শালা! এবার বেঁচে গেলি?"

কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু লোকটির মূর্ছা ভাঙিয়া যায়। সে উঠিয়া বসিয়া সকলকে বলিতে থাকে, তাহার প্রচণ্ড ক্ষুধা পাইয়াছে, এখনই কিছু খাবার না পাইলে সে বাঁচিবে না। দীর্ঘদিন যে রোগী শয্যায় একটু পাশ ফিরিতে পারে নাই, এভাবে আজ তাহাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া সকলে তো অবাক্।

ক্ষেপাবাবা কহিলেন, "ও শালাকে পেটভরে ঠেসে মায়ের প্রসাদ

খাইয়ে দে। কিছুদিনের জন্য এখানে ওকে রেখে যা, তারা-মায়ের দয়ায় একেবারে ভালো হয়ে যাবে।"

লোকটি ইহার পর সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়।

ক্ষেপাবাবা একদিন ভক্তদল পরিবৃত হইয়া শিমুলতলায় বসিয়া আছেন। হঠাৎ আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "বদ্ শালারা সব আস্‌ছে, বদ্ জিনিস নিয়ে।"

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, দুইটি যুবক কয়েক বোতল বিলাতি মদ, এক হাঁড়ি সন্দেশ ও বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়া সেখানে উপস্থিত। ক্ষেপাবাবাকে তাহারা পানভোজন করাইয়া, সংগীত শুনাইয়া তুষ্ট করিতে চায়।

ক্ষেপা হঠাৎ রুদ্ররোষে জ্বলিয়া উঠিলেন। তারপর শ্মশান হইতে একটা পোড়া কাঠ নিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ মদের বোতল ও মিষ্টির হাঁড়িটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। যুবক দুইটি ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে পলায়ন করিল। পরে জানা গেল, ডার্বি-সুইপের প্রথম পুরস্কারের আশায় ক্ষেপাকে তাহারা প্রসন্ন করিতে আসিয়াছিল।

অনেকের মনের কথা ফাঁস করিয়া দিয়া ক্ষেপা তাহাদের চৈতন্য আনিয়া দিতেন। সেবার এক জমিদার তারাপীঠে পূজা দিতে আসিয়াছেন। মস্ত সমারোহের ব্যাপার। প্রত্যূষে দ্বারকা নদীতে স্নান সমাপন করিয়া তটে দাঁড়াইয়া তিনি জপতপ করিতেছেন। ক্ষেপা এ সময়ে জলে নামিতেছিলেন, জপে নিরত ভদ্রলোকটির দিকে চোখ পড়িতেই তিনি হাসি চাপিতে পারিলেন না। দুষ্টামি করিয়া বার বার তাঁহার গায়ে জল ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন।

ভদ্রলোক ক্রোধভরে চেঁচাইয়া উঠেন, "কোথাকার অসভ্য পাগল। জপ করছি, দিলে আমায় অপবিত্র ক'রে!"

ক্ষেপা উত্তর দিলেন, "তারা-মায়ের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছো, তাঁর নাম জপছো, এর ভেতর আবার ম্যুর কোম্পানীর জুতোর কথা ভাবা কেন, বাবা!"

ভদ্রলোকটি চমকিয়া উঠিলেন! সত্যিই যে তাই। কলিকাতায় গিয়া ঐ কোম্পানীর একজোড়া দামী জুতা কেনার কথা হঠাৎ

তাঁহার মনে উঁকি দিয়াছিল। কে এই অন্তর্যামী পুরুষ, মনের সামান্যতম চকিত চিন্তাও যাঁহার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নাই ?

মন্দিরে ফিরিয়া পাণ্ডাদের কাছে এ ঘটনা জানানোর পর তাহারা বলিল, "ইনি সাধারণ পাগল নন—ইনিই হচ্ছেন তারাপীঠের শিবকল্প মহাপুরুষ বামাক্ষেপা।"

ভদ্রলোকটি ব্যাকুল হইয়া আবার ক্ষেপার দর্শন লাভের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেদিন আর তাঁহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। ক্ষুণ্ণ মনে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।

ক্ষেপা একদিন তারামন্দিরের আঙিনায় বসিয়া আছেন। সম্মুখে একদল দর্শনার্থী শিক্ষিত ভদ্রলোক, তিনি তাঁহাদের সহিত দু-একটি কথা বলিতেছেন। পাশেই একটা পাতায় তারা-মায়ের প্রসাদ রক্ষিত। ক্ষেপা মাঝে মাঝে উহা হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার প্রিয় পার্ষদ কুকুরেরাও ঐ পাত্র হইতে খাদ্য তুলিয়া নিতেছে।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে সাঁইথিয়ার কয়েকটি তরুণও উপবিষ্ট। কুকুরদের সঙ্গে ক্ষেপাবাবাকে একত্রে আহার করিতে দেখিয়া তাঁহাদের বড় ঘৃণা বোধ হইতেছিল। অন্তর্যামী ক্ষেপা বাবার দৃষ্টিতে ইহা এড়ায় নাই। ইঙ্গিতে ঐ যুবক কয়টিকে ডাকিয়া তিনি নিকটে বসাইলেন। তারপর নিজ হস্তদ্বারা তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বাবারা, এবার কি দেখছেন ?"

যুবকদল বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হইয়া গিয়াছে। ক্ষেপাবাবা একি ইন্দ্রজাল সেখানে সৃষ্টি করিয়া বসিলেন! তাহারা দেখিল, মায়ের প্রসাদভোজী ক্ষেপা এবং তাঁহার বয়স্য কুকুরদেরই কেবল মানবাকৃতি, আশপাশের আর সব দর্শনার্থী ভদ্রলোকদের আকার মনুষ্যেতর জীবের। সাপ কুকুর, বিড়াল রূপে এক মুহূর্তে তাহারা পরিণত হইয়া গিয়াছে। শক্তিধর মহাপুরুষ যেন প্রত্যেকের নিজস্ব বৃত্তিকে জন্তু ও সরীসৃপে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, যুবকদের স্বাভাবিক দৃষ্টি ক্ষণপরেই ফিরিয়া আসে

সেদিনকার সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতার সুফল ফলিতে দেখা যায়, তাহাদের চৈতন্যোদয় হয়।

ক্ষেপাবাবা বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ। একবার কোনোমতে তাঁহার মুখের কথাটি আদায় করিতে পারিলে মৃতকল্প রোগী সম্পর্কে লোকের আর ভয় ভাবনা থাকিত না। আবার এ ব্যাপারে মাঝে মাঝে ক্ষেপাকে নিয়া বিপদে পড়িতেও হইত।

সেবার তারাপীঠের নগেন পাণ্ডা ক্ষেপাবাবাকে খুব ধরিয়া বসেন, তাঁহার পরিচিত এক রোগীকে নিরাময় করিতেই হইবে। রোগীটি স্থানীয় জমিদার, নাম পূর্ণচন্দ্র সরকার। ক্ষেপাকে পালকি করিয়া সযত্নে তাঁহার কাছে নিয়া যাওয়া হইল।

পথ চলিতে চলিতে নগেন পাণ্ডা ক্ষেপাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "বাবা, আপনি রোগীর কাছে গিয়ে বলবেন—এই শালা, উঠে বোস্, তোর রোগ সেরে গিয়েছে। আপনাকে আর কিছু করতে হবে না।"

বালকবৎ মহাপুরুষ কহিলেন, "আচ্ছা লগেনকাকা, তাই বলবো। মাঝে মাঝে কথাগুলো শিখিয়ে দেবেন, ভুলে না নাই।"

রোগীর ঘরে গিয়াই কিন্তু তাঁহাকে বলিতে শোনা গেল বিপরীত কথা। বলিলেন, "ও লগেনকাকা, এ শালা তো এখনি ফট্" অর্থাৎ, এ রোগীর আর কোনো আশা নাই, এখনই জীবনান্ত হবে।

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষেপা পালকিতে আসিয়া বসিলেন, রোগীও ত্যাগ করিল শেষ নিশ্বাস।

নগেন পাণ্ডা বড় হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। রোগীর আত্মীয়স্বজন সবাই তাঁহার অনুগত লোক, তাহারা তাঁহাকে বড় ধরিয়া বসিয়াছিল। তিনিও ক্ষেপাবাবার ভরসাতেই আশ্বাস দিয়াছিলেন। বাড়ির পথে ফেরার সময় ক্ষুণ্ণ মনে ক্ষেপাকে অনুযোগ দিতে লাগিলেন, "বাবা, ছি-ছি, এখানে আমার আর মানমর্যাদা কিছু রইল না। এমন জানলে আপনাকে আমি আনতাম না।"

করুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে ক্ষেপা বলিলেন, "লগেনকাকা, তুমি আমার ওপর রাগ ক'রো না। সত্যিই আমার কোনো দোষ নেই। আমি তো

তোমার শেখানো কথাই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা-মা এসে যে কানে কানে বললে—ক্ষেপা, ও কথা মোটেই তুই বলিসনে, বলে দে—ফট্। আমিও তাই বলে ফেললুম।"

বালকস্বভাব এই বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষের অহেতুক আশীর্বাদ অনেক সময় ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিস্মিত করিত। সে-বার একটি তরুণী তাহার পিতার সঙ্গে তারাপীঠের বিগ্রহ ও তারাপীঠভৈরব ক্ষেপা-বাবাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। ইহাদের বাড়ি রামপুরহাটে। শুদ্ধমনে, পবিত্রভাবে, কিছু ক্ষীরের খাবার মেয়েটি তৈরি করিয়া আনিয়াছে।

প্রণাম করিয়া ভক্তিভরে উহা নিবেদন করা মাত্রই ক্ষেপা পরম আনন্দে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বেশ মা, বেশ। তোর ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে।"

কথা কয়টি শুনিয়াই মেয়েটি কাঁদিতে শুরু করিল। দুই নয়নের অশ্রুধারা আর থামিতে চায় না। ক্ষেপা বিব্রত হইয়া পড়িলেন, ভক্তদের জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে, ও কাঁদছে কেন ?"

"বাবা, আপনি তো ঢালাও আশীর্বাদ ক'রে বসলেন, কিন্তু ও যে বিধবা। পুত্র হবার আশা আর কই ?"

"কাঁদিসনে মা, থাম্। যা বলেছি, তা সবই হবে। তারা-মা যে আমাকে বলছেন—তোর ছেলে হবে, লক্ষ্মীও ঘরে থাকবে।"

ক্ষেপার একথা ফলিতে দেরি হয় নাই। কয়েক বৎসর পরে এক ধনবান্ বণিক বৈষ্ণবমতে এই তরুণীর পাণিগ্রহণ করে। সন্তান-সন্ততি বিত্ত-বিষয় সবই এ মেয়েটির হইয়াছিল।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সে-বার তারাপীঠে উপস্থিত হইয়া ক্ষেপা-বাবার শরণ নেন। মহারাজা অপুত্রক, সেইজন্যই শক্তিধর মহাপুরুষের আশীর্বাদ নিতে আসিয়াছেন। সিপাইসান্ত্রী ও জাঁকজমক দেখিয়া, ক্ষেপা সসংকোচে কহিলেন, "নগেনকাকা, এরা সব কারা ?"

"বাবা, ইনি দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, আপনাকে খুব ভক্তি করেন, তাই দর্শন করতে এসেছেন।"

"সেকি কথা ? আমি শ্মশানের ভিক্ষুক, সামান্য লোক। আমার এখানে আবার রাজরাজড়া কেন ? তবে তো এখান থেকে আমায় সরে যেতে হয়।"

সকলে প্রমাদ গণিলেন। অতঃপর মহারাজা সাধারণ বেশে সজ্জিত হইয়া একাকী বাবার চরণ দর্শনে আসেন। মহাপুরুষের আশীর্বাদে তাঁহার মনস্কমনা পূর্ণ হয়, উত্তরকালে তিনি পুত্র লাভ করেন।

ক্ষেপা বলিতেন, "আমি বাবু তোদের শাস্তর-টাস্তর কিছু বুঝিনে, শুধু তারা-মাকে নিয়েই আমার কারবার।" সত্যই তাই! ক্ষেপার সমস্তসত্তায় তাঁহার তারা-মা, আদ্যাশক্তি, ছিলেন ওতপ্রোত। সিদ্ধকাম এই মহাসাধকের সমগ্র জীবন ছিল এক অখণ্ড চৈতন্যে বিধৃত।

খেয়াল-খুশীমতো এক একদিন ক্ষেপা তারা-মায়ের পূজায় আসিয়া বসেন। কিন্তু কোথায় তাঁহার উপচার-উপকরণ ? শাস্ত্রসম্মত প্রথায় পূজোর ধার তিনি কোনোকালেই ধারেন না। ভাবোন্মত্ত অবস্থায় কোনো কোনোদিন মন্দিরে গিয়া তারা-মায়ের বিগ্রহের সম্মুখে ধ্যানস্থ হন। চারিদিকে দণ্ডায়মান থাকে উৎকণ্ঠিত ভক্ত ও দর্শনার্থীর দল, আর থাকে তাঁহার প্রসাদলোভী অনুচর কুকুরগোষ্ঠী। ক্ষেপার পূজায় আসনশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধির বালাই নাই—মন্ত্রতন্ত্র ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানও অবান্তর। আসল উপচার তাঁহার মুখের 'তারা-তারা' রব, আর ভাববিহ্বল আকুতি। কম্পিত হস্তে বিল্বপত্র ও পুষ্পরাজি অঞ্জলি দেন বার বার আর সজল নয়নে বলিতে থাকেন, "এই বেলপাতা লে মা, এই অন্ন লে, এই জল লে, এই ফুলচন্দন আর বলি লে।"

এই পূজা তিনি নিজের খেয়াল-খুশীতেই সমাপ্ত করেন। দেবীর পূজা নয়, এ যেন মায়ের উপর তাঁহার ছেলের সহজ অধিকারের এক অপূর্ব বাল্য-লীলা।

বাহিরের বস্তু অবস্তু, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়া আত্ম-

সমাহিত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব ছিল না, তাহার প্রয়োজনও হইত না। মন্দিরে, শিমুলতলায় ও শ্মশানে সর্বপাশমুক্ত ক্ষেপা দিগম্বররূপে সর্ব সমক্ষে পড়িয়া থাকিতেন। কেহ এ সম্বন্ধে কিছু বলিলে অবলীলায় উত্তর দিতেন, "আমার বাবা নেঙ্‌টা, মা নেঙটা, আমারও তো অভ্যাসটা হওয়া চাই! তা ছাড়া বাপু, আমি তো লোকালয়ে থাকিনে, থাকি আমার মায়ের সঙ্গে, মায়ের শ্মশানে। আমার আবার কাকে ভয়—কাকে সংকোচ!"

তন্ত্রসিদ্ধ মহাশক্তিধর সাধকরূপে বামাক্ষেপার প্রতিষ্ঠা এসময়ে দিগ্‌বিদিক ছড়াইয়া পড়ে। তারাপীঠের পুণ্য ভূমিতে ধীরে ধীরে সমাগত হইতে থাকে অগণিত মুক্তিকামী শক্তিসাধক ও দর্শনার্থীদল। ইহাদের অনেকেরই কাছে ক্ষেপার বাহিরের রূপটি ছিল অতি কঠোর। তাঁহার ভীমভৈরব মূর্তি আর আচার-বিচারহীন বহিরাবরণ প্রায়ই জাগাইয়া তুলিত বিস্ময় ও ভীতিপূর্ণ সম্ভ্রম। কারণচক্র এবং গঞ্জিকার ধূম্রকুণ্ডলী হইতে সত্যকার ব্রহ্মবিদ্ বামাক্ষেপাকে চিনিয়া নিবার সৌভাগ্য কিন্তু অনেকেরই হইত না।

নিজের চারিদিকে কুহেলিকার এক রহস্যময় আবরণ টানিয়া দিয়া ক্ষেপা অনেক সময় অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। আপন অন্তরসত্তার গভীরে, নিভৃত আনন্দে, মহাপুরুষ সদাই থাকিতেন একান্তভাবে ভরপুর। কিন্তু আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়া যে সাধকরা তাঁহার শরণ নিতেন শুধু তাঁহাদের কাছেই প্রকাশিত হইত তাঁহার কৃপাঘন রূপ। লাভ করিত তাঁহারা তন্ত্র-সাধনার গূঢ় নির্দেশ।

সমসাময়িক বাংলার বিশিষ্ট শক্তিসাধকের ভিতর এমন লোক খুব কমই ছিলেন, যিনি তারাপীঠের পবিত্র পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসিয়া সিদ্ধির পাথেয় সঞ্চয় করেন নাই—আর ক্ষেপার বিশাল বক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হন নাই কৃতার্থ। তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ নিগমানন্দ স্বামী এই তারাপুরেরই শ্মশানে আসিয়া ক্ষেপার শরণ নেন, তাঁহার

কৃপায় সমর্থ হন ইষ্টদেবীর সাক্ষাৎলাভে। প্রচারিত ও অপ্রচারিত আরও বহু তন্ত্রসাধক ক্ষেপাবাবার নির্দেশে মহাশক্তির আরাধনায় ব্রতী হন, লাভ করেন পরমা সিদ্ধি।

কৌলমার্গের দুশ্চর তপস্যা ক্ষেপাকে উত্তীর্ণ করে এক বিরাট ব্রহ্মজ্ঞরূপে। যে বিপুল যোগবিভূতি ও অধ্যাত্ম-শক্তি তিনি আহরণ করেন, সাধন জগতে তাহার তুলনা খুব কমই মিলে। অথচ এই অপরিমেয় শক্তিকে ক্ষেপা নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গীতেই চিরদিন বহন করিয়া বেড়াইয়াছেন। যোগবিভূতি সংহরণের এই সামর্থ্য ছিল তাঁহার এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য।

১৩১৮ সালের শ্রাবণ মাস। প্রায়ই চলিয়াছে অবিরাম ধারা বর্ষণ। আজকাল ক্ষেপাবাবা বড় ঘন ঘন সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। সেদিন সারা দিন-রাতের সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া শান্ত স্বরে ভক্তদের ডাকিয়া কহিলেন, "দেখুন বাবারা, সেবারে মোক্ষদানন্দবাবাকে যেখানে সমাধি দিয়েছেন, সেইখানেই যেন এ দেহের সমাধি দেওয়া হয়।"

একি হৃদয়ভেদী কথা বাবা আজ কহিতেছেন! ভক্তেরা বুঝিলেন, তাঁহার তিরোধান আসন্ন। সকলে বড় মুষড়িয়া পড়িলেন।

দেহের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপের দিকে যাইতেছে। কেবলই ২রা শ্রাবণের রাত্রিতে উদ্বেগের আর সীমা রহিল না। নিত্যসঙ্গী ভক্ত, সেবক ও সারমেয় পার্ষদদল, সবারই চোখে মুখে বিষাদের ঘন ছায়া। ক্ষেপা শেষবারের মতো 'তারা-তারা' রবে পীঠস্থান উচ্চকিত করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এ সমাধিই তাঁহার মহা সমাধি।

অর্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া শক্তিসাধনার পূত শিখাটিকে বশিষ্ঠদেবের আসনে বামাক্ষেপা জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন, এবার সেই শিখাটি চিরতরে নির্বাপিত হইয়া গেল।

বালানন্দ ব্রহ্মচারী

"পীতাম্বর, পীতাম্বর! ওরে, আর কবে তুই মানুষ হবি?"

জননীর ক্রুদ্ধস্বর প্রায়ই পঞ্চমে উঠে, কত গালাগালিই করিতে থাকেন। কিন্তু কে তাঁহার কথা শোনে? দুর্দান্ত ছেলেকে নিয়া জননী নর্মদাবাঈ'র দুশ্চিন্তার অবধি নাই। পতির মৃত্যুর পর দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া তিনি পুত্রকে মানুষ করিতেছেন। কিন্তু এ চঞ্চল বালকের দৌরাত্ম্যে স্বস্তিতে তাঁহার নিশ্বাস ফেলিবার যো কই?

উজ্জয়িনীর এক সারস্বত ব্রাহ্মণকুলে এ বালকের জন্ম. শাস্ত্রপাঠ ও গুরুগিরি তাহার কুলগত বৃত্তি। বাড়ির কাছেই এক পণ্ডিতের টোলে তাহাকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পুস্তকের একটি পাতাও তাহাকে উল্টাইতে দেখা যায় না।

অবশ্য পীতাম্বরের সময়ই বা কোথায়? সিপ্রার জলধারার বাঁকে বাঁকে, ভর্তৃহরি এবং গোরখ্‌নাথের গুহায় সব সময়ে সে আনাগোনা করে। কখনো মহাকালের পবিত্র কুণ্ডে, কখনো বা সন্দীপন মুনির জঙ্গলাকীর্ণ আশ্রমে স্বেচ্ছামতো ঘুরিয়া বেড়ায়। ভগ্ন পরিত্যক্ত পুরাতন প্রাসাদ, ভূতের ভয়ে যাহার কাছ দিয়া কেহ ঘেঁষে না, সেখানেই রাতের পর রাত কাটাইয়া বালক বাড়ি ফিরে। এ দুরন্ত ছেলেকে নিয়া নর্মদাবাঈ বড় বিপদে পড়িয়াছেন।

মায়ের উষ্মা একদিন চরমে পৌঁছিল। অবাধ্য ছেলেকে ধরিয়া আনিয়া খুব খানিকক্ষণ তিনি গালাগালি দিলেন। তারপর উত্তেজিত স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ওরে দু'চার ঘর যজমান আর দু'এক বিঘা জমি, সম্বলের মধ্যে তো এই। তাও দেখবার কোনো লোক নেই। নিতান্ত অভাগা তুই, নইলে এ শিশুকালে তোর বাপেরই বা মৃত্যু হবে কেন? তোর ওপরই সব কিছু আশা-ভরসা রেখে আমি বসে আছি। কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট, সংসারের কোনো কাজকর্মই তুই

দেখবিনে। বংশের সবাই ক'রে এসেছে লেখাপড়া, শাস্ত্রপাঠ, তাও তুই করবিনে। হ্যাঁরে, বল্ দেখি, তবে কি তুই—সাধু হবি ?"

পীতাম্বর এতক্ষণ অভ্যাসমতো নীরব ঔদাসীন্যে ভৎর্সনাগুলি হজম করিতেছিল। কিন্তু মায়ের শেষ বাক্যটি তাহার অন্তরে এক বিপ্লব বাধাইয়া দিল।

'সাধু হবি ?'—একি বিচিত্র সম্মোহন এ কথা দুইটিতে! বালকের অন্তর্লোকের দ্বারে কে যেন হঠাৎ এক অদৃশ্য চাবিকাঠি ঘুরাইয়া দেয়, উন্মোচিত হয় বিস্মৃতলোকের এক অর্ধ-আলোকিত দৃশ্যপট। পূর্ব জন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার উদ্‌গত হয়, নূতনতর জীবনের আস্বাদ তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া তোলে। মাতার সম্মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ সে দূরে ছুটিয়া পালায়।

অতঃপর বালক এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসে। যাহা কিছু জামা-কাপড় ছিল সব পোড়াইয়া ফেলে, শরীরে লেপন করে ভস্মরাশি, পরিধান করে কৌপীন। এবার জননীকে গিয়া বলে, "মা—মা, ছাখো ছাখো, সত্যিই আমি সাধু হয়েছি।"

পাগল ছেলের কাণ্ড দেখিয়া মা সরবে হাসিয়া উঠেন।

বালক পীতাম্বরের সেদিনকার এই সাধুবেশ কিন্তু শুধু তামাশাতেই পর্যবসিত হয় নাই। অসতর্ক মুহূর্তে জননী বলিয়াছিলেন,—তবে কি সে সাধু হইবে ? সেই কথারই গুঞ্জরণ বার বার চলিতে থাকে তাঁহার অন্তরে।

অল্প কয়েকদিন পরের কথা। শুভদিন দেখিয়া জননী পীতাম্বরের উপনয়ন সংস্কার করান, ইহার তিন-চারদিনের মধ্যেই বালক হঠাৎ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সংসারের কোনো আকর্ষণ, কোনো বন্ধনই তাহাকে সেদিন আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। বয়স তাহার তখন মাত্র নয় বৎসর—নিতান্তই এক অবোধ বালক। কোথায় কোন্ দেশে সে চলিয়া গেল, কে জানে ? বিধবা জননীর একমাত্র ভরসা ছিল পীতাম্বর, ছিল তাঁহার নয়নের মণি। আজ তাহার বিহনে দুই চোখে নামিয়া আসিল অন্ধকার।

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম, মহাকাল বিগ্রহ, বিরাজিত রহিয়াছেন উজ্জয়িনীর উপান্তে। নর্মদাবাঈ এই মহাকালের মন্দিরে দিনের পর দিন মাথা খুঁড়িতে থাকেন পুত্রের কল্যাণ কামনায়, তাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আকুতি জানান বার বার।

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়। তারপর হঠাৎ একদিন নামিয়া আসে মহাকালের কৃপার ধারা, নর্মদাবাঈ ফিরিয়া পান তাঁহার নয়নমণি পীতাম্বরকে।

লোকমুখে পুত্রের সংবাদ পাইয়া পাগলিনীর মতো জননী সেদিন দেওঘরের তপোবন পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে এক মিলন-দৃশ্য উদ্ঘাটিত হয়।

বেলা গড়াইয়া পড়িয়াছে, আকাশের বুকে ভাসিয়া চলিয়াছে কুলায়গামী পাখির ঝাঁক। বৃদ্ধা নর্মদাবাঈ আকুল কণ্ঠে ডাকিতেছেন, "পীতাম্বর! আমার পীতাম্বর।"

কাহার এ মর্ম আলোড়নকারী আহ্বান? চঞ্চল চরণে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান এক সুদর্শন সন্ন্যাসী। আননে তাঁহার গুম্ফ-শ্মশ্রুরাজি, শিরে প্রকাণ্ড জটার ভার। মুহূর্তে কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল, ভাবাবেগে কম্পিত সন্ন্যাসী পতিত হইলেন বৃদ্ধার চরণে। মধুর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিলেন, "মা।"

চল্লিশ বৎসর পরে জননীর কানে হৃদয়-জুড়ানো ডাক আবার পৌঁছিল। সন্ন্যাসীর চিবুকে হাত দিয়া নর্মদাবাঈ তাঁহার চোখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। হ্যাঁ, এই তো তাঁহার পীতাম্বর! এই তো তাঁহার গৃহত্যাগী উদাসী পুত্র।—আজিকার দিনে সে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে বহু-বিশ্রুত যোগী, বালানন্দ ব্রহ্মচারী নামে।"

মাতা পুত্রের মিলনে নিস্তব্ধ গিরিশিখরে সেদিন আনন্দের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। সজল নয়নে জননী সবাইকে বার বার কহিতে লাগিলেন তাঁহার এ হারানো রত্ন উদ্ধারের কাহিনী।

ধ্যানধারণা ও শিবার্চনার মধ্য দিয়া উজ্জয়িনীতে তাঁহার দিন

কাটিয়া যাইতেছিল। শুদ্ধসত্ত্ব সাধিকা একদিন বুঝিতে পারিলেন, অন্তিম সময় তাঁহার এবার ঘনাইয়া আসিতেছে। হারানো পুত্রের জন্য অন্তরে বার বার জাগিয়া উঠিতেছে হাহাকার। মহাকালের চরণে নিবেদন করিলেন প্রাণের সংকল্প, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার আগে একবার তিনি জীবনসর্বস্ব পীতাম্বরকে যেন দেখিতে পান। ইষ্টদেব তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ করিয়াছেন।

সেদিন তিনি শিবজীর পূজার পর পুত্রের কথা ভাবিয়া কাঁদিতে-ছিলেন। প্রভু আবির্ভূত হইলেন, স্নেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, 'বেটি তোর প্রার্থনা অচিরে পূর্ণ হবে। বৈদ্যনাথধামের তপোবন পাহাড়ে তোর পুত্র রয়েছে তপস্যারত। তার এখনকার নাম—বালানন্দ। সেখানে চলে যা, হারানো পুত্রকে আবার তুই ফিরে পাবি।'

জমিজমা যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল বিক্রয় করিয়া, নর্মদাবাঈ এক-দল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে উজ্জয়িনী ত্যাগ করেন। বহুস্থানে পর্যটনের পর উপস্থিত হন তপোবন পাহাড়ে। এখানে মহাকালের কৃপায় মিলন ঘটে তাঁহার পুত্রের সঙ্গে। জননীর মনে সংকল্প ছিল যদি তাঁহার শেষ অভিলাষ পূর্ণ হয়, তবে ভক্তিভরে সওয়া লক্ষ বিল্বপত্র উৎসর্গ করিয়া দেবাদিদেব মহেশ্বরের তিনি পূজা দিবেন।

একথা শুনিয়া বালানন্দজী সোৎসাহে সকল কিছু বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সংকল্পিত পূজা সমাপ্ত হইল। অতঃপর কিছুদিন পুত্রের সেবা পরিচর্যা গ্রহণ করিয়া নর্মদাবাঈ প্রস্থান করিলেন সাধনোচিত ধামে।

'পীতাম্বর' বলিয়া স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বালানন্দকে ডাকিবার আর কেহ এ সংসারে রহিল না।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে, এক ধর্মপ্রাণ সারস্বত ব্রাহ্মণ বংশে বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃপুরুষ শাস্ত্রচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ থাকিলেও, বাল্যকালে বালানন্দ শিক্ষালাভের উপযুক্ত সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। তারপর নবম বৎসর বয়সে বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ায় চিরতরে তিনি ঘর-সংসার পরিত্যাগ করেন।

উপনয়ন সংস্কার মাত্র কয়েকদিন হয় সম্পন্ন হইয়াছে। ইতিমধ্যে ত্যাগপূত জীবন গ্রহণের সংকল্প তিনি স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। অতঃপর সুযোগ বুঝিয়া একদিন নিশাকালে জননী ও আত্মীয়-বন্ধুদের অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া পড়িলেন ঘর হইতে।

কোথায় কোন্‌দিকে যাইবেন, কিছু ঠিক নাই। একমনে শুধু গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন।

অনির্দেশ্যভাবে পীতাম্বর পথ চলিতেছেন, চোখে মুখে উদাসীন ভাব, এক চতুর পথচারীর দৃষ্টি তাঁহার দিকে পতিত হইল। উপনয়নের সময় সোনার বালা, হার, মাকড়ি, বালককে দেওয়া হইয়াছিল, তখনও সেগুলি তাঁহার অঙ্গে রহিয়াছে। চতুর পথচারীটি সহজেই বুঝিয়া নিল, ঝোঁকের বশে বালক ঘর ছাড়িয়া পালাইতেছে, এবার সুযোগমতো তাহার সোনার গহনাগুলি হস্তগত করা দরকার।

ভয় দেখাইয়া সে কহিল, "বাছা, যাচ্ছো তো তুমি অনেক দূরে, দেশ-দেশান্তরে—কিন্তু এসব অলংকার পরে থাকলে চোর-ডাকাত যে পিছু লাগবে। প্রাণহানির আশঙ্কাও রয়েছে। এগুলো বরং আমার কাছে গচ্ছিত রেখে যাও, ফেরবার পথে আবার নিয়ে যেও।"

নির্বিকার চিত্তে পীতাম্বর অলংকারগুলি খুলিয়া দেন। আবার নিরুদ্দেশের যাত্রা শুরু হয়। সৌভাগ্যক্রমে এক সাধুর সঙ্গে পথে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। ইনি নর্মদা-পরিক্রমায় যাইতেছেন, ইঁহার সঙ্গে পীতাম্বর ভিড়িয়া পড়িলেন। নর্মদার তীর ধরিয়া চলিয়া উভয়ে উপনীত হইলেন গঙ্গোনাথে, ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আশ্রমে।

বরোদা শহর হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে নর্মদাতটে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ গঙ্গোনাথ বিগ্রহ বিরাজিত। ইঁহারই এক পাশে মহাযোগী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের আসনটি পাতা রহিয়াছে। সম্মুখে অখণ্ড ধুনি ও অখণ্ড দীপক প্রজ্বলিত। মহাপুরুষের চরণোপান্তে একটিবার বসামাত্র বালক পীতাম্বরের জন্ম-জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কার জাগিয়া উঠিল। ব্যাকুলভাবে তিনি প্রার্থনা জানাইলেন, "মহারাজ, আমায় কৃপা করুন, আপনার আশ্রয় দিয়ে আমায় রক্ষা করুন।"

দেখা গেল, বালকের এখানে আগমনের রহস্য, নাম-ধাম সব যোগীবর জ্ঞাত আছেন। প্রসন্নমধুর হাস্যে কহিলেন, "বেটা, এ তো খুব ভালো কথা। আসছে শ্রাবণী পুর্ণিমায় দিনটি শুভ, ঐ দিনই তোমায় আমি দীক্ষা দেব। কিন্তু তার আগে তুমি গাঁয়ে গিয়ে ভিক্ষা ক'রে আনো। তোমার দীক্ষার দিনে গাঁয়ের লোক আর নর্মদার সাধুদের ভোজন না করালে চলবে কেন?"

মহাপুরুষের কৃপা ও আশ্রয় পাওয়া যাইবে, এ যে পরম সৌভাগ্যের কথা। তাছাড়া, পীতাম্বর শুনিয়াছেন, আজ অবধি ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কাহাকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন নাই। তাই এ আশ্বাসবাণী শুনিয়া তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। আবার এই সঙ্গে দুশ্চিন্তাও হইল। দীক্ষার দিন বহু লোককে যোগীবর খাওয়াইতে চাহেন। কিন্তু সে সামর্থ্য পীতাম্বরের কই?

অন্তর্যামী মহাপুরুষ বালকের মনের কথা বুঝিয়া নিলেন। এবার সহাস্যে নিজের ভিক্ষার ঝুলিটি অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া কহিলেন, "বাচ্চা, তুমি তো জানো না, আমার এই ভিক্ষার ঝুলির ভেতর ঋদ্ধি সিদ্ধি দুই-ই রয়েছে। কোনো চিন্তা ক'রো না তুমি।"

ব্রহ্মানন্দজীর এই ঝুলিটির অলৌকিক শক্তির কথা সে অঞ্চলে প্রচারিত ছিল। স্থানীয় সাধু-সন্তদের বিশ্বাস ছিল, এই ঝুলির কল্যাণেই গঙ্গোনাথ আশ্রমের অধিবাসী ও অভ্যাগত সাধু-সন্তদের ভোজনের ব্যবস্থা অবলীলায় সম্পন্ন হইয়া যাইত।

পীতাম্বর এবার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে থাকেন। নবীন সাধকের সুন্দর সুঠাম রূপ ও ত্যাগ-বৈরাগ্য দর্শনে সকলেই মোহিত। তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য সাধারণ গ্রামবাসী হইতে শুরু করিয়া বড় বড় পাটিদারেরা উৎসাহী হইয়া উঠে। ভারে ভারে আটা-ময়দা ঘি ব্রহ্মানন্দজীর এই বালক শিষ্যের দীক্ষা অনুষ্ঠানের দিনে তাহারা পাঠাইতে থাকে। মহাত্মার ভিক্ষা-ঝুলির প্রতাপ পীতাম্বর এবার উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।

নির্দিষ্ট শুভলগ্নে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রতে

দীক্ষা দিলেন, নূতন নামকরণ হইল, বালানন্দ। জ্যোতিঃমঠের আনন্দ উপাধিকারী সাধুকুলের অন্তর্ভুক্ত হইলেন পীতাম্বর।

দীক্ষা শেষে বালানন্দ করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, গুরুদক্ষিণা কি দেব, তা আমায় আদেশ করুন।"

মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, "বৎস, সদ্‌গুরু থাকেন সব কিছু চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে, তাঁকে তুমি কোন্ জাগতিক বস্তু দিয়ে খুশী করবে, বলতো? শুধু একটি হরিতকী আমায় দাও। আর স্মরণ রেখো, প্রকৃত গুরুদক্ষিণা ঋদ্ধিতেই নেই, রয়েছে সিদ্ধিতে। আমার দেওয়া এই বীজমন্ত্র সাধন ক'রে যে সিদ্ধি তুমি অর্জন করবে, তাই তুমি আমার উদ্দেশে নিবেদন করো। এই হবে প্রকৃত গুরুদক্ষিণা। আর এতেই আমি প্রসন্ন হবো।"

নবীন ব্রহ্মচারী এবার সাধন-ভজনে রত হইলেন। শক্তিধর গুরুর প্রকৃত স্বরূপ চেনা ভার। এই মহাপুরুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়া, তাঁহার যোগবিভূতির লীলা দেখিয়া শিষ্যের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পশ্চিম ভারতে, বিশেষত বরোদা, আমেদাবাদ ও বোম্বাই অঞ্চলে এই সিদ্ধ মহাপুরুষের তখন খ্যাতি-প্রতিপত্তির অন্ত নাই। নর্মদা পরিক্রমাকারী সাধুদের চোখেও তাঁহার মর্যাদা অসামান্য।

গঙ্গানাথ আশ্রমে সাধুসন্ত অতিথিদের সেবা ও অন্ন বিতরণ লাগিয়াই আছে। প্রতি বৎসরই দুই একটি সমারোহপূর্ণ যজ্ঞ সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া, অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষের সময় আশ্রমের দ্বার নিরন্নদের জন্য সর্বদাই থাকে উন্মুক্ত। বলা বাহুল্য, এসব সংকটের সময়ে প্রয়োজনীয় যত কিছু দ্রব্য সরবরাহ করেন ব্রহ্মানন্দ মহারাজের গুণমুগ্ধ ভক্তের দল।

যোগসিদ্ধ শক্তিধর মহাপুরুষের ঋদ্ধি ও সিদ্ধির নানা চমকপ্রদ কাহিনী এ অঞ্চলে সে সময়ে প্রায়ই শুনা যাইত।

একবার মহা সমারোহে ভাণ্ডারা চলিতেছে। ভোজন-পর্ব প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে কয়েক শত লোক আসিয়া উপস্থিত। তৈরী খাদ্যের পরিমাণ খুব কমিয়া আসিয়াছে, তাই আশ্রম ভাণ্ডারের কর্তা ভীত হইয়া অভ্যাগতদের জন্য ছোট ছোট খিচুড়ির গোলা তৈয়ার করা শুরু করিলেন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তো ইহা দেখিয়া চটিয়া আগুন!

কর্মকর্তাকে ডাকিয়া কহিলেন, "মুঝে মালুম হোতা হ্যায়, তুম্ বাঙ্গালীকা লেড়কা, কম্‌তি খানেওয়ালা। কাহে অন্ন ইত্‌নি কম্‌তি দেতে হো? তুম্ পুরা পুরা দেও, তুমহারি কুছ চিন্তা নেহী।"

একথা বলিয়া মহারাজ তখনি নিজ হাতে বাঁধিয়া দেখাইলেন গোলার আকার কতটা বড় হইবে। কাজকর্মের শেষে সকলে কিন্তু সবিস্ময়ে দেখিলেন, যোগীবরের স্পর্শের প্রভাবে এতো লোককে খাওয়ানোর পরেও ভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্য মজুত রহিয়াছে।

স্থানীয় অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইলেই ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার ঝুলিটি নিয়া বাজারে বাহির হইতেন। সাধারণের চোখে ইহা ছিল—অন্নপূর্ণা-মাঈর সিদ্ধ-ঝোলা। সকলে সোৎসাহে এ ঝুলির সামনে টাকাকড়ি ও আহার্যের উপকরণ ঢালিয়া দিত। তারপর মহারাজের খিচুড়ি-গোলা চারদিকের আট-দশখানি গ্রামের বুভুক্ষুদের ক্ষুধা মিটাইত।

বরোদার গায়কোয়াড় ও মহারানী এই মহাপুরুষের খুব ভক্ত ছিলেন। সদানন্দময় ব্রহ্মানন্দজী এক একদিন বরোদা প্রাসাদে গিয়া হাসির তুফান ছুটাইতেন। একবার গায়কোয়াড় শিউজী রাওকে তিনি হাসিতে হাসিতে বলেন, "মহারাজ, আপনার নাকি একটা চাঁদির তোপ আছে, তার গোলা এক মাইল অবধি যায়?"

গায়কোয়াড় কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা, যা শুনেছেন তা সত্য, ঐ গোলা এক মাইল যায় বটে।"

"আপনার গোলার দৌড় মাত্র এক মাইল, আর আমার গোলা যায় দশ ক্রোশ! তবে এটাও শুনে নিন, আপনার গোলা চাঁদির তোপের, আর আমার গোলা—খিচুড়ির।"

উপস্থিত সকলেই ব্রহ্মানন্দ মহারাজের এ কৌতুকে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বরোদার রানী যমুনাবাঈ একবার তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। নবদীক্ষিত বালানন্দজীও গুরুর সঙ্গে চলিয়াছেন। পথিমধ্যে এক পরিচিত গ্রাম্য ভক্ত বাবা মহারাজকে ধরিয়া ফেলিল। অনেক দিন সে তাঁহার দেখা পায় নাই; তাই উৎসাহের সহিত ভিক্ষার ঝুলিটি ভর্তি করিয়া একগাদা শাকসবজি দিয়া দিল।

প্রাসাদে পৌঁছিবামাত্র রানী যমুনাবাঈ সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "দেখে মনে হচ্ছে, আজ আমাদের ভাগ্য খুব ভালো। বাবা মহারাজের ঝোলা একেবারে ভর্তি। নিশ্চয় আমরা অনেক কিছু উপাদেয় বস্তু আজ খেতে পাবো।"

"মাঈ, ঠিক বলেছ। অনেক প্রসাদ তোমরা আজ এ ঝুলি থেকে পাবে।" সোৎসাহে বলিয়া বসেন ব্রহ্মানন্দজী, "বল দেখি, কার কি চাই।"

"মহারাজ, আঙুর খেতে আমাদের বড় ইচ্ছে হয়েছে," রানী যমুনাবাঈ ভাবিয়াছিলেন, 'আঙুরের সময় এখন মোটেই নয়, দেখি যোগীবর তাঁর অন্নপূর্ণার ঝোলা থেকে এখনি তা বার ক'রে দিতে পারেন কিনা।'

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ সেই মুহূর্তেই এক থোলো আঙুর উহার ভিতর হইতে টানিয়া তুলিলেন। সহাস্যে কহিলেন, "এই দ্যাখো, আমার মাঈর জন্য তো আঙুর ঠিকই মিলেছে।"

শিষ্য বালানন্দজী সঙ্গে আসিবার সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, বাবা মহারাজের গ্রাম্য ভক্তটি তাঁহার এই ঝুলিটি কেবল শাকসবজি দিয়াই ভরিয়া দিয়াছে। তাছাড়া, এ ঋতুতে আঙুর পাওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। এ সময়ে ঝুলিতে ঐ দুষ্প্রাপ্য ফলের আবির্ভাব দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

পরিহাসপ্রিয়তা ও আনন্দ-রঙ্গের অন্তরালে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহার অসামান্য যোগশক্তিকে রাখিতেন সংগোপিত, তাই নর্মদার এই বরপুত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা বড় সহজ ছিল না।

এই শক্তিধর যোগীর আশীর্বাদ ও কৃপা কত সাধক ও মুমুক্ষুর জীবনকে যে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কিশোর বালানন্দের মাথায় তখন পরিক্রমা সমাপ্ত করার ঝোঁক চাপিয়া বসিয়াছে। গঙ্গোনাথ আশ্রমে সাত-আট মাস থাকার পর তিনি আবার নর্মদার তীর ধরিয়া অগ্রসর হইলেন।

এই যাত্রাপথে প্রখ্যাত সাধু গৌরীশঙ্কর মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। বৎসরের পর বৎসর এই মহাত্মা নর্মদা পরিক্রমা করিয়া বেড়াইতেন। অপরিমেয় ঋদ্ধি ও সিদ্ধি ছিল তাঁহার করতলগত। যোগ-বিভূতির লীলা প্রায়ই তাঁহার চলাফেরার মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিত।

সঙ্গে অজস্র শিষ্য, ভক্ত ও অনুরাগীর দল। সদাব্রত ও ভাণ্ডারা জমায়েতের মধ্যে লাগিয়াই আছে, মহাপুরুষ যখনই নদীতটের যে ঘাটে বা যে মন্দিরে যান 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবে সে অঞ্চল মুখরিত হইয়া উঠে।

যোগীবর ব্রহ্মানন্দের সহিত গৌরীশঙ্করজীর নিবিড় সখ্য ছিল। কিশোর বালানন্দকে তাঁহারই দীক্ষিত শিষ্য জানিয়া পরম সমাদরে তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

এই শক্তিধর যোগী ছিলেন বালানন্দ ব্রহ্মচারীর শিক্ষাগুরু। তরুণ সাধক ইঁহার সহিত সাত-আট বৎসর অতিবাহিত করেন।

অতঃপর বালানন্দজীর জীবনে শুরু হয় দীর্ঘ পরিব্রাজনের পালা। অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় ভারতের অগণিত তীর্থ ও জনপদে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। পর্যটনের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দীক্ষাগুরু ব্রহ্মানন্দ মহারাজের চরণোপান্তেও তিনি উপনীত হইতেন। এ সময়ে যোগসাধনার নানা নিগূঢ় পদ্ধতি শিক্ষার সুযোগ তাঁহার মিলিত। গুরুদেবের দেহরক্ষার কাল অবধি গঙ্গোনাথে এভাবে তিনি যাতায়াত করিতেন।

নর্মদার পরিক্রমণ ছিল বালানন্দজীর জীবনের এক পবিত্র ব্রত।

এ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে গিয়া তাঁহাকে বহু কষ্ট বরণ করিতে হয়, জীবনও বিপন্ন হয় বার বার।

একবার নর্মদাতীরের মাণ্ডলা নামক স্থানে বালানন্দজী উপনীত হইয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার রহিয়াছে একটি উদাসী সাধু। উভয়েরই হাতে একটি করিয়া ঝোলা এবং বস্ত্র-কম্বলের পুঁটুলী। সে সময়ে ঐ অঞ্চলে প্রায়ই চুরি-ডাকাতি হইতেছিল, কমিশনার সাহেব স্বয়ং এজন্য পরিদর্শন কার্যে আসিয়াছেন। বাংলোর সম্মুখে তরুণ সাধু দুইটিকে দেখিয়া তখনি তাঁহাদের ধরিয়া আনাইলেন। তাঁহার সন্দেহ, এইসব অল্পবয়স্ক সাধুরাই সুযোগ পাইলে চুরি-ডাকাতি করে, তারপর বনাঞ্চলে উধাও হইয়া যায়।

সাধুদ্বয়ের ঝোলার ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া গেল ছোট দুইটি শাবল ও কুঠার। সাহেব রক্তচক্ষু হইয়া কহিলেন, "এবার প্রমাণ মিলেছে, তোমরা ওসব দিয়ে সিঁদ কাটো, আর চুরি-ডাকাতি করো।"

বালানন্দ বার বার বুঝাইতে থাকেন, "সাহেব, তা নয়, এ শাবল দিয়ে আমরা কন্দমূল খুঁড়ে বার করি, তা খেয়ে প্রাণ বাঁচাই। আর এ লোহার টাঙ্গী কাজে লাগে পর্ণকুটির বাঁধবার সময়।"

কিন্তু এ ধরনের যুক্তিতে কর্ণপাত করে কে? সাহেবের হুকুমে চাপরাশীরা সাধুদের পৌটলা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল, তল্লাসীর ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল হইল। দেখা গেল, একটি মোড়কে বেশ কিছুটা গাঁজা ও শঙ্খবিষ জড়ানো রহিয়াছে।

সাহেব গর্জিয়া উঠিলেন, "দেখছি তোমরা শুধু চোর-ডাকাতই নও, খুনী দস্যুও বটে। এত বেশী পরিমাণ শঙ্খবিষ সঙ্গে নিয়ে চলছো কেন? নিশ্চয়ই গোপনে এ খাইয়ে তোমরা মানুষ খুন করো। দাঁড়াও, তিন বৎসর ক'রে তোমাদের জেল খাটাচ্ছি।"

বালানন্দ তাঁহাকে প্রাণপণে বুঝাইতে লাগিলেন, গাঁজা ও শঙ্খবিষ পরিব্রাজন-রত সাধুদের প্রায়ই দরকার হয়। বিশেষত তীব্র শীতের রাতে, নর্মদার অনাবৃত তটে, এ বস্তু ছাড়া মোটেই চলে না। শীত নিবারণে শঙ্খবিষ বড় কার্যকরী।

সাহেব কিন্তু কিছুতেই তাঁহার একথা মানিয়া নিতে রাজী নন। ধমকাইয়া কহিলেন, "সাধু, এ শঙ্খবিষ এখনি আমার সামনে খেয়ে দেখাতে হবে, নইলে জেল খাটতে হবে পুরো তিনটি বৎসর।"

বালানন্দজী প্রমাদ গণিলেন। জেল ভোগ করার চাইতে বরং শঙ্খবিষ খাওয়াই ভালো। প্রাণ যায় যাইবে, কয়েদখানার অনাচারের মধ্যে তো আর মৃতকল্প হইয়া থাকিতে হইবে না। মোড়কের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ বিষ ছিল, সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সবটাই তিনি একবারে উদরস্থ করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝিয়া নিলেন, এ বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু তাঁহার অনিবার্য! বাংলোর সীমানার বাহিরে, এক বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি সঙ্গী সাধুটিকে বলিলেন, "ভাই, আমার কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসছে, চোখে অন্ধকার দেখছি। কিছুক্ষণের ভেতরেই মৃত্যু ঘটবে আমার। তোমার কাছে আমার অনুরোধ, মৃত্যুর পর এ দেহটাকে নর্মদার পবিত্র জলে ফেলে দেবে। তারপর তুমি যেথায় ইচ্ছে চলে যেও।"

দেহ অসাড় হইয়া আসিয়াছে, চেতনা বিলুপ্ত হওয়ার আর দেরি নাই। এমন সময়ে অন্তরে তাঁহার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল নর্মদামাঈর জ্যোতির্ময়ী মূর্তি! স্নেহপূর্ণ বচনে দেবী অভয়দান করিলেন, তারপর হইলেন অন্তর্হিতা। অতঃপর বালানন্দজীর সংবিৎহারা দেহটি ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে সাহেবের বাংলোয় এক হুলস্থুল পড়িয়া যায়। তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রটি শিকার হইতে খানিকটা আগে ফিরিয়া আসিয়াছে। সঙ্গীদের সহিত বসিয়া এক কাপ চা খাওয়ার পরই অকস্মাৎ তাহার ভেদবমি শুরু হয়। নিকটস্থ শহর হইতে ডাক্তার ডাকিয়া আনার পূর্বেই যুবকটির মৃত্যু ঘটিল।

কমিশনারের পুত্রের অসুখ শুনিয়া স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এসময়ে দেখা করিতে আসেন। সাধুটিকে অচেতন অবস্থায় বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। শুনিলেন, সাহেব

তাহাকে আটক করিয়াছেন, এবং শঙ্খবিষ পান করিয়া সে মৃতকল্প হইয়া আছে।

সাহেবকে তিনি বুঝাইলেন, সর্বত্যাগী সাধুটিকে এভাবে নির্যাতন করা মোটেই ভালো হয় নাই। চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করিয়া তুলিয়া অগৌণে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, সাহেব ইতিমধ্যে নরম হইয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসী দুটিকে তখনি তিনি ছাড়িয়া দিবার নির্দেশ দিলেন। ডাক্তারী ঔষধ দ্বারা বালানন্দজীকে বমন করানো হইল, ক্রমে তিনি বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন।

পূর্বোক্ত ভদ্রলোকটির গৃহে কয়েকদিন বিশ্রাম করার পর তিনি কর্মক্ষম হইয়া ওঠেন। আবার শুরু হয় নর্মদা পরিক্রমা।

অনেকদিন পরে ঐ সাহেবের সঙ্গে নদীতীরের এক বনে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তখন হাতে একটি শাবল নিয়া কন্দমূল উঠাইতে ব্যস্ত ছিলেন। সাহেব চিনিলেন, এটি সেদিনকার শঙ্খবিষ-ভোজনকারী সাধু। বালানন্দ হাসিয়া কহিলেন, "সাহেব, এবার তো নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছো, শাবল দিয়ে আমরা সিঁদ কাটিনে—বনজঙ্গল থেকে আমাদের আহার্য কন্দমূল খুঁড়ে বার করি।"

সাহেবের মনোভঙ্গীর এবার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সলজ্জভাবে তিনি হাসিতে লাগিলেন। বালানন্দকে কিছু অর্থ ভেট দিবার জন্য তিনি এসময়ে খুব পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে রাজী করানো গেল না। স্মিতহাস্যে উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিলেন, "সাহেব, আমরা বনবাসী সাধু, টাকা নিয়ে কি করবো? টাকা নেবার ইচ্ছেই নেই, তাছাড়া, টাকা দিয়ে এ অঞ্চলে কিছু কেনাও যায় না।"

সাহেব সসম্ভ্রমে টুপী উঠাইয়া স্থান ত্যাগ করিলেন।

নর্মদা পরিক্রমাকারী সাধুসন্তদের বিশ্বাস, এ পথের জলে-জঙ্গলে সর্বত্র বিস্তারিত রহিয়াছে নর্মদামাঈর করুণা ও অলৌকিক শক্তি-বিভূতি। দেবী সর্বদাই তাঁহার ভক্ত সাধুসন্তদের রক্ষা করেন। পরি-

ব্রাজক বালানন্দের সারাজীবনের এক বিশিষ্ট অধ্যায় ছিল নর্মদা পরিক্রমণ। গোড়ার দিকে গৌরীশঙ্করজীর জমায়েতে, তারপর অপর সাধুমণ্ডলীর সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিক্রমার কালে তিনি বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, দেবীর ঐশী শক্তির নানা প্রকাশও তাঁহার সাধক-জীবনকে প্রভাবিত করে।

একবার বালানন্দজী একদল সাধুর সঙ্গে নদীতটের এক অরণ্য দিয়া পথ চলিয়াছেন। সায়ং-সন্ধ্যা তখন অতিক্রান্ত। কৃষ্ণপক্ষের রাত, চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। সারাদিন পথ চলিয়া সাধুরা সবাই অবসন্ন, ক্ষুৎপিপাসায় আর নড়িতে পারিতেছেন না। হঠাৎ সকলে দেখিলেন, বৃক্ষতলে এক ভীল রমণী তাহার গাভীটি সঙ্গে নিয়া চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

বালানন্দজী নিকটে গিয়া কহিলেন, "মাঈ, বড় ভালো হল তোমার দর্শন পেয়ে। আমরা সবাই ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, রাত্রির মতো এই বৃক্ষতলে আশ্রয় নেব স্থির করেছি। এখানকার পথঘাট আমাদের জানা নেই। আমাদের জন্য শিগ্‌গীর তুমি তোমার গাঁ থেকে কিছু খাবার নিয়ে এসো। আমাদের প্রাণ বাঁচাও।"

ভীল রমণীর নয়নে হাসির ঝলক। কহিল, "বাছা, তোমাদের কিছু চিন্তা নেই। আমার এই গরুর দুধ থেকেই তোমাদের আজকের ক্ষুৎপিপাসা সব মিটে যাবে। পাত্র নিয়ে একে-একে দাঁড়াও, আমি দুধ দুয়ে দিচ্ছি তোমরা ইচ্ছেমতো পান করো।"

জলপাত্র হিসাবে সাধুদের সবার সঙ্গে আছে এক একটি লাউয়ের তুম্বা। রমণী তাহাতে দুধ যোগান দিতেছে, আর সাধুরা একের পর এক আকণ্ঠ পান করিতেছেন। সকলের দুগ্ধপান সমাপ্ত হওয়ার পর ভীল রমণী গাভীটিসহ অরণ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এবার সাধুদের হুঁশ হইল। তাঁহারা সংখ্যায় তো নিতান্ত কম নন। এতগুলি লোকের ক্ষুৎপিপাসা কি করিয়া এই গাভীর দুগ্ধে মিটিয়া গেল? এ তো সত্যই বড় বিস্ময়ের কথা! তাছাড়া এই ভীল রমণীই বা কে? কি জন্যই বা দুগ্ধবতী গাভীটিসহ রাত্রে এই জনহীন

অরণ্যে সে অপেক্ষা করিতেছিল? নিকটে কোথাও গ্রামের চিহ্ন তাঁহারা দেখেন নাই। সে তবে কোথায় গেল?

প্রবীণ সাধুরা কহিলেন, "ভীল রমণীর ছদ্মবেশে স্বয়ং নর্মদামাঈ-ই আজ এভাবে আমাদের কৃপা ক'রে গেলেন। এ অঞ্চলে মায়ের কৃপা এমনি ক'রেই সতত ঝরে পড়ে।"

উত্তরকালে বালানন্দ বলিতেন, পরিক্রমাকালে আরও কয়েকবার নর্মদামাঈর অলৌকিক আবির্ভাব তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। দেবীর কল্যাণহস্ত একাধিকবার গহন অরণ্যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

সে-বার বালানন্দজী কামাখ্যা তীর্থে উপনীত হন। দেবীবিগ্রহ দর্শনের পর একাদিক্রমে কয়েকদিন তিনি পাহাড়ের উপর সাধন-ভজনে অতিবাহিত করেন। তারপর এ অঞ্চলের অরণ্যপ্রদেশ পর্যটন করিবার কালে হঠাৎ একদিন মারাত্মক কলেরায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। জোর ভেদবমি শুরু হয়। মনে মনে ভাবিতে থাকেন, এ জনশূন্য স্থানে চিকিৎসক কোথায় পাওয়া যাইবে? এ মারাত্মক ব্যাধির হাত হইতে আর নিষ্কৃতি নাই, মৃত্যু অনিবার্য।

শরীর একেবারে অবসন্ন। সারা অন্তর পরমাত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট করিয়া নিস্পন্দভাবে তিনি শয়ন করিয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলেন, এক দিব্য কুমারী মূর্তি তাঁহার সম্মুখে। মৃদুকণ্ঠে তিনি কহিতেছেন, "ব্রহ্মচারী, তুই ভাবিস্‌নে। এবার তোর মরা হবে না। বেঁচে উঠবি। কিন্তু শিগ্‌গীর এখান থেকে প্রস্থান করিস।"

এ দৈবী নির্দেশের পর মূর্তিটিকে আর দেখা গেল না। অতঃপর বালানন্দ গভীর সুপ্তিতে মগ্ন হইয়া পড়িলেন।

পরের দিন নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলেন, ঐ মারাত্মক রোগ এক রাত্রির মধ্যে একেবারে নিরাময় হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, প্রবল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। দুর্বল দেহটি নিয়া গড়াইতে গড়াইতে দূরস্থিত এক কূপের সম্মুখে গিয়া কোনোমতে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার অনুরোধে গ্রামের মেয়েরা মাথায় জল ঢালিয়া দিল, দেহ

স্নিগ্ধ হইল। ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাইতেছে, অথচ কাহারও প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিবার তাঁহার উপায় নাই। কারণ, স্বহস্তে পাক করা অন্ন ছাড়া তিনি কিছু গ্রহণ করেন না।

এক ব্যক্তি এ সময়ে দয়া করিয়া একটি ইটের চুলার উপর তাঁহার লোটায় খিচুড়ি চড়াইয়া দেয়। স্বহস্তে উহা নামাইয়া নিয়া বালানন্দ তাঁহার ভোজন সমাপ্ত করেন। কলেরার পরদিনই এ এক বিচিত্র কাণ্ড! শীতল জলে স্নান ও খিচুড়ি পথ্য গ্রহণের পর বালানন্দজী কিন্তু একেবারে সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

কামাখ্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বালানন্দজী তারকেশ্বর এবং অন্যান্য তীর্থাঞ্চলে পর্যটন করিতে থাকেন। একবার হুগলী জেলায় ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি শুনিতে পান, জলেশ্বরে এক জাগ্রত ও প্রাচীন শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। জলেশ্বর-শিব নামে উহা পরিচিত।

দীর্ঘ বনপথ অতিক্রম করার পর এই বিগ্রহ তিনি দর্শন করিতে আসিলেন। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মন্দিরটি অত্যন্ত প্রাচীন, ভিতরে গৌরীপট্টের উপর অর্ধহস্ত পরিমাণ একটি শিবলিঙ্গ। পাশেই কিছুটা উচ্চস্থানে এক প্রাচীন পঞ্চমুণ্ডীর আসন।

সন্নিহিত কূপের জলে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া বালানন্দজী ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ জপ ধ্যানে কাটিয়া গেল। তারপর দেখা দিল এক অদ্ভুত অলৌকিক অভিজ্ঞতা। চারিদিক হইতে মন্দিরের দেওয়াল যেন তাঁহাকে চাপিয়া ধরিতেছে। আকাশে বাতাসে প্রচণ্ড ভীতিপ্রদ হা-হা রব! এক অদৃশ্য শক্তি তুলিয়াছে ঝটিকার আড়োলন।

হঠাৎ সেখানে দৈববাণী শোনা গেল, "ওরে, ভয় নেই, তুই পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে অঘোর মন্ত্র জপ কর্।"

নিবিষ্ট মনে বালানন্দ জপ আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে দিব্য প্রশান্তি ও আনন্দে সারা অন্তর তাঁহার ভরপুর হইয়া উঠিল। উপলব্ধি করিলেন, দেবাদিদেবের কৃপা মিলিয়াছে।

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। পরদিন তাঁহাকে এই মন্দির হইতে বাহির হইতে দেখিয়া গ্রামের লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, 'কে এই শক্তিমান্ সাধক ? এ শিব মন্দিরে রাত্রিযাপন করা তো সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।'

সেবার তিনি উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণ করিতেছেন। এমন সময় এক শক্তিমান্ যোগীপুরুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বালানন্দজীর শিষ্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার এক বর্ণনা দিয়াছেন :

"কাঙড়া উপত্যকায় ভাকুসুতে যাইয়া গুরুদেব গোমতী স্বামীর নিকট কিছুদিন অবস্থান করিতেছেন। সেখানে উভয়ে একদিন নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট আছেন, এরূপ সময়ে এক মহাত্মা সেখানে আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন। কিছুক্ষণ বাক্যালাপের পর এ সাধুটি বিদায় হইলেন। একটু তফাতে যাইবার পরেই তিনি 'জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব' বলিয়া হাততালি দিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া গুরুদেব ও গোমতী স্বামী বাহিরে আসিলেন ও উক্ত সাধুটিকে দেখিতে লাগিলেন। উভয়েই দেখিলেন যে, তিনি জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, বলিতেছেন আর হাততালি দিতেছেন, অমনি তাঁহার পা দুখানি ভূমি হইতে কিছু কিছু উপরে উঠিতেছে।

"এরূপ করিতে করিতে তিনি শূন্যমার্গে খেচরগামী হইয়া এক উচ্চ পর্বত শিখরের দিকে উঠিতে লাগিলেন ও কিছুক্ষণ পরে তথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া গুরুদেব চমৎকৃত হইলেন ও উক্ত মহাত্মার সহিত উত্তমরূপে আলাপ-পরিচয় করিতে না পারায় দুঃখিত হইলেন। অতঃপর নিজ নিজ আসনে ফিরিয়া আসিয়া গুরুদেব গোমতী স্বামীকে এ মহাপুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী জানাইলেন যে, তাঁহার সহিতও বিশেষভাবে ইহার পরিচয় হয় নাই। তবে আরও দু'এক বার ইহাকে নিম্নে আসিতে ও খেচরগামী হইতে দেখিয়াছেন। উপরের কোন্ শিখরে তিনি অবস্থান করেন, সেখানে কিভাবে অবস্থান করেন ও মধ্যে মধ্যে নিম্ন প্রদেশেই বা কেন আসেন ইহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

"পরে এই খেচর সিদ্ধির বিষয়ে বাক্যালাপ হওয়ায় গোমতী স্বামী বলিলেন যে, এরূপ অদ্ভুত শক্তি এক যোগপ্রভাববলে ও

দ্বিতীয়ত দ্রব্যবলে লাভ হয়। যোগবিভূতির বিষয় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। দ্রব্যশক্তি বিষয়ে তিনি অবগত আছেন যে, পারদ মিশ্রিত একপ্রকার 'গুটকা' কোনো কোনো সাধু প্রস্তুত করিতে পারেন। ইহা মুখে রাখিলে খেচরত্ব লাভ হয়। এ সাধুটির এ খেচরত্ব কি উপায়ে লাভ হইয়াছে জানিতে পারেন নাই।"

শক্তিধর যোগী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের যে দীক্ষা বীজটি বালানন্দের জীবনে রোপিত হয়, উত্তরকালে তাহা পরিণত ও সার্থক হইয়া উঠে, এক অসামান্য সিদ্ধযোগীরূপে ভারতবর্ষের যোগীসমাজে বালানন্দ কীর্তিত হন। তাঁহার এ সাফল্যের মূলে একদিকে রহিয়াছে গুরু ব্রহ্মানন্দজীর কৃপা, অপরদিকে বিশিষ্ট মহাপুরুষদের শিক্ষাদান ও সহযোগিতা।

বালানন্দ ব্রহ্মচারীজী উত্তরকালে নিজ শিষ্যদের উপদেশ দিতেন, 'মক্ষিকা বন্ যাও'—অর্থাৎ সেখানে যা কিছু অধ্যাত্ম-অমৃতের সঞ্চয় দেখ, তাহা হইতে তোমার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তোল।

অধ্যাত্মপথের এ আদর্শটি তাঁহার নিজের সাধন-জীবনেও অনুসৃত হইতে দেখা গিয়াছে।

ব্রহ্মানন্দজী ও গৌরীশঙ্কর মহারাজ ছাড়াও বালানন্দের জীবনে আরও কয়েকটি মহাপুরুষের প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল। নর্মদাতীরের মার্কণ্ডেয় মহারাজের নিকট তিনি হঠযোগের দুরূহ ক্রিয়া সকল আয়ত্ত করেন। তেমনি কাশী ধ্রুবেশ্বর মঠের মণ্ডলেশ্বর রামগিরিজীর কৃপায় বেদান্তের নানা সূক্ষ্ম তত্ত্ববিচারে তিনি পারদর্শী হইয়া উঠেন। উত্তরাখণ্ডের ত্রিযুগীনারায়ণাস্থিত প্রসিদ্ধ মহাত্মা মনসাগিরির নিকট বালানন্দজী এক সময়ে নিগূঢ় মন্ত্রাদি লাভ করিয়াছিলেন। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর কৃপাও তাঁহার সাধনজীবনের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়কে উন্মোচিত করিয়া দেয়; উচ্চতর যোগসাধনার ক্রিয়াদি ইহার নিকট তিনি শিক্ষা করেন।

সিদ্ধ সাধক বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর জীবনে অতঃপর দেখা যায় গুরুসত্তার মহিমময় প্রকাশ। বহু সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ এই সময়ে তাঁহার সাধন-নির্দেশ লাভ করিয়া ধন্য হয়। প্রথম দীক্ষিত শিষ্য রামচরণ বসু মহাশয়কে আশ্রয় দানের পর হইতেই তাঁহার কৃপার ধারাটি দিগ্-বিদিকে বিস্তারিত হইতে থাকে। রামবাবুর সহিত বালানন্দজীর সাক্ষাৎ ও দীক্ষাদানের কাহিনীটি বড় মনোজ্ঞ।

কামাখ্যা হইতে ফিরিবার পর তিনি বাংলার নানা অঞ্চলে ঘোরা-ফেরা করিতেছেন। এসময়ে একদিন তিনি রাণাঘাটে উপস্থিত হন। রামচরণবাবু সেখানকার সাবডিভিশনাল অফিসার। ব্যবহারিক জীবনে তিনি ছিলেন সাহেবী রুচিসম্পন্ন, ধর্মজীবনের দিকে ঝোঁক না থাকিলেও সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি রূপে পরিচিত ছিলেন।

এ সময়ে তিনি এক বিপদে পড়িয়াছেন। রাণাঘাটের নিকট একটি ট্রেন দুর্ঘটনায় বহুলোক হতাহত হয়। সাবডিভিশনাল অফিসার রাম বসু এ সময়ে কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন নাই বলিয়া অভিযোগ উঠে, সংবাদপত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলনও চলে। গভর্নমেণ্ট বাধ্য হইয়া তাঁহার কৈফিয়ত তলব করেন। চাকুরী নিয়া টান পড়িবে বলিয়াও অনেকের আশঙ্কা হয়। ফলে সারা পরিবারে তখন দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঘনাইয়া আসে।

রামচরণবাবুর মাতা বড় ভক্তিমতী। একদিন তিনি ইষ্টদেবের চরণে পুত্রের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা জানাইতেছেন, হঠাৎ অন্তর হইতে কে যেন বলিয়া দিল, 'তোদের ভয় নেই। এক শক্তিমান্ সাধক এ গৃহে আসছেন, বিপদ এবার কেটে যাবে।'

একটু পরেই বৃদ্ধা জানালা দিয়া তাকাইয়া দেখিলেন, জটাজূট-সমন্বিত দিব্যকান্তি এক সাধু বাংলোর হাতায় ঢুকিতেছেন।

সাধুটি রামচরণবাবুকে কহিলেন, "বাবা, একটা বাঘছালের বড় দরকার পড়েছে। এখানকার লোকেরা বললে, আপনি নাকি একজন বড় শিকারী। ভাবলাম, আপনার কাছে হয়তো এ বস্তুটি পাওয়া যাবে। সেজন্যই এলাম।"

সাধুর দিব্যকান্তি এবং প্রশান্ত মূর্তি দেখিয়া রামচরণবাবুর মন ভিজিয়া গেল। দুই একটি ব্যাঘ্রচর্ম তাঁহাকে দেখাইলেন, কিন্তু পছন্দ-মতো নয় বলিয়া সাধু ইহা গ্রহণ করিলেন না।

সামান্য একটুমাত্র দর্শন, কিন্তু রামচরণবাবুর জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কার যেন সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিল। সেদিন রাত্রিতে নিদ্রার ঘোরে তিনি এ সাধুর স্বপ্ন দেখিলেন। অতঃপর অন্তরাত্মা হইতে কে যেন বার বার ডাকিয়া বলিতে থাকে, 'ওরে, এ সাধুর দ্বারাই তোর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, এঁরই চরণে তুই আশ্রয় গ্রহণ কর্।'

রামবাবু সপরিবারে মহাত্মার শরণ নিলেন। রেল দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট গোলমাল তাঁহার আশীর্বাদে একেবারে চুকিয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যে রামবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে বালানন্দ মহারাজ উভয়কে দীক্ষা প্রদান করিলেন।

গুরুর প্রতি রামচরণবাবুর ভক্তি ক্রমে দৃঢ় একৈকনিষ্ঠায় পরিণত হয়, সমগ্র জীবনটি হইয়া ওঠে গুরুময়। একবার তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কার্বাঙ্কল্ হওয়ায় উহাতে অস্ত্রোপচার করা হয়, রামবাবু কিন্তু নিজের উপর ক্লোরোফরম্ প্রয়োগ করিতে দেন নাই। সার্জন যখন দেহে অস্ত্রোপচার করিতেছে, তখন তিনি একান্ত মনে গুরুদেব বালানন্দ মহারাজের চরণ ধ্যান করিয়া চলিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয়, এ সময়ে তিনি কোনো জ্বালাযন্ত্রণাই অনুভব করেন নাই।

এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই বালানন্দ মহারাজের এক পত্র তাঁহার কাছে আসিয়া পৌঁছে। তিনি তখন গীর্ণার পাহাড়ে থাকিয়া তপস্যা করিতেছেন। একদিন ধ্যানস্থ অবস্থায় রামবাবুর অস্ত্রোপচারের দৃশ্যটি ছায়াচিত্রের মতো তাঁহার সম্মুখে বার বার ভাসিয়া উঠিতে থাকে। তিনি দেখেন, শিষ্যের পৃষ্ঠদেশে ছুরি চালানো হইতেছে, কিন্তু তাঁহার কিছুমাত্র বেদনাবোধ বা কাতরতা নাই; গুরুর দিকে স্থিরভাবে দৃষ্টিটি নিবদ্ধ করিয়া আছেন। মহারাজের চিঠিতে এই তথ্যাদি জানিয়া রামচরণবাবুর আনন্দের সীমা রহিল না।

বালানন্দজীর এক প্রবীণ শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম দয়ানিধি ঝা।

দেওঘরে স্বামীজীর করণীবাদ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে পুত্রসহ তিনি সেখানে বাস করিতে থাকেন। একদিন গভীর রাত্রিতে এক বিষধর সর্প তাঁহার পুত্রকে দংশন করে। অবস্থা তৎক্ষণাৎ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। দয়ানিধি ঝাকে কিন্তু মোটেই বিচলিত হইতে দেখা গেল না, গুরুর চরণে প্রণাম জানাইয়া নির্বিকার চিত্তে তিনি তাঁহার নিয়মিত জপসাধনায় বসিয়া গেলেন।

এই প্রবীণ শিষ্যটি এই সময়ে ধ্যানাবস্থায় এই অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়া চমকিয়া উঠেন তিনি দেখিতে পান, যমদূতের মতো কতকগুলি বিকটাকার মূর্তি আশ্রমে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, আর বালানন্দজী ত্রিশূল হস্তে তাহাদের বিতাড়িত করিতেছেন। ঝা'র পুত্রটি কিন্তু সে রাত্রিতে বিস্ময়কররূপে রক্ষা পায়।

দেওঘরের সন্নিহিত তপোবন পাহাড়ে বালানন্দ মহারাজ এক সময়ে তীব্র তপস্যায় রত থাকেন এবং অধ্যাত্ম-সাধনার পরিণতির মধ্য দিয়া তাঁহার যোগীজীবন সার্থক হইয়া উঠে। বালানন্দজীর এই সময়কার জীবনের বহু মনোজ্ঞ কাহিনী রহিয়াছে।

ভক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"একদিন তিনি গুহার মধ্যে একান্তে আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কতক্ষণ ধ্যানাবস্থায় ছিলেন মনে নাই, কিন্তু যখন চক্ষু উন্মীলন করিলেন তখন দেখিলেন, এক বিচিত্র রং-বিশিষ্ট সর্প তাহার বিশাল ফণাটি বিস্তার করিয়া তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে। এ সর্পের আর একটু বিশিষ্টতা ছিল এই যে, মানুষের গোঁফের মতো অনেকগুলি দীর্ঘ দীর্ঘ রোম তাঁহার মুখে ছিল। ইহাকে দেখিয়া মহারাজ কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তাঁহার ধারণা হইল যে, ইহা কখনও সর্প নহে, সর্পের বেশে কোনো মহাত্মা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন। এইরূপ মনে হইতেই মহারাজ ত্রাটক মুদ্রা অবলম্বন পূর্বক এ সর্পের চক্ষুর সহিত নিজ চক্ষু সংযোগ করিলেন। ইহা করিতেই সাপটি ফণা সংকোচন-পূর্বক ধীরে ধীরে গবাক্ষ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

"অপর ঘটনাটি এইরূপ। মহারাজ নিম্নে ধুনির কাছে রাত্রিতে

একাকী শয়ন করিয়া আছেন। তখন শীতকাল, এজন্য একখানি কম্বল তাঁহার গায়ে ছিল। রাত্রি আন্দাজ একটা দু'টার সময় তিনি বোধ করিলেন যে, কে যেন তাঁহার গা হইতে কম্বলখানি ফেলিয়া দিল। ইহা করিতেই তিনি সজাগ হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন যে, কম্বলখানি বাস্তবিকই ধুনির নিচে পড়িয়া আছে। এমন সময় দেখিলেন যে, কে যেন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে ও তাঁহাকে, পাহাড়ের উপরে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। মহারাজ এ আহ্বানে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বা কেন ডাকিতেছে জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাহার পিছনে পিছনে যেন একটা আবেশভরে উপরে চলিতে লাগিলেন। এরূপভাবে উপরের গুহা পর্যন্ত তাঁহাকে লইয়া গেল। গুহা দিনের বেলায় তালা বন্ধ করিয়াছিলেন, ইহা মহারাজের বেশ মনে ছিল। কিন্তু সেখানে যাইতে দেখিলেন, গুহার দ্বার খোলা রহিয়াছে। যে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে আগে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। মহারাজ স্বপ্নাবিষ্টের মতো গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"গুহা অতিশয় অন্ধকারময় ছিল, এজন্য তখন পূর্বোক্ত আহ্বান-কারীকে আর দেখিতে পাইলেন না। গুহার ভিতর একটি নির্দিষ্ট-স্থানে মহারাজের দিয়াশলাই ও বাতি থাকিত, এজন্য অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া উহাদের তল্লাস করিতেছেন, এরূপ সময়ে গুহাতে এক পরম উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ বিজলীর আলোর মতো আলো হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। এ আলো এত পরিষ্কার যে, মেঝেতে সুচ পড়িয়া থাকিলেও দেখা যাইত। পূর্বোক্ত আহ্বানকারীকে কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। মহারাজের চিন্তা আসিতে লাগিল যে, তিনি তখন জাগ্রত না স্বপ্নাবিষ্ট —এরূপ ভাবিতেই তিনি যেন সমাধিস্থ হইয়া গেলেন।

"সকালে নিচের ধুনিতে মহারাজকে না দেখিয়া প্রথমে সকলে মনে করিয়াছিল যে, মহারাজ বোধ হয় বেড়াইতে গিয়াছেন। অধিক বেলা হইলেও তাঁহাকে ফিরিতে না দেখিয়া সকলে উপরের গুহায় গেল। তখন প্রায় মধ্যাহ্ন বেলা। কিন্তু তাহারা যাইয়া দেখিল,

মহারাজ তখনও ধ্যানস্থ। সকলের আহ্বানে তাঁহার ধ্যান ভগ্ন হইল ও তিনি রাত্রির বিবরণ প্রকাশ করিলেন।"

তপোবন পাহাড়ের এই তপস্যাময় জীবনেই জননী নর্মদামাঈর সহিত বালানন্দজীর সাক্ষাৎ হয়। দেবাদিদেব মহেশ্বরের প্রত্যাদেশে চল্লিশ বৎসর পর আবার মাতা-পুত্রের মিলন ঘটে। অতঃপর জননীর সেবা-পরিচর্যা ও শেষকৃত্যের মধ্য দিয়া বালানন্দজীর ব্যবহারিক জীবনের সব কিছু কর্ম ও কর্তব্যের অবসান ঘটিয়া যায়।

রামচরণ বসুর তীরোধানের পর তাঁহার পত্নী গুরুর জন্য এক আশ্রম ভবন প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র হন। এই ভক্তিমতী শিষ্যার আগ্রহাতিশয্যে ও অর্থানুকূল্যে করণীবাদের আশ্রমটি স্থাপিত হয়। তারপর এ আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া যোগীবরের করুণাধারা দিকে দিকে বিস্তারিত হইতে থাকে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্যদ্বয়, মৌজাগরি ও পূর্ণানন্দ স্বামী, অতঃপর এখানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্ত সাধকদের আগমনের পর হইতে ধীরে ধীরে শিক্ষিত সমাজে বালানন্দজীর প্রভাব প্রতিপত্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

শিষ্যদের অধ্যাত্ম-প্রস্তুতি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বালানন্দজী কখনো ফাঁক বা ফাঁকির অবকাশ রাখিতেন না। তিনি কহিতেন—

চারো পরিক্ষামে যব শিষ্য উত্‌রে।
তব হী গুরু উস্‌কো পাকা ঠহ্‌রে॥

তাঁহার এ চার পরীক্ষাকে তিনি বলিতেন—ঘর্ষণ, তাপন, ছেদন ও তাড়ন। গুরুদেব যেন পাকা স্বর্ণকার, শিষ্যদের জীবন দ্বারা অলংকার তৈরি করিতেছেন। প্রথমে কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করিয়া তিনি বুঝিয়া নেন—ধাতুটি প্রকৃত সোনা, না কোনো মেকি বস্তু। তারপর তাপন—ত্যাগ-তিতিক্ষার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া বুঝা যায়, খারাপ ধাতুর মিশ্রণ, ময়লা ও গলদ কতটা কাটিয়াছে। সবটা সহজে নিষ্কাশিত

হয় না, তাই স্থল বিশেষে প্রয়োজন হয় ছেদনের। শেষটায় খাঁটি সোনা পরীক্ষার জন্য আসে হাতুড়ির আঘাত বা তাড়ন।

নিজ জীবনে যে কৃচ্ছ্রব্রত, তপস্যা ও ইষ্টনিষ্ঠা বালানন্দজী অনুসরণ করেন, এ যুগের সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহা সহজসাধ্য নয়। একথা তিনি জানিতেন, তাই সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যদের জন্য কঠোরতর পক্ষপাতী হইলেও মুমুক্ষু গৃহস্থের জন্য সহজসাধ্য সাধনার কথাই তিনি বলিতেন। অপার স্নেহ ও সহানুভূতিভরা তাঁহার কল্যাণ হস্তটি তাহাদের সাহায্যে সদা প্রসারিত থাকিত।

বালানন্দজী সে-বার কলিকাতায় আসিয়া বরানগরে কিছুদিন বাস করেন। মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য বাসস্থানের সম্মুখে লোকের ভিড় লাগিয়াই আছে। এসময়ে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক-দিন তাঁহার এক প্রতিনিধিকে প্রেরণ করেন। অনুরোধ জানান, বালানন্দজী যদি কৃপা করিয়া তাঁহার ভবনে একবার পদার্পণ করেন তিনি কৃতার্থ হইবেন।

যোগীবর পরিহাস করিয়া কহিলেন, "যতীন্দ্রমোহন যে 'মহারাজ' তা আমি শুনেছি। এদিকে আমাকেও আবার বহু লোক 'মহারাজ' বলে সম্বোধন করে। এক মহারাজের কাছে অপর মহারাজ এলে তাতে আর নিন্দা কি? মহারাজা যতীন্দ্রমোহন নিজে একবার এখানে এলেই তো ভালো হয়।"

উপরোক্ত কথা কয়টি বলিয়াই বালানন্দজী এক সিদ্ধ মহাপুরুষের গল্প উপস্থিত ভক্তদের শুনাইয়া দিলেন :

নগরের রাজপথে এক মহাত্মা সেদিন আসন বিছাইয়া বসিয়াছেন এদিকে হঠাৎ হৈ-চৈ পড়িয়া গেল, বহু লোকলস্কর সঙ্গে নিয়া সে অঞ্চলের অধিপতি সেখান দিয়া আসিতেছেন। সাধুটি একেবারে রাজপথের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট। অগ্রগামী রক্ষীদল তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিল—এভাবে তাঁহার বসিয়া থাকা চলিবে না, রাজা আসিতেছেন।

চক্ষু উন্মীলন করিয়া সাধু সংক্ষেপে বলিলেন, "মহারাজকে বল, এখানেও এক মহারাজ বসে আছেন।"

মহা বিপদ ! সন্ন্যাসীর নড়িবার যে কোনো লক্ষণই নাই। রক্ষীরা রাজাকে সকল কথা নিবেদন করিল। তিনিও তাড়াতাড়ি শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া সেখানে পৌঁছিলেন।

সন্ন্যাসীর চরণে প্রণাম করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "শুনলাম, প্রভু নাকি এক মহারাজা। কিন্তু আপনার ফৌজ কোথায় ?"

"ফৌজের কি দরকার ? কেউ তো আমার দুশমন নয় !"

রাজা কহিলেন, "খুব ভালো কথা, কিন্তু বলুন দেখি, আপনার তোষাখানা কোথায় ?"

"কোনো খরচের বালাই নেই—তবে আর তোষাখানা দিয়া কি কাজ ? আমার যে 'স্বদেশ ভুবনত্রয়ং'—রাজত্বও আমার রয়েছে ত্রিভুবন জুড়ে, তাহলে মহারাজা নই তো কি ?"

মহাত্মার বাণীর মর্ম রাজা বুঝিলেন, অতঃপর তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া রাস্তার এক পাশ দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।—

বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর গল্প বলা শেষ হইল। প্রেরিত কর্মচারীটি এবার ফিরিয়া গিয়া সবিস্তারে সকল কথা মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে জ্ঞাপন করেন। বলা বাহুল্য, এই বিবরণ শোনার পর মহারাজা কিছুটা লজ্জিত হন। এবার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিজেই তিনি বালানন্দজীর চরণতলে উপস্থিত হন।

যতীন্দ্রমোহন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার মতো সংসারীর কর্তব্য কি ? এত কিছু বন্ধনের জালে জড়িত রহিয়াছেন, মুক্তির জন্য কোন্ পন্থা নিয়া অগ্রসর হইবেন ?

বালানন্দজী কহিলেন, "মহারাজ, আপ অব্ উল্‌ট যাইয়ে।"

কথাটির মর্ম বুঝিতে না পারিয়া মহারাজা তাঁহার দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া আছেন। বালানন্দজী বুঝাইয়া কহিলেন, "মহারাজ, এখন আপনার যা কিছু আছে সবই এমনি থাকবে, শুধু আপনার বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গীটিকে বদলাতে হবে। 'সব মেরা' এ মনোভাবটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে করতে হবে—'সব তেরা'—অর্থাৎ নিজের অহংবোধটির স্থলে স্থাপিত করতে হবে ভগবান্‌কে। আপনি যে মালিক—এ

বোধটি ত্যাগ ক'রে হতে হবে ম্যানেজার। কোনো মাঈকে এ কথা বোঝাতে হলে, আমি তাঁকে বলতাম,—মাঈ অব্ ঝি বন্ যাইয়ে।”

১৯০৬ সালের কথা। বালানন্দজী গুরুধাম গঙ্গোনাথ আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। গুরু ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এ সময়ে মহাসমারোহে পর পর মহারুদ্র যজ্ঞ ও মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেন। একদিন হাসিতে হাসিতে তিনি বালানন্দজীকে কহিলেন, “বালা, আমি এ মরদেহ এবার ত্যাগ করবো।”

“সে কি কথা গুরুজী—আপনি ইচ্ছা করলে আরও বহুকাল যে এ দেহ ধারণ করতে পারেন।”

সংক্ষিপ্ত উত্তর আসিল, “আউর নহী, বহুত পুরাণা হো গয়া।”

মাঘ মাসের পুণ্যতিথি। সেদিন প্রত্যূষকাল হইতেই নর্মদার বরপুত্র ব্রহ্মানন্দজী আপন কুটিরে ধ্যানস্থ হইয়া পড়েন, এ ধ্যান আর তাঁহার ভাঙে নাই। আশ্রমের এক প্রান্তে নর্মদাতটে বসিয়া বালানন্দ জপ করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যে স্থানে আসন পাতিয়া বসেন তাহার সন্নিহিত কুটিরটি ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তারপর একটি অগ্নিশিখা চকিতে সে স্থান হইতে উর্ধ্বে উঠিয়া দূর আকাশে মিলাইয়া গেল। বুঝিলেন, যোগীবরের জ্যোতিঃ-সত্তা চিরতরে মরদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

গুরুদেবের দেহত্যাগের পর আর সেখানে অবস্থান করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই। মহাযোগী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের তিনি প্রথম শিষ্য এবং প্রিয় শিষ্য। গঙ্গোনাথের গদি গুরুজী তাঁহাকেই দিয়া যান, কিন্তু গুরুভ্রাতা কেশবানন্দজীকে ঐ গদিতে স্থাপন করিয়া বালানন্দ দেওঘরেই প্রত্যাবর্তন করেন।

ইহার পর দীর্ঘ দিন গত হইয়াছে। করণীবাদ আশ্রমের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যোগীবরের ভক্ত শিষ্যের সংখ্যাও কম বৃদ্ধি পায় নাই। আনন্দ ও কল্যাণের উৎসরূপে পবিত্র বৈদ্যনাথধামে বালানন্দ মহারাজ

তখন অবস্থান করিতে থাকেন। অতঃপর ধীরে ধীরে একদিন এই জীবন-লীলানাট্য আসিয়া পড়ে তাহার শেষ দৃশ্যে।

১৩৪৪ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যরাত্রে যোগীবর পরমাত্মায় লীন হইয়া যান। নয় বৎসর বয়সে উজ্জয়িনীর মহাকাল জ্যোতির্লিঙ্গের পাদপীঠ হইতে শুরু হয় যে মহাজীবনের অভিযাত্রা, বৈদ্যনাথ জ্যোতির্লিঙ্গের পরমসত্তায় সেদিন ঘটে তাহার পরিসমাপ্তি!

স্বামী নিগমানন্দ

রাত্রি তখন প্রায় আটটা। সুপারভাইজার নলিনীবাবুর দপ্তরের কাজকর্ম তখনও সমাপ্ত হয় নাই। জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রগুলি সম্মুখে ছড়ানো, নিবিষ্ট মনে তিনি কয়েকটি জটিল বিষয়ের কথা ভাবিতেছেন। হঠাৎ গৃহের বাতি একটু নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

ব্যাপার কি! দৃষ্টি ফিরাইতেই নলিনীকান্ত সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী অদূরস্থিত টেবিলটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু এ যে একেবারে অসম্ভব! প্রায় তিন মাস পূর্বে স্ত্রীকে তিনি স্বগ্রামে বহুদূরে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অকস্মাৎ আজ এ সময়ে সে এখানে কি করিয়া আসিবে? পরক্ষণেই বুঝিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্ত্রী সশরীরে এখানে উপস্থিত হন নাই, তাঁহারই এক অশরীরী মূর্তি আজ এখানে, কি জানি কেন, আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

কিন্তু এ ছায়ামূর্তিই বা তাঁহার সম্মুখে এভাবে আসিয়া দাঁড়াইবে কেন? দৃষ্টিবিভ্রমের জন্য এরূপ দেখা যায় নাই তো? বার বার দুই চোখ রগড়াইয়া আবার সেদিকে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। মূর্তিটি কিন্তু তেমনি অবিচলভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভ্রমই যদি তাঁহার হইবে, তবে এ ছায়ামূর্তি এমন স্থির হইয়া থাকিবে কেন? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, এ অশরীরী মূর্তির মুখটি বড় বিষাদাচ্ছন্ন।

হঠাৎ নলিনীকান্ত সজাগ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার অন্তরে এক অজানা ভয়ের সঞ্চার হইল। 'কে তুমি, কে তুমি!'—বলিয়া তিনি উচ্চ স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ভৃত্যটি পাশের কক্ষেই থাকে, ব্যস্তসমস্ত হইয়া তখনি সে ছুটিয়া আসে। উভয়ে তন্ন তন্ন করিয়া সব খুঁজিয়া দেখিলেন। কই, কেহই তো কোথাও নাই। অশরীরী নারী ইতিমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

নলিনীকান্ত বড় চিন্তায় পড়িলেন। এ ছায়ামূর্তি তাঁহার প্রাণ-

প্রিয়া পত্নীর মৃত্যুর ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে নাই তো ! চিঠিপত্রে অবশ্য এ কয়দিনের মধ্যে কোনো দুঃসংবাদ তিনি পান নাই। তাঁহার বর্তমান কর্মস্থানটির নাম নারায়ণপুর, উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। এখান হইতে তাঁহার স্বগ্রাম, নদীয়ার কুতুবপুর কম দূরের পথ নয়। চিঠি এখানে পৌঁছিবার পূর্বেও অনেক কিছু ঘটিয়া থাকিতে পারে। নলিনীকান্ত বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, তবে কি তিনি অবিলম্বে দেশে রওনা হইবেন ?

কিন্তু তাহাই বা কি করিয়া পারা যায় ? জমিদারের কয়েকজন আমিনের কাজ তত্ত্বাবধানের ভার এখানে তাঁহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, কর্মদক্ষতা ও সততার জন্য তাঁহার উপর কর্তৃপক্ষের অগাধ বিশ্বাস। সর্বোপরি নলিনীকান্তের উপর আজকাল তাঁহারা বড় বেশী নির্ভর করিতেছেন। এ অবস্থায় হঠাৎ কাজকর্ম ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। তাছাড়া, বিশ-বাইশ দিন পরেই তো দুর্গাপূজা আসিতেছে। ভাবিলেন, হাতের কাজগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া পূজার সময়ই বরং একবারে বেশী ছুটি নিয়া বাড়ি যাইবেন।

পরদিনের ডাকেই কিন্তু এক পত্র আসিল, নলিনীকান্তের স্ত্রী খুব অসুস্থ। সংবাদটি পাইয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না, তবে কি ইতিমধ্যে স্ত্রীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে ? মৃত্যুর পরেই কি তাই তাঁহার ছায়ামূর্তিটি এভাবে সেদিন দর্শন দিয়া গেল ? কিন্তু পরলোক, পুনর্জন্ম, আত্মা প্রভৃতিতে তাঁহার মোটেই বিশ্বাস নাই। তেমন কিছু দুর্ঘটনা ঘটে নাই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

নলিনীকান্ত স্ত্রীকে বড় নিবিড়ভাবে ভালোবাসেন। নিজেকে নিজে যতই তিনি বুঝান না কেন, দুশ্চিন্তার জ্বালা হইতে কোনো মতেই আর নিষ্কৃতি পাইতেছিলেন না। কাজকর্ম সব সমাপ্ত করিয়া পূজার ছুটিতে তিনি স্বগ্রাম কুতুবপুর রওনা হইলেন। কিন্তু গৃহে উপস্থিত হইয়াই শুনিলেন, জীবনসঙ্গিনী আর ইহজগতে নাই। পত্নীগতপ্রাণ নলিনীকান্ত শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন।

প্রকৃতিস্থ হইবার পর হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁর কর্মস্থান নারায়ণপুরে যে সময়ে তিনি স্ত্রীর ছায়ামূর্তি দর্শন করেন, কুতুবপুরের বাড়িতে উহার ঠিক চার দণ্ড পূর্বে তাঁহার লোকান্তর ঘটে।

ঐ অশরীরী মূর্তি আরও দুইবার এ সময়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিরহবিধুর নলিনীকান্তের কাছে কোনো জাগতিক বস্তুর আকর্ষণই সেদিন আর নাই। কিন্তু পরলোকবাসিনী পত্নীর সহিত সাক্ষাতের জন্য, তাঁহার সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য, অন্তর তাঁহার বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিল। প্রেততত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ, মাদ্রাজের আদেয়ারে গিয়া থিয়োসফিস্টদের সাহায্যে প্রেতলোকের সহিত যোগাযোগ স্থাপন, ইত্যাদি অনেক কিছুই করিলেন। কিন্তু সবই বৃথা, কোনো কিছুতেই শান্তি লাভ হইল না। মৃতা পত্নীর সহিত মিলনের তীব্রতা কেবলই বাড়িয়া চলিল।

নলিনীকান্ত এখন শুধু পরলোক ও অলৌকিক রাজ্যের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের জন্য পাগল। দিবারাত্র এই উদ্দেশ্যেই ঘুরিয়া বেড়ান। কে তাঁহাকে সূক্ষ্মতম লোকের বার্তা আনিয়া দিবে, প্রিয়তমা পত্নীর সহিত বহুবাঞ্ছিত যোগাযোগ সাধন করিয়া দিবে,—কোথায় সেই শক্তিমান্ পথপ্রদর্শক? এই চিন্তায়ই তিনি সদা ব্যাকুল।

এ সময়ে একদিন কলিকাতায় আসিয়া তিনি স্বামী পূর্ণানন্দ পরমহংসের কথা শ্রবণ করেন। এই মহাপুরুষ পূর্বাশ্রমে ছিলেন বিখ্যাত ডাফ্ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক। তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ বলিয়া এসময়ে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি। নলিনীকান্ত তাই তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট ছুটিয়া গেলেন।

সকল কথা শুনিয়া পূর্ণানন্দ স্বামী সস্নেহে কহিলেন, "বাবা, তুমি তোমার স্ত্রীকে পেতে ব্যস্ত হয়েছ, কিন্তু সেই স্ত্রী এবং বিশ্বের যে কোনো স্ত্রীলোক মাত্রেই যে আদ্যাশক্তির ছায়া। তুমি শুধু এ ছায়ার সন্ধানে যে শক্তি ব্যয় করবে, তা দিয়ে মহামায়াকেই তো লাভ করতে পারো। সিদ্ধি লাভ করলে দেখবে, সব কিছুই তোমার করায়ত্ত।"

মহাপুরুষের এই বাণী নলিনীকান্তের দগ্ধ প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া দিল। সকাতরে তিনি তাঁহার কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। স্বামীজী উত্তর দিলেন, "না বাবা, আমি তোমার গুরু নই। তোমার গুরু নির্দিষ্টই রয়েছেন। সময়মতো তুমি তাঁর দেখা পাবে।"

এবার গুরুলাভের জন্য নলিনীকান্তের মনে তীব্র ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিল। যে করিয়াই হউক, সদ্‌গুরুর সন্ধান করিয়া দীক্ষা তাঁহাকে নিতেই হইবে। এসময়ে কার্যস্থল নারায়ণপুরে থাকিতেই লাভ করেন তিনি এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা।

তিনি নিজেই এ অভিজ্ঞতার মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন,—"সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! এক রাত্রিতে ঘরের মধ্যে শুয়ে আছি, জানালা দরজা সব বন্ধ, ঘুম হয় নি, তন্দ্রা এসেছে মাত্র, এমন সময় এক জ্যোতির্ময় সৌম্যমূর্তি মহাপুরুষ আমায় ডেকে বললেন,—'নাও বৎস, এই মন্ত্র নাও। তুমি মন্ত্রলাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছ, এই আমি তোমার জন্য মন্ত্র নিয়ে এসেছি, ধর।' কি গম্ভীর সে স্বর! আমি হাত পেতে সেটা নিলাম। মহাপুরুষের অঙ্গজ্যোতিতে অন্ধকার গৃহ তখন আলোকিত হয়ে উঠেছে। সেই আলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল— একটা পাতায় কি যেন লেখা আছে। কাছে দেশলাই ছিল, তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে দেখি, বিল্বপত্রে রক্তচন্দনে লেখা একাক্ষরী এক মন্ত্র!

"এটি কি মন্ত্র, কেমন ক'রে জপ করতে হয়—তা জেনে নেবার জন্য যেমনি মন্ত্রদাতার উদ্দেশে মুখ তুলে তাকিয়েছি, দেখি তিনি আর নেই। দিব্যমূর্তি অদৃশ্য হয়েছেন। ঘরের দরজা-জানালা সব পূর্ববৎ বন্ধ! দুয়ার খুলে পাতি পাতি ক'রে সব জায়গা খুঁজলাম, পেলাম না, অবাক্ হলাম, মন যেন কেমন হয়ে গেল। ঘরে এসে মেঝেয় পড়ে আকুলি-বিকুলি করতে লাগলাম। চোখের জলে আমার বুক ভেসে যেতে লাগল। আমার মনে হল—একি তবে স্বপ্ন? না—স্বপ্ন হলে বেলপাতা আসবে কোথা হতে? আর ঘরের দরজা যখন ভেতর হতে

বন্ধ, কি ক'রে তখন অন্যের পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব হতে পারে ? মনে হল—আমি কি অন্যায় করলাম ! তখন বিল্বপত্রে কি লেখা আছে, তা জানতে ব্যাকুল না হয়ে, যিনি আমায় বিল্বপত্রটি দিলেন, তাঁকে ধরলাম না কেন ?"

ঘটনাটির প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিয়া নলিনীকান্তের মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, কাশীধামে বরং একবার যাইবেন। বহু সাধু মহাত্মা ও সিদ্ধপুরুষ সেখানে থাকেন, মন্ত্রপ্রাপ্তির রহস্য সেখানে হয়তো উদ্‌ঘাটিত হইতে পারিবে। তাই কাশীতেই প্রথমে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু কোথাও প্রশ্নের উত্তর মিলিল না।

উৎকণ্ঠার আবেগে একদিন স্থির করিলেন, প্রাপ্ত মন্ত্র সম্বন্ধে প্রকৃত নির্দেশ কাহারো কাছে না পাইলে এ জীবন আর রাখিবেন না, গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন দিবেন।

সেই দিনই গভীর নিশীথে তিনি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলেন। দিব্য লাবণ্যশ্রীমণ্ডিত এক ঋষিকল্প পুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন, "বৎস, তুমি দিগ্‌বিদিকে কোথায় গুরু খুঁজে হয়রান হচ্ছো ? তোমার গুরু তো তোমার দেশের নিকটেই রয়েছেন। বীরভূম জেলার তারাপীঠে তুমি যাও। সেখানে গিয়ে মহাতান্ত্রিক বামাক্ষেপার শরণ নাও, অভীষ্ট লাভের পথ তিনিই দেখিয়ে দেবেন।"

এ স্বপ্নাদেশ নলিনীকান্তের হৃদয়ে অমৃত-প্রলেপ বুলাইয়া দিল। অবিলম্বে তারাপীঠে উপনীত হইয়া ক্ষেপার চরণোপান্তে তিনি উপবেশন করিলেন। তারা-মায়ের সিদ্ধসাধক বামার অমোঘ আশীর্বাদ তাঁহার জীবনে রূপায়িত হইয়া উঠিল। ফলে নলিনীকান্ত উত্তরকালে আত্মপ্রকাশ করিলেন সমর্থ তন্ত্রসাধক নিগমানন্দ রূপে।

নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত কুতুবপুর। এক ধর্ম-পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণরূপে ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় এ গ্রামে পরিচিত ছিলেন। ইনিই নলিনীকান্তের পিতা। জননী মানিকসুন্দরী

ছিলেন মূর্তিমতী করুণা। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় ও নিরন্নকে অন্নদানে এই মহীয়সী নারীর উৎসাহের সীমা থাকিত না। সে অঞ্চলের সবাই জানিত, কুতুবপুরের 'বামুন বাড়িতে' একবার উপস্থিত হইলে, এই করুণাময়ীর শরণ নিলে, দুই মুষ্টি অন্ন মিলিবেই।

১২৮৬ সালের ঝুলন পূর্ণিমা তিথি। চারিদিকে হরিধ্বনি ও আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে মানিকসুন্দরীর অঙ্কে এক সুদর্শন শিশু আবির্ভূত হয়। পিতামাতা আদর করিয়া নাম রাখেন নলিনীকান্ত।

বড় হইয়া প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে বালক সদাই দৌরাত্ম্য করিয়া ফিরে। কিন্তু বিদ্যালয়ে গেলে দেখা যায় অন্য এক রূপ, তাহার মেধা বিস্মিত করে সবাইকে। তাছাড়া, পূর্বজন্মের সাত্ত্বিক সংস্কারও বেশ প্রবল—মাঝে মাঝে এ সংস্কার তাহার জীবনের দ্বারে আসিয়া উঁকি দেয়, উচ্চকিত করিয়া তোলে।

নলিনীকান্ত তখন বালক। অন্তঃপুর হইতে একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে চণ্ডীমণ্ডপে চলিয়াছে। হাতে একটি সাঁজ-প্রদীপ, এই প্রদীপ দিয়া সেখানে আলো জ্বালাইতে হইবে। মণ্ডপে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটি দৃশ্য দেখিয়া সে কিন্তু হতবাক্ হইয়া যায়। অকস্মাৎ কি জানি কেন, মেঝের উপর একস্থানে দপ করিয়া খানিকটা আগুন জ্বলিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গেই এই অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে আবির্ভূত হয় দশভুজার দিব্য মূর্তি। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! এ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া বালক বিস্ময়ে বিহ্বল হয়। হাতের প্রদীপটি ভূতলে ফেলিয়া দিয়া, ছুটিয়া গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে মায়ের কোলে।

এই বালক বয়সেই আর একদিন দেখা দেয় এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নলিনীকান্ত সেদিন শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। গভীর নিশীথে হঠাৎ তাহার নিদ্রা ভাঙিয়া যায়, চাহিয়া দেখে, শয়ন-গৃহের সংলগ্ন ছাদটি চাঁদের আলোয় একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! আজ তো ঘোর অমাবস্যার রাত, চাঁদ উঠিবার তো কথা নয়। এবার বিপরীত দিকে চাহিয়া দেখে, সেদিকও যে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত। বার বার এদিকে ওদিকে দৃষ্টি সঞ্চালনের পর

বিস্ময় তাহার একেবারে চরমে পেঁৗছিল। একি, এ আলোক যে তাহারই নয়ন হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে!

যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে নলিনীকান্তের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে সুতীক্ষ্ণ নীতিবোধ ও পৌরুষ। সামাজিক কোনো অন্যায় বা অবিচার তিনি কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। ফলে মাঝে মাঝে নানা জটিলতার সৃষ্টিও হইত।

একবার নলিনীকান্ত কোনো প্রতিবেশীর বাড়ির সম্মুখ দিয়া চলিয়াছেন। বাহির হইতে এক বৃদ্ধার ক্রন্দন রব শুনিয়া তখনই তিনি অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়িলেন। দেখিলেন, এক দুর্দান্ত তরুণী বধূ তাহার বৃদ্ধা শাশুড়ীকে ধরিয়া নির্বিচারে প্রহার করিতেছে। নলিনীকান্ত এস্থলে কোনো ঔচিত্যবোধের ধার ধারিলেন না। বধূটিকে তখনই স্বহস্তে বেশ কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়া সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ফলে এ সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারী মামলা আনীত হয়। কিন্তু অপর পক্ষ তাহাদের নিজেদের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া শেষটায় এ মামলা প্রত্যাহার করে।

সামাজিক অত্যাচার ও নানা গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে নলিনীকান্ত এভাবে প্রায়ই রুখিয়া দাঁড়াইতেন। এই ছেলেকে নিয়া তাই পিতা মাতার স্বস্তি ছিল না।

পুত্র বড় হইয়া উঠিয়াছে, এবার তাঁহার উপর সংসারের দায়িত্ব কিছুটা চাপানো দরকার। তাই ভুবনমোহন তাঁহার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন। সৎপাত্রী অতি সত্বরই মিলিয়া গেল। সুরূপা এবং সুলক্ষণা বধূ সুধাংশুবালাকে পরম সমাদরে তিনি গৃহে আনিলেন; পুত্রের বয়স এ সময়ে আঠারো বৎসর।

ওভারসিয়ারী পরীক্ষা পাস করার পর নলিনীকান্তের চাকুরী জীবন আরম্ভ হয়, এবং পরবর্তীকালে রাসমণি এস্টেটের অধীনে তিনি এক কর্ম গ্রহণ করেন। এখানকার চাকুরীস্থল নারায়ণপুর হইতেই দেখা দেয় তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের সূচনা। প্রিয়তমা পত্নীর অশরীরী

আবির্ভাব সেদিন অন্তরে যে আলোড়নের সৃষ্টি করে, তাহাই একদিন উন্মোচিত করে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের দ্বার।

স্বর্গতা স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করা যায় কিনা, পরলোক তত্ত্ব কি, এ সব নিয়া কিছুদিন অনুসন্ধান চালাইলেন নলিনীকান্ত। শান্তি মিলিল না। জানা অজানা সাধুসন্তদের কাছে কত ঘোরাঘুরিই না করিলেন। অতঃপর তাঁহার জীবনে উদ্‌গত হইল ঈশ্বর দর্শনের অভীপ্সা। স্বপ্নযোগে একদিন একটি পবিত্র বীজমন্ত্রও প্রাপ্ত হইলেন। এবার অন্তরের ব্যাকুলতা নিয়া উপস্থিত হইলেন তারাপীঠের তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ বামাক্ষেপার সকাশে।

দ্বারকার তটে বালুকাময় মহাশ্মশান। চারিদিক কঙ্কাল করোটিতে সমাচ্ছন্ন। অর্ধদগ্ধ শবদেহ নিয়া চলিতেছে শকুনি ও শৃগালের কাড়াকাড়ি। অদূরে বশিষ্ঠদেবের আরাধিতা তারা মন্দির। নলিনীকান্ত ধীর পদক্ষেপে সেদিকে অগ্রসর হইলেন।

মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দেখিলেন, করবী গাছের শাখাটি নোয়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন এক উলঙ্গ অবধূত। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কে যেন অন্তর হইতে অস্ফুটস্বরে ডাকিয়া বলিল—'ওরে, ইনিই যে তোর পথপ্রদর্শক—তারাপীঠের ভৈরব, বামাক্ষেপা! তোর জন্যই যে ইনি অপেক্ষা ক'রে আছেন!'

কাহাকেও কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার অবকাশ আর রহিল না। উন্মত্তের মতো নলিনীকান্ত তাঁহার চরণ দুইটি বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। নয়নে তখন অঝোর ধারে নামিয়াছে অশ্রুর বন্যা।

ভৈরবের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল এক করুণাঘন রূপ! পরম স্নেহে, হাতে ধরিয়া, তিনি এই ভূপতিত আগন্তুককে কাছে টানিয়া নিলেন। তারপর কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "ওরে, তুই কি চাস্?"

নলিনীকান্ত বিবৃত করিলেন তাঁহার শোকার্ত হৃদয়ের কাহিনী।

কহিলেন, "বাবা, আপনি কৃপাময়। কৃপার ভিখারী হয়ে আমি এসেছি। তারামায়ের চরণতলে আমায় পৌঁছে দিন।"

দিব্য লক্ষণসমূহ সুদর্শন তরুণের সারা অঙ্গে। মুমুক্ষার সহজাত সংস্কার নিয়া সে জন্মিয়াছে, ইহা উপলব্ধি করিতে সর্বজ্ঞ ক্ষেপার দেরি হইল না। আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, "ওরে, আমার তারামায়ের মধ্যেই যে সব রয়েছে। তাঁর দেখা পেলেই সব পাবি। পরম ভাগ্যবান্ তুই, ইতিমধ্যেই যে তারামন্ত্র পেয়েছিস। তুই মায়ের ছেলে, তোকে আমি সাধন শিখিয়ে দেবো, ভাবিসনে।"

বামাক্ষেপার সান্নিধ্যে কিছুদিন থাকিয়া নলিনীকান্ত তন্ত্রসাধনার নানা নিগূঢ় ক্রিয়া-পদ্ধতি আয়ত্ত করিলেন। তারপর এক নিশীথ রাত্রে ক্ষেপা তাঁহাকে ইষ্ট দর্শনের জন্য তারাপীঠের মহাশ্মশানে বসাইয়া দিলেন।

চারিদিকে নিবিড় নিরন্ধ্র অন্ধকার। শিমুল-শেওড়া-বুনোজামের ঘন অরণ্যে মাঝে মাঝে শুনা যায় শকুনি, গৃধিনী আর বাদুড়ের ডানা ঝাপ্টানোর শব্দ। কঙ্কাল, করোটি ও খর্পরের উপর দিয়া খচ্খচ্ শব্দে কাহারা যেন চতুর্দিকে নাচিয়া বেড়ায়। হি-হি-হি অট্টহাস্যে শ্মশানভূমি এক একবার প্রকম্পিত হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে গায়ে আসিয়া লাগে তপ্ত নিশ্বাস! একি অশরীরী না ভয়াল শ্বাপদ সরীসৃপের বিচরণক্ষেত্র!

মুদিতনেত্রে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া নলিনীকান্ত নিষ্ঠাভরে তারামন্ত্র জপ করিয়া চলিয়াছেন। মাঝে মাঝে যখনই তিনি উচ্চকিত হন, মন টলিয়া উঠিতে চায়, অমনি কানে আসিয়া পশে মহাসিদ্ধ ক্ষেপাবাবার হুঙ্কার। তারা-তারা-তারা—উচ্চ আরাব অভয় মন্ত্রের মতো তাঁহার সমস্ত ভয় বিদূরিত করিয়া দেয়।

একদিকে তারাপীঠ-ভৈরব বামার শক্তি সঞ্চার, অপরদিকে তরুণ সাধকের একনিষ্ঠ জপের ক্রিয়া। মহিমময়ী তারা মায়ের কৃপার ধারা তাই সেদিন ঝরিয়া পড়িল।

রাত্রির শেষ যামে ইষ্টদেবী তারা নবীন সাধকের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। নলিনীকান্ত নিজেই ইহার বিবরণ দিয়াছেন :

আমি দেখে বিস্মিত হলাম। বললাম, 'তুমি কে ?'

সে উত্তর দিল, 'আমি তোমার ইষ্টদেবী।'

আবার প্রশ্ন করলাম—'এ মূর্তিতে কেন ? এ মূর্তি তো এ সিদ্ধ-পীঠের অভিলষিত মূর্তি নয়!'

'সে মূর্তি দেখলে তুমি ভয় পাবে, তাই।'

কি সুন্দর সে মূর্তি! দেবী অতঃপর বলিলেন,—'বৎস, বর লও।'

আর আমি কি বর চাইব ? আমার তো চাওয়ার কিছুই ছিল না, সেই মূর্তি দেখেই আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তাই বললাম—'যখন ইচ্ছে হবে, তখন যেন তোমাকে এই ভাবে দেখতে পাই।'

'আচ্ছা তাই হবে'—বলে তিনি তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তারপর তাঁর স্বরূপ মূর্তি দেখতে চাইলে, শেষে যাবার সময় তাঁর বিশ্বময় মূর্তি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। সেই মূর্তি দেখে ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে আমি অচৈতন্য হয়ে পড়লাম। তারপর জ্ঞান হলে চেয়ে দেখি—আমি বামাক্ষেপার কোলে!

ইষ্টদর্শনের পর নলিনীকান্ত তারাপীঠ শ্মশান হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এবার তিনি স্পর্শমণির ছোঁয়ায় রূপান্তরিত। এ অবস্থায় চাকুরী করার অথবা সংসারে বসবাস করার আর উপায় রহিল না। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহাকে ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত কিছু ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু ইষ্টদর্শনের পরেও যে অন্তরে স্থায়ী শান্তি ও আনন্দ আসিতেছে না। তাছাড়া, আত্মসাক্ষাৎকারই বা তাঁহার হইল কই ? সাধক নলিনীকান্ত ব্যাকুলচিত্তে আবার তারাপীঠে ছুটিয়া আসিলেন। বামাক্ষেপার চরণতলে পড়িয়া খেদোক্তি জানাইতে লাগিলেন, "বাবা, আমার প্রতি কৃপা কি হবে না ? আমি সিদ্ধকাম আজো হই নি। মনে হচ্ছে—আমি যেন কিছুই পেলাম না।"

ক্ষেপাবাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখলাম, তোর কত

কি হয়ে গেল। আর তুই শালা এখনো বল্‌ছিস তোর কিছুই এখানে মেলে নি? হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া!"

পরদিন প্রভাতে ক্ষেপা তাঁহাকে কাছে ডাকিলেন, সদয় হইয়া কহিলেন, "ওরে, তুই এবার সন্ন্যাস নে। নির্ধারিত গুরু তোর অচিরেই মিলবে। আর একটা কথা সর্বদা মনে রাখিস, মা-তারা তোকে দিয়ে অনেক কিছু করাবেন।"

সংসারত্যাগী হইয়া নলিনীকান্ত এবার গুরুর অন্বেষণে দিবারাত্র দূরদূরান্তে উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়ান। কোনো কোনো দিন একমুষ্টি আহার্য হয়তো জুটে, কোনোদিন কিছুটা বুনো ফল ও এক ঘটি জল খাইয়াই দিন অতিবাহিত হয়। এমনি চরম কষ্টের মধ্য দিয়া কিছুকাল পরে উপস্থিত হন আজমীড়ে।

শহরের প্রান্তে সাড়ম্বরে সেদিন এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। নলিনীকান্ত দূর হইতে দেখিলেন—দীর্ঘবপু, দিব্যকান্তি এক সন্ন্যাসী বেদীতে বসিয়া বেদান্ততত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার চারিদিকে বহু লোকের ভিড়। নিকটে আসিয়া এই মহাত্মার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই চমকিয়া উঠিলেন। এ কি! এই তো সেই মহাপুরুষ, স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে যিনি তাঁহাকে একাক্ষরী মন্ত্র দান করিয়াছিলেন!

"চিনেছি চিনেছি—আমার গুরু পেয়েছি" বলিয়া ভাবাবিষ্ট নলিনীকান্ত তখনি ছুটিয়া গিয়া সন্ন্যাসীর চরণতলে পড়িলেন। এই সন্ন্যাসী উত্তর ভারতের বহুজন বন্দিত মহাপুরুষ সচ্চিদানন্দ পরমহংস।

ভূতলে পতিত, সংবিৎহারা কে এই সুলক্ষণযুক্ত যুবক? সচ্চিদানন্দ পরমহংস একবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতহাস্যে সেদিনকার ধর্মপ্রসঙ্গ বন্ধ করিলেন। নলিনীকান্তের বহুপ্রার্থিত আশ্রয় অবশেষে মিলিল। ইহার পর কিছুদিনের মধ্যেই আচার্যদেবের সহিত তিনি উপস্থিত হইলেন তাঁহার পুষ্কর আশ্রমে।

আশ্রম জীবনের গোড়ার দিকটায় এই বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর কাছে নলিনীকান্তকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ধুনির

কাঠ সংগ্রহ ও কাঠ চেলাই হইতে শুরু করিয়া গরুর পরিচর্যা, ঘাস কাটা, আশ্রমিকদের রন্ধন ও বিগ্রহের পূজা প্রভৃতি অনেক কাজই এ সময়ে স্বহস্তে করিতে হইত। ইহার উপর ছিল সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর অশ্লীল গালাগালি ও গঞ্জনা। কোথাও সামান্যমাত্র ত্রুটি দেখিলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে গর্জিয়া উঠিতেন—"শালা ভোগী, বাপ-মাকে ছেড়ে এখানে সুখ করতে এসেছ!"

কঠোর জীবনে নলিনীকান্ত একেবারে অনভ্যস্ত। এক একদিন তাঁহার মনে হইত—নাঃ আর নয়, এখান হইতে পালাইয়া যেদিকে দুই চক্ষু যায় সেদিকেই চলিয়া যাইবেন।

এ সময়ে প্রবীণ গুরুভাই ব্রহ্মানন্দজী তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ বাক্যে শান্ত করিতেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে বুঝাইতেন, "ছাখো ভাই, সন্ন্যাস নিতে এখানে এসেছ, এ হচ্ছে জীবত্বের অবসান ঘটানো। গুরুদেবের এতকিছু শাসন ও তিরস্কার সবকিছুরই উদ্দেশ্য তাই। নির্যাতন ও কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, মান-অভিমানের সংস্কার সমূলে উৎপাটন করতেই তিনি চাচ্ছেন। আরো কিছুদিন সহ্য করে চলো, তখন বুঝতে পারবে গুরুজী কি গভীরভাবে ভালোবাসতে পারেন।"

ঠিকই তাই। নলিনীকান্ত দেখিলেন, আশ্রম জীবনের কঠোরতায় যত বেশী তিনি অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন, সচ্চিদানন্দজীর রুক্ষতা ততই কমিয়া যাইতেছে। পূর্বেকার সে রুদ্রমূর্তি আর নাই, ক্রমেই তাহা কমনীয় হইয়া উঠিতেছে। কদর্য ভাষা প্রয়োগ এখন তিনি কমই করেন। সাধনকামী তরুণ শিষ্যকে লাঞ্ছিত করার মনোভাবও আর দেখা যায় না। সন্ন্যাসীর করুণাময় ও কল্যাণময় রূপটিই প্রধানত এখন আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

ঐ শুষ্ক বৈদান্তিককে নলিনীকান্ত কিন্তু ক্রমে বড় নিবিড়ভাবে ভালোবাসিয়া ফেলিলেন। উত্তরকালে তিনি বলিতেন, "আমি সচ্চিদানন্দকে বড় ভালোবেসেছিলাম। তিনি আমাকে ভালোবাসতেন, তাই তাঁর অকথ্য অত্যাচারও অনেক সহ্য করতাম। শিষ্যদের ভেতর

আমিই ছিলাম ব্রহ্মচারী। কাজেই আশ্রম জীবনের শেষের দিকে প্রায়ই আমাকে রান্না করতে হত। একদিন উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে দিয়ে অন্তরাল থেকে আমি তাঁর ব্রহ্মজ্যোতি বিভাসিত মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে বসে আছি, রান্নার কথা মনেই নেই। এদিকে ভাত সবটা পুড়ে গন্ধ বার হয়ে গিয়েছে। তারপরই চলল গুরুজীর তিরস্কার। আমি আর তাঁকে মুখে কিছু বললাম না, শুধু মনে মনে বললাম—ওগো তুমি যদি জানতে, কেন আজ ভাত পুড়ে গেল।... ঠাকুর যেমন আমায় অকথ্য ভাষায় গাল দিতেন, তেমনি আবার খুব আদরও করতেন। এমন ব্রহ্মজ্ঞানী বৈদান্তিক, জ্ঞান-সাধনায় সিদ্ধপুরুষ আর দেখলাম না[১]।"

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর আশ্রমে এক নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক এক সময়ে তাঁহার সেবা পূজার ভার নলিনীকান্তের উপর আসিয়া পড়িত। কিন্তু তরুণ সাধক তখন বেদান্ত পাঠ ও তত্ত্ব বিচারে নিমগ্ন। দেব বিগ্রহের প্রতি তাঁহার তেমন ভক্তি-বিশ্বাস নাই। রোজ পূজার ঘরে গিয়া দুই চারিটি পুষ্প নিবেদন করিয়া কোনোমতে কাজ সমাধা করিয়া আসিতেন।

শিষ্যের এই মনোভাব কিন্তু গুরু মহারাজের দৃষ্টি এড়ায় নাই। একদিন তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "ও কিরে? তুই কি যেমন-তেমন ক'রে, তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে ঠাকুরের পূজা করিস নাকি?"

নলিনীকান্ত উত্তর দিলেন, "ও আবার পূজার বস্তু কি, ওতো নিষ্প্রাণ—শুধু একটা ধাতু মূর্তি।"

সচ্চিদানন্দ স্বামী ভর্ৎসনা করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। নলিনীকান্তের অভিমানও কম নয়, তিনি ধাতুময় বিগ্রহকে আসন হইতে নামাইয়া আনিয়া তখনি উহার গালে কষিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন। তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে আপন মনে কহিতে

---

১ শ্রীশ্রীনিগমানন্দ স্মৃতি—শিশিরকুমার বসু



শ্রীশ্রীনিগমানন্দ

লাগিলেন, "তোমার জন্যই তো মহারাজের এত গালাগাল আমায় সহ্য করতে হল।"

কিছুক্ষণ পরেই সচ্চিদানন্দ মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। তিনি স্মিত হাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "তুই না বলেছিলি, বিগ্রহের প্রাণ নেই, তবে তখন অত কথা বলছিলি কার সঙ্গে?" বুঝা গেল, সর্বজ্ঞ গুরুর দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে কোনো কিছুই অজানা থাকে না। উভয়ের কথাবার্তা শুনিয়া আশ্রমিকেরা হাসিতে লাগিলেন।

নানা পরীক্ষা ও কঠোর শাসনের পর গুরু মহারাজ ক্রমে কোমল হইয়া উঠিয়াছেন। নলিনীকান্তও মাঝে মাঝে নিজের স্নেহের দাবি নিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে ছাড়েন না। একদিন তিনি সাহস সঞ্চয় করিয়া দীক্ষার কথাটি পাড়িলেন।

স্বামীজী কিন্তু বলিয়া বসিলেন, পিতামাতার অনুমতি না নিয়া আসিলে তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দিবেন না।

নলিনীকান্ত এবার প্রমাদ গণিলেন। তবুও সাহসে ভর করিয়া প্রতিবাদ জানাইয়া কহিলেন, "এ আপনার কি রকম কথা, মহারাজ? কোন্ পিতামাতা সহজ বা স্বাভাবিকভাবে পুত্রকে সংসার ত্যাগের অনুমতি দেন? স্বয়ং ব্যাসদেবও পুত্র শুকের সন্ন্যাসে অনুমতি দিতে চান নি। আচার্য শঙ্করকে তো চতুরতা ক'রেই মাতার কাছ থেকে অনুমতি আদায় করতে হয়েছিল। শাস্ত্রের বিধানের কথা আমি জানিনে, কিন্তু এসব নজীরের গুরুত্ব কোন্ অংশে কম?"

সচ্চিদানন্দ সরস্বতী এবার স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "আরে তুম্‌সে বচন্‌সে কোই নহীঁ সাকেগা। আচ্ছা যাও, তুমহারা দীক্‌ষা ইহা মিল্ জায়গা।"

কিছুদিনের মধ্যে নলিনীকান্তের সন্ন্যাসদীক্ষা হইয়া গেল। নামকরণ হইল—নিগমানন্দ সরস্বতী। ভগবৎ কৃপায় তাঁহার বহু-দিনের আশা এবার পূর্ণ হইয়াছে, আনন্দে তিনি আত্মহারা হইয়া গেলেন।

আশ্রমে বাস করার কালে স্বামী সচ্চিদানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নানা

কাহিনী নিগমানন্দ এসময়ে শ্রবণ করিতেন। উত্তরকালে তাঁহার মুখে এ কাহিনী মাঝে মাঝে শুনা যাইত :

—বহুদিন পূর্বের কথা। কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত ইংরেজ সরকারের তখন সংঘর্ষ বাধিয়াছে। লর্ড অকল্যাণ্ডের নেতৃত্বে বৃটিশ ভারতের সেনাবাহিনী যুদ্ধরত। সেদিন পেশোয়ারের অদূরে এক সেনাদলের ছাউনি পড়িয়াছে। চারিদিকেই সতর্ক পাহারা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। জনৈক দেশীয় হাবিলদার হঠাৎ একদিন দূর হইতে দেখিতে পায়, নিকটস্থ পাহাড়ের এক গুহা হইতে একটি আলোকবর্তিকা বার বার আন্দোলিত হইতেছে।

কে এই দুর্জ্ঞেয় ব্যক্তি? কি উদ্দেশ্য তাহার এই বিচিত্র আলোক-সংকেতের? সারা ছাউনিতে চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হাবিলদারটি তাহার কাপ্তেন ও কয়েকজন সঙ্গীসহ ঐ আলোর অনুসন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও এই রহস্যময় আলো বা গুপ্ত সংকেতকারীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

আর একদিন উৎসাহী হাবিলদারটি একাই বন্দুক কাঁধে করিয়া রহস্য ভেদ করিতে বাহির হইল।

আলোকবর্তিকা লক্ষ্য করিয়া কেবলি সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কয়েকটি পাহাড়ের চূড়া অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক উচ্চ পর্বতের গুহার কাছে আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়ায়। সম্মুখে তাহার এক শীর্ণকায় প্রাচীন সাধু। লণ্ঠন হস্তে নীরবে তিনি বসিয়া আছেন।

হাবিলদারকে দেখিয়াই সাধু বলিতে লাগিলেন, "এসো বেটা! তোমার প্রতীক্ষায়ই যে আমি এখানে বসে আছি, জরাগ্রস্ত মরদেহটি ত্যাগ করতে পারি নি। তোমায় এ পর্বতগুহায় আনবার জন্যই প্রতিদিন আমি বার বার আমার এ আলোক-সংকেত পাঠাচ্ছিলাম। অবশেষে এবার তুমি এসে পড়েছ। বাচ্চা, আমার এ সিদ্ধ-আসন তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে। সৈনিকবৃত্তি আজ এক্ষুনি ত্যাগ ক'রে তোমায় নিতে হবে সন্ন্যাস-দীক্ষা।'

পর্বতগুহার এ প্রাচীন সাধুটি ছিলেন এক বৈদান্তিক, আত্মজ্ঞানী

মহাপুরুষ। এই মহাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হাবিলদারের জীবনে অধ্যাত্মরসের প্রবাহটি উন্মুক্ত হয়, এক নূতন মানুষে সে রূপান্তরিত হইয়া উঠে। সেদিনকার এই ভাগ্যবান্ সৈনিকই উত্তরকালের স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী—নিগমানন্দের দীক্ষাগুরু।

সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুদিন পরে গুরুজীর নির্দেশে নিগমানন্দ তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হন। প্রথম পর্যায়ে বদরিকাশ্রম ও মানস সরোবর প্রভৃতি ভ্রমণকালে সচ্চিদানন্দ মহারাজ স্বয়ং তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই সময়কার কিছু কিছু অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা নিগমানন্দজীর বর্ণনায় পাওয়া যায়।

একদিন মানস সরোবরের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিয়া নিগমানন্দ বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া চাহিয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টিসমক্ষে এক অপ্রাকৃত দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইল। তিনি দেখিলেন, হ্রদের এক কোণে যেন অপরূপ রূপের মেলা বসিয়া গিয়াছে! আনন্দ-চঞ্চল একদল পরমাসুন্দরী তরুণী সেখানে জলবিহারে রত।

নিগমানন্দ কৌতূহলভরে গুরুজীকে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, ইয়ে কঁওন সব্ আস্নান করতে হেঁ?"

সচ্চিদানন্দ স্বামী উত্তর দিলেন, "আরে, তুম্হারা আঁখ তো খুল্ গিয়া! দেখ্লেও, আওর ভী বহুৎ দেখনেকো চীজ হ্যায়। ইয়ে সব্ তো অপ্সরা হ্যায়।"

একবার পথমধ্যে তাঁহারা একটি অতিকায় সর্পের সাক্ষাৎ পান। উহা তখন কুণ্ডলী পাকাইয়া পরম নিশ্চিন্তে সেখানে অবস্থান করিতেছে। তীর্থ পরিক্রমাচারী সাধুদের অনেকেই তখন এই সর্পটিকে আটা ময়দা খাওয়াইতে ব্যস্ত। সর্পটি কিন্তু নিতান্ত নির্বিকার ও উদাসভাবে তাকাইয়া আছে—হিংসার লেশমাত্র নাই।

উহার এ শান্ত স্বভাব ও আচরণ সম্বন্ধে নিগমানন্দ প্রশ্ন করিলে সচ্চিদানন্দজী উত্তর দিলেন, "আরে, বাচ্চা, তুম ক্যা দেখোগে আর ম্যয় ভী ক্যা বলুঙ্গা?—ইয়ে তো পরমহংস হো গিয়া।"

গুরুজীর এ কথা শুনিয়া নবীন সাধক নিগমানন্দের বিস্ময় সেদিন চরমে পৌঁছিয়াছিল।

এই পর্যটনের সময়ে সচ্চিদানন্দ মহারাজ শিষ্যকে এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসিনী মোহান্তের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। গৌরী মাতাজী নামে ইনি প্রসিদ্ধ। হিমালয়ের অরণ্যাঞ্চলে এক নিভৃত স্থানে ইঁহার আশ্রম। সাধুসন্তদের মধ্যে সে সময়ে এই মাতাজীর খুব প্রতিষ্ঠা। তরুণ সাধু নিগমানন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ইনি সচ্চিদানন্দ সরস্বতীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার এ চেলা উচ্চতর সাধনার স্তরে এসে গেলে, আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিও।"

উত্তরাখণ্ড ভ্রমণের পর সচ্চিদানন্দ মহারাজ পুষ্কর আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। পরিব্রাজক নিগমানন্দকে এবার একাকীই গুরু মহারাজের নির্দেশে অপর ধামগুলি দর্শনের জন্য যাত্রা করিতে হইল। এই সময়ে দ্বারকা, রামেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র ও আরও বহুতর তীর্থে তিনি উপনীত হন এবং এই পরিভ্রমণের সময়ে জীবনের বহুতর অভিজ্ঞতা তাঁহার লাভ হয়। উত্তরকালে এ সময়কার নানা বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ তিনি শিষ্যদের নিকট করিতেন।

একবার তিনি কিছুদিনের জন্য দ্বারকার এক মঠে অবস্থান করিতেছেন। এই মঠে সে সময়ে কোনো মোহান্ত নাই, এক প্রাচীনা সন্ন্যাসিনীর উপর পরিচালনার সমস্ত কিছু ভার অর্পিত রহিয়াছে। এ বৃদ্ধা কিন্তু অল্পকাল মধ্যে নিগমানন্দকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া ফেলিলেন। তিনিও তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

এ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা স্থির করিলেন, সাধন-নিষ্ঠ ও প্রিয়দর্শন এই তরুণ সন্ন্যাসীকেই তাঁহারা সকলে মিলিয়া মঠের মোহান্ত পদে বসাইয়া দিবেন। ফলে আদরযত্নে নিগমানন্দের দিনগুলি এখানে তখন বেশ আরামেই কাটিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন এই মঠে ত্রিশূলধারিণী এক ভৈরবীর আবির্ভাব হয়, রমণী পরমাসুন্দরী ও পূর্ণ যৌবনা, শাস্ত্রাদিতেও তাঁহার

পারদর্শিতা যথেষ্ট। তাছাড়া, জানা গেল, তিনি সম্ভ্রান্ত বাঙালী ঘরের কন্যা, পূর্বাশ্রমের নিবাস যশোহর জেলায়।

প্রিয়দর্শন নিগমানন্দের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরই তিনি তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ইহার পর ক্রমেই এ মঠে তাঁহার গতায়াত বাড়িতে থাকে। তাঁহার দিকে তরুণ সাধু নিগমানন্দজীকেও একসময়ে বেশ কিছুটা ঝুঁকিতে দেখা যায়।

ভৈরবী নিগমানন্দকে প্রায়ই বুঝান, তন্ত্রমতে তাঁহাদের শৈববিবাহ অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। এ সম্বন্ধে বার বার নানাভাবে তিনি তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতেও থাকেন।

তরুণ সাধক ইতিমধ্যে অনেকটা নরম হইয়া উঠিয়াছেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ প্রস্তাব মন্দই বা কি? বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী তো তাঁহাকে এ মঠের মহান্ত পদে মনোনীত করিয়াই ফেলিয়াছেন। এবার এই তরুণী ভৈরবীকে বিবাহ করিয়া নূতনভাবে ধর্মাচরণ করিতেই বা ক্ষতি কি? অতঃপর একদিন শৈববিবাহের শুভ দিনটি পাকাপাকিভাবে স্থির হইয়া গেল।

বিবাহের পূর্বদিন গভীর রাত্রে নিগমানন্দ এক স্বপ্ন দেখিলেন —ভৈরবীর সহিত তাঁহার বিবাহ মহা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এ আনন্দোৎসবের মধ্যে রূপসী তরুণী মনোরম বেশে সজ্জিত হইয়া তাঁহার পাশে আসিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু অকস্মাৎ এক ছন্দোপতন ঘটিয়া গেল! স্বপ্নজড়িত অবস্থায়ই তিনি শুনিতে পাইলেন, অদূরে কাহার এক ভারী চিম্‌টার শব্দ। চমকিয়া উঠিলেন। একি! এ যে গুরুমহারাজ সচ্চিদানন্দজীর সাড়ে-চার সের ওজনের সেই চিম্‌টার চিরপরিচিত শব্দ। সঙ্গে সঙ্গেই তাকাইয়া দেখিলেন, তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা নববধূ ভৈরবীর সারা দেহটি একতাল মাখনের মতো গলিয়া গলিয়া মাটিতে পড়িতেছে। ইহার পর অবশিষ্ট রহিল শুধু তাহার দেহের কঙ্কাল-করোটি। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, এই কঙ্কালময় যুবতীই প্রেমভরে বাহু প্রসারিয়া নিগমানন্দজীকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে।

এ কি বীভৎস দৃশ্য! নিগমানন্দের নিদ্রা তৎক্ষণাৎ টুটিয়া গেল। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে উন্মীলিত হইল তাঁহার জ্ঞাননেত্র। আর নয়, আসন্ন বন্ধনের ডোর এখনি ছিন্ন করিতে হইবে! আপন লোটা-কম্বল হাতে নিয়া তিনি মঠের দ্বারের দিকে ধাবিত হইলেন।

বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না, ত্রস্তেব্যস্তে আসিয়া তিনি পথরোধ করিয়া দাঁড়ান। কিন্তু বাধা দেওয়া কোনো-মতেই সম্ভব হইল না, তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া ফেলিয়া নিগমানন্দ ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাসী জীবনের চরম বিপদটি গুরুকৃপার বলে সেদিন এমনি অদ্ভুতভাবে কাটিয়া গেল। নিগমানন্দজী বলিতেন, "সদ্‌গুরু অনেক সময়ে স্বপ্নের ভেতর দিয়েই আশ্রিত শিষ্যকে দিক্ নির্দেশ ক'রে দেন—প্রকৃত কল্যাণের পথে চালিত করেন।"

তীর্থভ্রমণের পর নিগমানন্দজী গুরুর আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। এসময়ে গুরু সচ্চিদানন্দ মহারাজ একদিন তাঁহাকে সস্নেহে ডাকিয়া বলেন, "বেটা, আমার কাছ থেকে যা হবার তা তোর হয়ে গিয়েছে। তোকে এবার যোগসিদ্ধ গুরুর কাছে যেতে হবে, তবে তোর সাধনা পূর্ণ হয়ে উঠবে।"

নিগমানন্দের নয়ন দুইটি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। পরমাশ্রয়দাতা গুরু সচ্চিদানন্দজীকে আজ ছাড়িয়া যাওয়া বড় মর্মান্তিক। আবার তাঁহার প্রদত্ত নির্দেশই বা তিনি অমান্য করেন কিরূপে? কিন্তু কে সেই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট যোগীগুরু? কোথায় তাঁহার সন্ধান মিলিবে? এসব কথা ভাবিয়া তিনি বড় চঞ্চল হইলেন।

সচ্চিদানন্দজী আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ঘাবড়াও মত্, বেটা, তুম্‌হারা যোগীগুরু জরুর মিল্ জায়গা, বহুৎ তুরন্ত হী মিল্ জায়গা।"

আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল নিগমানন্দের পরিব্রাজন। এবার তাঁহার লক্ষ্য—যোগীগুরুর সন্ধান লাভ, আর অধ্যাত্মসাধনার পূর্ণতম চরিতার্থতা সাধন। গহন অরণ্য ও পর্বত প্রান্তর দিয়া দিনের

পর দিন তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। তীব্র শীতাতপ মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায়, অনাহারে অনিদ্রায় চরম কষ্টের মধ্যে তাঁহাকে দিনের পর দিন এ সময় কাটাইতে হয়।

একবার রাজপুতনার অন্তর্গত কোটা রাজ্যের এক অরণ্য অঞ্চল দিয়া নিগমানন্দ স্বামী পথ চলিয়াছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে। ক্ষুৎপিপাসায় তিনি তখন অত্যন্ত কাতর। হঠাৎ এক অপরিচিতা পথচারিণী, তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া উঠিল। নিকটে আসিয়া কহিল, "দেখছি, তুমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় কাতর হয়েছো। আরও আধ মাইল পথ এগিয়ে যাও, সামনেই একটি ছোট কুটির দেখতে পাবে। সেখানেই আজ বিশ্রাম নাও।"

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর অরণ্য-আবাসটি দৃষ্টিগোচর হইল। এক রূপসী রমণী এই বিজন কুটিরে বাস করিতেছেন। স্বামী নিগমানন্দ পরে জানিয়াছিলেন, ইনি এক যোগসিদ্ধা সাধিকা। ঐ সময়ে গভীর দুরধিগম্য বনে তাঁহাকে একাকিনী বাস করিতে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

আহার ও বিশ্রামের পর কথাপ্রসঙ্গে তিনি জানিলেন, অপরূপ তারুণ্য-শ্রীমণ্ডিতা এই নারীসাধিকার বয়স প্রকৃতপক্ষে ষাটেরও বেশী। এক ব্রহ্মবিদ্ যোগীগুরুর নিকট দীক্ষালাভ করার পর দীর্ঘকাল এই অরণ্যে তিনি সাধনারতা রহিয়াছেন।

যোগিনী তাঁহাকে কহিলেন, "দ্যাখো, তুমি আর এখানে সেখানে বেশী ঘুরো না। এখন কলকাতায় ফিরে যাও। তারপর পূর্বাঞ্চলে যেতে হবে, সেখানে সাক্ষাৎ পাবে তোমার আকাঙ্ক্ষিত যোগীগুরুর।"

নিগমানন্দ মনে মনে ভাবিতেছেন, আবার সুদূর কলিকাতায় তাঁহাকে ফিরিতে হইবে? কিন্তু হাতে যে একটি পয়সাও নাই।

যোগিনী যেন সর্বজ্ঞা। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "ওঃ তুমি টিকিটের টাকার কথা ভাবছো? সেজন্যে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

পরদিন দুর্গম অরণ্যের মধ্য দিয়া যোগিনী তাঁহাকে পথ দেখাইয়া

নিয়া চলিলেন। অনতিদূরেই এক রেল স্টেশন। নিগমানন্দের হস্তে টিকিট ক্রয়ের জন্যে কিছু টাকা গুঁজিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "ঐ রেল স্টেশন দেখা যাচ্ছে, টিকিট কেটে কলকাতার দিকে এবার রওনা হয়ে পড়ো।"

এই রহস্যময়ী যোগসিদ্ধা নারী সম্বন্ধে নিগমানন্দজী বলিয়াছেন, "স্টেশনের কাছে এসে হঠাৎ ফিরে দেখি তিনি আর নেই। তাঁর এই আকস্মিক অন্তর্ধানে মন যেন কেমন হয়ে গেল। মনে হল—কি সর্বনাশ! তাঁর মতো এমন যোগসিদ্ধা ভৈরবীকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলাম! তৎক্ষণাৎ আমি ছুটলাম সেই জঙ্গলের দিকে। গিয়ে দেখি, সেই কুটিরও নেই, মেয়েটিও নেই! সবই যেন জাদুমন্ত্রবলে কোথায় উড়ে গিয়েছে! তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম, কিন্তু সবই নিষ্ফল। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কে সেই মেয়ে?"

কলিকাতায় পৌঁছিবার পর নিগমানন্দ একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে আসামের দিকে রওনা হন। সেখানে পৌঁছিয়া কামাখ্যা ও পরশুরাম তীর্থ দর্শনের পর কিছুকাল একাকী পার্বত্য অঞ্চলে তিনি পরিভ্রমণ করিতে থাকেন।

পাহাড়ী বস্তি ও অরণ্য অঞ্চল দিয়া স্বামী নিগমানন্দ এবার মনের আনন্দে অগ্রসর হইতে থাকেন। গভীর অরণ্যে প্রবেশ করার পর একদিন তিনি পথ হারাইয়া ফেলেন। ক্রমে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসে। এ অবস্থায় পথ চলা অসম্ভব হইয়া ওঠে। অগত্যা এক বিপুলকায় বৃক্ষের কোটরে তরুণ সাধক, সে রাত্রির মতো আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পরের দিন ভোরবেলায় বৃক্ষকোটর হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলেন, এক গৌরকান্তি দীর্ঘাকায় সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। একরাশ শুষ্কপত্র তাঁহার সম্মুখে ধুনির মতো জ্বলিতেছে। তিনি তাঁহার গাঁজা সাজিতে তখন নিতান্ত ব্যস্ত। ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহল নিয়া নিগমানন্দ নিচে নামিয়া আসিলেন।

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ানোর পরও কিন্তু সন্ন্যাসীর কোনো ভ্রূক্ষেপ নাই। নীরবে গাঁজার কল্‌কেতে কয়েকটি টান দিলেন, তারপর গম্ভীরভাবে সেটি নিগমানন্দজীর সম্মুখে ধরিলেন।

গাঁজা খাওয়া নিগমানন্দের অভ্যাস নাই, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিতেও সাহসে কুলাইল না। কোনোমতে দুই-একটি টান দিয়া কল্‌কেটি আবার তাঁহার হাতে ফিরাইয়া দিলেন।

শুকনো পাতার আগুন নিভাইয়া দিয়া সন্ন্যাসী এবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখে কোনো কথা নাই। চলিতে চলিতে হাতছানি দিয়া নিগমানন্দকে নির্দেশ দিলেন তাঁহাকে অনুসরণের জন্য। দুর্বার এই অপরিচিত সন্ন্যাসীর আকর্ষণ! মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিগমানন্দ তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন।

মনে নানা আশঙ্কাও হইতেছে। এক একবার ভাবিতেছেন, এটা বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার মতো ব্যাপার নয় তো? কাপালিক নবকুমারকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল—এই সন্ন্যাসীর অভিসন্ধিও তেমনি কি না কে জানে? কিন্তু কি আশ্চর্য, নিগমানন্দের দিকে একটিবার চাহিয়াও দেখিতেছেন না। তিনি ঠিকমতো অনুসরণ করিতেছেন কিনা, সেদিকে সন্ন্যাসী একটিবারও লক্ষ্য করিতেছেন না।

কিছুক্ষণ পথ চলার পর সন্ন্যাসী একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের সানুদেশে গিয়া থামিলেন। কাছেই একটি স্নিগ্ধ পার্বত্য ঝরনা কুলুকুলু রবে বহিয়া যাইতেছে। নিগমানন্দ নিজেই তাঁহার সে সময়কার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়াছেন :

"এখানে এসে সে আমার দিকে তাকাল। কি সুন্দর তাঁর মূর্তি! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, বিশাল বক্ষঃস্থল, প্রশস্ত ললাট, ঘনকৃষ্ণ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, লম্বা আকর্ণবিস্তৃত চোখ, চোখে-মুখে যেন জ্যোতির ছটা বেরুচ্ছে। দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম।

"মন-প্রাণ ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে গেল। কখন জানি না কেমন ক'রে আপনা হতে শরীর তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ল।...তিনি আমায় সস্নেহে হাত ধরে উঠিয়ে, মধুর প্রাণ-গলানো স্বরে বললেন,—বৎস,

সহসা রাত্রি শেষে আমাকে গাছতলায় দেখে, আর তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে বলায়—বোধ হয় আশ্চর্যান্বিত হয়েছ, ভয় পেয়েছ। আমি কিন্তু আগেই জেনেছিলাম তুমি কে, কি জন্য ঘুরছো, তোমার অভাব কি,—কি জন্য গাছের উপরে ছিলে। আমার কাছেই তোমার মনোবাসনা সিদ্ধ হবে। তাই তোমাকে নিয়ে আসবার জন্য আমি ঐ গাছতলায় গিয়ে বসেছিলাম।"

নিগমানন্দ তখন আনন্দে বিস্ময়ে সন্ন্যাসীর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছেন।

ঐশী কৃপার ভাণ্ড হস্তে নিয়া আবির্ভূত সেদিনকার এই সন্ন্যাসীই নিগমানন্দের ঈশ্বর-নির্দিষ্ট যোগীগুরু—সুমেরদাস মহারাজ!

পাহাড়ের উপরে খানিকটা উঠিয়া গিয়া মহাপুরুষ বৃহৎ একখানা প্রস্তরখণ্ড ঠেলিয়া দিলেন। এটি ধীরে ধীরে অপসৃত হইলে দেখা গেল এক প্রকাণ্ড গহ্বর। উহার মধ্যে দুইটি প্রকোষ্ঠ, একটিতে দণ্ড-কমণ্ডলু ও আসন রক্ষিত, অপরটিতে থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে তালপত্রে লিখিত বহু সংখ্যক পুঁথি। নিগমানন্দ শুনিলেন, সুমেরদাস মহারাজ গুরু পরম্পরায় এগুলি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যোগীবরের পূর্বাশ্রমের বাস পাঞ্জাবে। মহারাজ রণজিৎ সিংহের ইনি ছিলেন অন্যতম অমাত্য। এক সময়ে কার্যব্যপদেশে প্রিন্স দলীপ সিংহের সহিত ইনি ইংলণ্ডেও গমন করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে কোনো কারণে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং একাকী রাশিয়া, চীন, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তিব্বতে অবস্থান করিবার সময় সৌভাগ্যক্রমে এক প্রাচীন সিদ্ধ যোগীর কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয় এবং তাঁহার জীবনে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। গুরুকৃপা ও পূর্বজন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার, এই দুইটি মিলিত হওয়ার ফলে উত্তরকালে তিনি পরিণত হন এক মহাসিদ্ধ যোগীরূপে।

এবার সুমেরদাসজী নিগমানন্দকে উচ্চতর যোগসাধনায় ব্রতী

করেন। প্রায় তিন মাস ব্যাপিয়া এই তরুণ প্রতিভাধর সাধককে তিনি নানা নিগূঢ় সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিতে থাকেন।

কিছুদিন পর মহাপুরুষ তাঁহাকে কহিলেন, "বেটা, এখন তুমি লোকালয়ে গিয়ে গভীরভাবে এই রাজযোগ সাধনায় রত হয়ে যাও। এ সাধনায় ঘি-দুধ খেতে হয়, পুষ্টিকর আহার্য না হলে চলে না। এর জন্য প্রয়োজন—লোকালয় আর ভক্ত গৃহীর সহায়তা। তা না হলে কাজ হবে না। এখানকার জঙ্গলের কচুসেদ্ধ খেয়ে এ যোগসাধন হয় না, বেটা!"

সুমেরদাসজী আরও বলিয়া দিলেন, "তুমি মেদিনীপুরে চলে যাও, তোমার কাজে সাহায্য করার লোক সেখানে রয়েছে।"

গুরুর নির্দেশে নিগমানন্দ আবার বাংলাদেশের দিকে চলিলেন। মেদিনীপুরের অন্তর্গত হরিপুর গ্রাম। ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন তাহারই উপকণ্ঠে স্থিত মন্দিরে আসিয়া তিনি রাত্রে আশ্রয় নেন।

প্রত্যূষেই একটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্যস্তসমস্তভাবে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। নাম সারদাপ্রসাদ মজুমদার, এ গ্রামেরই জমিদার তিনি। নিগমানন্দজীকে দেখিয়াই সারদাবাবু ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "দেখুন, গতরাত্রে আমি স্বপ্নে দেখেছি, দীর্ঘকায় জটাজূটধারী এক সন্ন্যাসী আমায় বলছেন—'তোদের দেবালয়ে এক সাধু রাত্রি যাপন করছে। যোগসাধনার জন্য তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন। তুই যথাসম্ভব সাহায্য কর। তোর কল্যাণ হবে।'—আপনিই কি সেই সাধু?"

নিগমানন্দ বুঝিলেন, সুমেরদাসজীরই এই কাণ্ড, শিষ্যের যোগসাধনাকে সহজসাধ্য করিতেই তাঁহার এ অলৌকিক লীলা।

সারদাবাবুর গৃহের পশ্চাদ্ভাগে এক বাগান রহিয়াছে। নবাগত সন্ন্যাসীর জন্য এই নিভৃত স্থানে তিনি নূতন গৃহ তৈয়ারি করাইয়া দেন। নিগমানন্দ এখানেই মগ্ন হন তাঁহার সাধনায়।

রাজযোগ অভ্যাসের উপকরণাদি যখন যেরূপ প্রয়োজন হইত এখন হইতে তাহা পাইতে আর তাঁহার কোনোই অসুবিধা হইত না। নিষ্ঠাভরে প্রায় এক বৎসর কাল এখানে তিনি যোগসাধনা অনুষ্ঠান

করিতে থাকেন। অতঃপর লোকের ভিড় ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য এস্থান তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়।

ইহার পর গৌহাটিতে যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস মহাশয়ের সঙ্গে নিতান্ত আকস্মিকভাবে একদিন তাঁহার পরিচয় ঘটে। এ ভক্তের গৃহে থাকিয়াও তিনি কিছুকাল নিজস্ব যোগাভ্যাসে ব্যাপৃত থাকেন। এই স্থানে ও কামাখ্যা পাহাড়ে থাকার কালে নিগমানন্দজী বহু উচ্চতর অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

উজ্জয়িনীতে সে বৎসর কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। মেলায় দীক্ষাগুরু সচ্চিদানন্দ মহারাজের চরণ দর্শন করিতে তিনি বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। মেলাক্ষেত্রে পৌঁছিয়া দেখিলেন, ইহার এক প্রান্তে বৈদান্তিক সাধুদের প্রকাণ্ড এক জমায়েত বসিয়াছে। শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য বেদান্তী সাধুদের নেতারূপে জমায়েতের কেন্দ্রে তাঁবু ফেলিয়াছেন। সচ্চিনানন্দ মহারাজও সেখানে সমাসীন।

গুরুজীকে দর্শন করা মাত্র নিগমানন্দ ছুটিয়া গিয়া তাঁহকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। শঙ্করাচার্য সর্বোচ্চ আসনে বসিয়া উপস্থিত সাধু ও ভক্তদের সহিত তত্ত্বালাপ করিতেছেন, কিন্তু তরুণ সাধক নিগমানন্দ তাঁহাকে লক্ষ্যই করিলেন না।

এ কোন্ শিষ্টাচার? একদল সন্ন্যাসী এ আচরণে রুষ্ট হইলেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে জমায়েতের সন্ন্যাসীদের মধ্যে জগদ্গুরু শঙ্করাচার্যকেই সর্বাগ্রে সম্মান দেখানো উচিত। একটি সন্ন্যাসী অভিযোগের সুরে কহিলেন, শঙ্করাচার্য হচ্ছেন জগদ্গুরু, বৈদান্তিক সমাজের মতে, তিনি তোমার গুরুরও গুরু। তাঁকে আগে প্রণাম করলে না, এ আবার কি রকম ব্যবহার?"

নিগমানন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "তা কি ক'রে সম্ভব? আমার গুরুর গুরু নেই। যদি গুরুর গুরু স্বীকার করা যায়, তাহলে গুরুতে অনবস্থা দোষ আসে—মদ্গুরু শ্রীজগতগুরুঃ!"

শঙ্করাচার্য এতক্ষণ নীরবে উভয় পক্ষের কথা শুনিতেছিলেন।

এবার স্মিতহাস্যে কহিয়া উঠিলেন, "বাচ্চা কিন্তু ঠিক কথাই বলছে, ওর সিদ্ধান্ত খণ্ডন করবার তো যো নেই।" এই তরুণ সাধক যে স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর শিষ্য এ-কথা জানিয়াও তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। অধ্যাত্ম অনুভূতি সম্বন্ধে এ সময়ে তিনি নিগমানন্দজীকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। উত্তর শুনিয়া প্রসন্নভাবে স্বামী সচ্চিদানন্দকে কহিলেন, "তোমার এ শিষ্যকে এখনো দণ্ডী বহাচ্ছো কেন? এ তো পরমহংস হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।"

উপস্থিত সাধু মহাত্মাদের সম্মতি নিয়া, সকলের আনন্দধ্বনির মধ্যে, সচ্চিদানন্দ মহারাজ সেদিন নিগমানন্দ স্বামীকে পরমহংস আখ্যা প্রদান করিলেন।

অতঃপর নিগমানন্দ কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন। ঘুরিতে ঘুরিতে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া সেদিন তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া বসিয়াছেন। নিঃসম্বল সন্ন্যাসীরূপে একাকী পরিব্রাজন করাই তাঁহার চিরাচরিত রীতি। হাতে অর্থাদি কোনো কিছুই নাই। তা ছাড়া, বারাণসী তাঁহার নিতান্ত অপরিচিত। ক্ষুন্নিবৃত্তি কি করিয়া করিবেন ইহাই তিনি ভাবিতেছেন। হঠাৎ মনে পড়িল, কাশীতে তো কেহ অভুক্ত থাকে না—এ যে অন্নপূর্ণার স্থান!

সংকল্প করিলেন, গঙ্গার ঘাটে বসিয়া এবার জোর ধ্যান লাগাইবেন। ক্ষুধার অন্ন এখানে সত্যসত্যই জুটে কিনা, অন্নপূর্ণার কৃপার এ মহিমা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইবে।

ধ্যাননিমীলিত নেত্রে নিগমানন্দ ঘাটের এক প্রান্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সম্মুখে অগণিত নরনারীর ভিড়। স্নানার্থী গৃহস্থ ভক্ত ও সাধুসন্ত পরিব্রাজকদের আসা-যাওয়ার বিরাম নাই।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল। ইতিমধ্যে এক স্নানার্থিনী হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। স্ত্রীলোকটি দেখিতে বড় কুৎসিত, বার্ধক্যের ভারে দেহটি ন্যুব্জ, পরিধানের বস্ত্র মলিন, ছিন্ন-ভিন্ন। হাতে তাহার একটি বড় শালপাতার ঠোঙা।

নিগমানন্দের পাশে এটি নামাইয়া রাখিয়া বৃদ্ধা সানুনয়ে বলিল, "বাবা, আমি চট্ ক'রে স্নানটা সেরে আসছি, এ ঠোঙাটা তোমার কাছেই রইল।" সম্মতি বা উত্তরের কোনো অপেক্ষা না রাখিয়া বৃদ্ধা সোপান বাহিয়া তখনই নিচে নামিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে নিগমানন্দের ধ্যানাবেশ ক্রমে গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। বেলা গড়াইয়া গিয়া কখন যে রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, সেদিকে তাঁহার হুঁশই নাই। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বুঝিলেন, রাত্রি তখন নয়টার কম হইবে না। ইতিমধ্যে ক্ষুৎপিপাসাও বড় তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিতে লাগিলেন, 'রাত তো গভীর হয়ে এল। কই, মা-অন্নপূর্ণার কাশীতে আজ আমার খাবারের তো কেউ সংস্থান করল না!'

হঠাৎ পার্শ্বস্থিত শালপাতার ঠোঙার উপর দৃষ্টি পড়িতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তাই তো, বেলা দ্বিপ্রহর হইতেই এটি কিন্তু সেই একভাবেই সেখানে পড়িয়া আছে। যে বৃদ্ধা ইহা গচ্ছিত রাখিয়া গেল সে তো স্নানের পর আর ফিরিয়া আসে নাই!

ঠোঙাটি হাতে নিয়া খুলিতেই নিগমানন্দ দেখিলেন, একগাদা সুখাদ্য মিহিদানা-সীতাভোগ উহাতে রক্ষিত। ধ্যানভঙ্গের পর ক্ষুধার জ্বালা সহের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। তদুপরি সম্মুখে রহিয়াছে বাংলাদেশের এ বহুবিশ্রুত মিষ্টি। ঠোঙাটি উজাড় করিয়া ফেলিতে আর দেরি হইল না। ভোজন শেষে অঞ্জলি পুরিয়া গঙ্গাজল পান করিলেন, ছাড়িলেন তৃপ্তির নিশ্বাস।

সে রাত্রিতে একটি জীর্ণ, মনুষ্য-পরিত্যক্ত গৃহের বারান্দায় স্বামী নিগমানন্দ নিদ্রিত রহিয়াছেন। গভীর রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন, জননী অন্নপূর্ণা রূপের ছটায় দশদিক আলো করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা। মধুর কণ্ঠে জননী কহিতে লাগিলেন, "বাবা, এবার তো প্রত্যক্ষ করলে, আমার কাশীতে অভুক্ত কেউ কখনো থাকতে পারে না। উপাদেয় খাবারগুলো আমিই তোমায় দিয়ে এসেছিলাম।"

নিগমানন্দ উত্তর দিলেন, "কই মা তুমি তো ওগুলো দাও নি। যে আমাকে দিয়েছে, সে তো এক বৃদ্ধা মানবী।"

"কেন বাবা, যিনি নির্গুণ তিনি কি সগুণে নামতে পারেন না? নিরাকারের ক্ষমতা কি সীমিত? যে কোনো আকার নিতে তাঁর আবার বাধে কোথায়?"

প্রসিদ্ধ বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর শিষ্য নিগমানন্দ। সহসা তিনি এ তত্ত্বটি মানিয়া নিতে পারিলেন না, মনে নানা সন্দেহের ছায়াপাত হইল। দেবী এবার সস্নেহে কহিতে লাগিলেন, "বাবা নিগমানন্দ, তোমার সাধনা কিন্তু এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে নি। তুমি এবার ভাবের সাধনা, প্রেমের সাধনার দিকে অগ্রসর হও, লীলারহস্য আয়ত্ত করতে শুরু করো।"

স্বপ্ন ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে নিগমানন্দ উঠিয়া বসিলেন। অন্তরের ব্যাকুলতা এবার যেন শতগুণ বাড়িয়া গেল। কোথায় সাধনজীবনের পূর্ণতার পথটি খুঁজিয়া পাইবেন, কোথায় তাঁহার পরম প্রাপ্তি মিলিবে —এই চিন্তায় তিনি অস্থির।

হঠাৎ স্মরণে আসিল তাঁহার গুরুদেবের কথিত, হিমালয়ের সেই সন্ন্যাসিনী মোহান্তের কথা। সে-বার উত্তরাখণ্ডে ভ্রমণের সময় স্বামী সচ্চিদানন্দ তাঁহাকে মহাসাধিকা গৌরীমাতাজীর সহিত পরিচয় করাইয়া দেন, সাধনার শেষের দিকে নিগমানন্দকে তিনি একবার তাঁহার নিকটে আসিতেও বলিয়াছিলেন। এবার সেই উত্তরাখণ্ডের আশ্রমের দিকেই তিনি রওনা হইলেন।

প্রায় আড়াইশত বৎসর বয়স এই গৌরীমার, কিন্তু তবুও বয়সের কিছুমাত্র ছাপ তাঁহার মধ্যে পড়ে নাই। তারুণ্যমণ্ডিত দেহে অপরূপ দিব্যশ্রী ঝলমল করিতেছে। ইহার তৎকালীন শিক্ষায় ও কৃপাস্পর্শে নিগমানন্দের সাধনসত্তায় এক অপার্থিব আনন্দ ও প্রেমের প্রস্রবণ খুলিয়া গেল।

ইহার পর তিনি চলিয়া আসেন আসামের গৌহাটি এবং গারো

পাহাড় অঞ্চলে। এখানে একান্ত মনে আপন সাধনার গভীরে বেশ কিছুকাল অবস্থান করিতে থাকে। এক অপার্থিব আনন্দের স্রোত এই সময়ে সর্বদা তাঁহার অন্তরসত্তায় বহিয়া চলিতে থাকে।

শুধু অন্তর্জীবনের নিগূঢ় সাধনা নিয়াই নিগমানন্দ এ সময়ে দিন অতিবাহিত করেন নাই, তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থত্রয়—যোগীগুরু, জ্ঞানী-গুরু, তান্ত্রিকগুরু প্রভৃতির মাধ্যমে এবার জনসমাজে তাঁহার পরিচয় ঘটিতে থাকে। সারস্বত মঠ, ঋষিকুল শিক্ষায়তন প্রভৃতির মধ্য দিয়াও এই শক্তিমান্ সাধকের সংগঠন নানা দিকে বিস্তৃত হইয়া উঠে। শুধু আসাম, বাংলা ও উড়িষ্যায়ই নয়, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের নানা অঞ্চলেও নিগমানন্দজীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

কর্মময় বহিরঙ্গ জীবনের অন্তরালে তাঁহার প্রেমাশ্রিত সাধনাটি বহিয়া চলে,—ধীরে ধীরে ইহা উন্মোচিত করিয়া দেয় গুরু জীবনের এক নূতনতর অধ্যায়। নিগমানন্দের এখানকার এ সাধন-জীবন মাধুর্য, কৃপালীলা ও যোগৈশ্বর্যে ভরপুর। সহজ প্রেম ও আন্তরিকতার স্পর্শেই সাধারণত তিনি ভক্ত ও শিষ্যদের আকর্ষণ করিতেন, শিক্ষার মাধ্যমে তাঁহাদের করিয়া তুলিতেন রূপান্তরিত। তাঁহার অলৌকিক যোগ-বিভূতিও শিষ্যদের সহিত আত্মিক যোগাযোগ স্থাপনে, তাঁহাদের কল্যাণ সাধনে কম কার্যকরী হইত না।

মধ্যপ্রদেশের বাস্তার রাজার প্রাণে এক সময়ে অধ্যাত্মসাধনার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। যোগসিদ্ধ এবং ঈশ্বরপ্রাপ্ত গুরুর জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন। অবশেষে একদিন তিনি দন্তিকেশ্বরের দেবী-মন্দিরে ধর্না দেন। তাঁহার চিহ্নিত গুরুদেব কে, কোথায় গেলে তাঁহার সন্ধান মিলিবে—এ তথ্য জানিবার জন্য দেবীর চরণে বার বার প্রার্থনা জানাইতে থাকেন।

এ সময়ে একদিন মন্দিরের মধ্যে আচম্বিতে দৈববাণী ধ্বনিত হয়, 'বৎস, তোমার গুরু হচ্ছেন বাংলার মহাসাধক নিগমানন্দ সরস্বতী, তাঁর আশ্রয় নিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।'

সুদূর মধ্যপ্রদেশে নিগমানন্দজীর নাম তখনও প্রচারিত হয়

নাই। অখ্যাত অজ্ঞাতকে এই মহাপুরুষ? বাংলাদেশে লোকজন পাঠাইয়া বহু খোঁজ-খবর নিবার পর বাস্তার-রাজ স্বামী নিগমানন্দের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন ও তাঁহার চরণোপান্তে আসিয়া উপস্থিত হন। তারপর এই সিদ্ধপুরুষের কৃপাস্পর্শে তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবন উজ্জীবিত হইয়া উঠে।

ইন্দোরের শ্রীপাঠক রাজ-সরকারের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী। সংসারের মায়াবন্ধন কাটাইয়া উঠিতে তিনি সেই সময়ে বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। কোন্ মহাপুরুষ তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন, কাহার তত্ত্বনির্দেশে প্রকৃত শান্তি লাভ করিবেন, ইহা নিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার তখন অবধি নাই।

একদিন তিনি নদীতীরে বসিয়া সখেদে ভাবিতেছেন, তাঁহার জীবনে প্রকৃত তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শুভাগমন কি হইবে না? অন্তরে এসময়ে জাগিয়া উঠিল এক তীব্র আলোড়ন।

সহসা তাঁহার নয়ন সমক্ষে আকাশের গায়ে এক দিব্যমূর্তি ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু কে এই মহাপুরুষ? ইঁহাকে তো তিনি কোনো দিনই দর্শন করেন নাই! অলৌকিক মূর্তিটি অতঃপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইঁহার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া উঠিল। অলৌকিকভাবে দৃষ্ট এই মহাত্মার চিন্তায় তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই পাঠকজী আবার এক অলৌকিক নির্দেশ প্রাপ্ত হইলেন। নদীতীরের সেই পূর্বের স্থানটিতেই তিনি সেদিন বসিয়া আছেন, হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে স্বর্ণাক্ষরে তিনটি শব্দ রূপায়িত হইয়া উঠিল—স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস। অতঃপর ভক্ত ও সাধুসন্তদের মহলে অনুসন্ধানের পর এই মুমুক্ষু ব্যক্তি নিগমানন্দজীর আশ্রয়লাভে সমর্থ হন।

শুধু অধ্যাত্মসাধনার পথেই নয়, সাংসারিক জীবনের আপদ-বিপদেও বহু ভক্ত সাধককে নিগমানন্দ মহারাজের অলৌকিক কৃপার আশ্রয় লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

ত্রিপুরার একটি ক্ষুদ্র অখ্যাত গ্রামের যুবক অশ্বিনী। মাতা পত্নী এবং বালক পুত্রটি নিয়া তাহার ছোট একটি সংসার। উপার্জন অতি সামান্য, কোনোমতে দিন অতিকষ্টে চলে। পরিবারটি নিগমানন্দজীর আশ্রিত। কুটিরের এক কোণে পরম শ্রদ্ধাভরে ঠাকুরের চিত্র স্থাপন করা আছে, সকাল সন্ধ্যায় সকলে মিলিয়া প্রণতি জানায়।

আকস্মিক এক দুঃসাধ্য রোগে সেদিন অশ্বিনীর প্রাণবিয়োগ হয়। বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রী শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়ে। শোকাচ্ছন্ন কুটিরের এক প্রান্তে গুরুদেবের ছবিটি স্থাপিত রহিয়াছে, সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই বৃদ্ধা মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, যে ঠাকুর দুর্দৈবের দিনে এমন নীরব দর্শক হইয়া থাকেন তাঁহাকে ঘরে রাখিয়া কি লাভ? আজই তিনি এ ছবিটিকে পুকুরের জলে বিসর্জন দিবেন।

ছবিখানি বিসর্জিত হইতে যাইতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে প্রাণ-গলানো আহ্বান আসিল—মা।

বৃদ্ধা ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলেন, গুরুদেব নিগমানন্দ ছলছল নেত্রে দণ্ডায়মান। চিত্রটি আর ফেলিয়া দেওয়া গেল না।

নিগমানন্দ করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "চল মা ঘরে যাই. আমিই তোমার ছেলে। আমি তোমায় মা বলে ডাকবো। অশ্বিনীর জন্য চোখের জল ফেলো না, সে আমার কাছেই আছে।"

কখন কোথা দিয়া স্বামী নিগমানন্দ ত্রিপুরার এই অখ্যাত পল্লীতে আবির্ভূত হইলেন, তাহা সত্যই এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। গৃহের সকলকে নানারূপে সান্ত্বনা দিয়া, কিছুক্ষণ তাহাদের সহিত কাটাইয়া আবার হঠাৎ কখন তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

অন্তর্ধানের পরেই সকলের হুঁশ হইল। গুরুদেব যে অলৌকিক শক্তিবলেই তাহাদের মধ্যে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিলেন, এ-কথা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

আর একবারের কথা। একদল স্থানীয় দুর্বৃত্ত সেদিন অশ্বিনীর গৃহে প্রবেশ করে এবং তাহার বিধবা পত্নীর উপর তাহারা অত্যাচার করিতে উদ্যত হয়। এই সংকটের দিনেও ঐ অসহায়া তরুণীর ভয়ার্ত

ক্রন্দনে নিগমানন্দজীর অনুরূপ আবির্ভাব ঘটে। তাঁহার তেজোদৃপ্ত হুঙ্কার শুনিয়া দুর্বৃত্তদল সে স্থান হইতে পলায়ন করে। অতঃপর ভয়ার্ত পরিবারটিকে আশ্বস্ত করিয়া স্বামীজী গৃহের বাহিরে একটি গণ্ডি অঙ্কিত করিয়া দেন। রাত্রিতে এই গণ্ডির ভিতরে অবস্থান করিলে কেহ তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না—এ-কথা বলিয়াই মহাপুরুষ হন অন্তর্হিত।

আশ্রিত শিষ্যদের মধ্যে তাঁহার গুরুজীবনের ভূমিকাটি কি, এ-কথা বুঝাইয়া দিতে নিগমানন্দজীর কোনোদিন ভুল হয় নাই। এ বিষয়ে তাঁহার বাণী ছিল স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। তিনি বলিতেন, "দ্যাখো, আমি অবতার-টবতার নই সাধারণ মানুষ। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি জীবন অতিক্রম ক'রে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার পর এ-জন্মে শ্রীভগবান্‌কে আমি জেনেছি, সত্য লাভ করেছি, ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হওয়ায় আমার ভেতর দিয়ে জগদ্‌গুরুর ইচ্ছাই লীলায়িত হয়ে উঠেছে, আমাকে তোমরা জগদ্‌গুরু বলে জেনে রাখো। আমি সাধনা দ্বারা নিজে মুক্ত হয়েছি—তোমাদেরও মুক্তির পথ দেখিয়ে দেব, এই আমার কাজ!"

জীবের পরিত্রাণের জন্য পরম আশ্বাস জানাইয়া তিনি কহিতেন, "দ্যাখো, জীবের আকুল ক্রন্দন আর ব্রহ্মাণ্ডপতির নিবেদন এ দুটি একত্র হলে সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ তাঁর অংশকে জীবের দুঃখ দূর করবার জন্য, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের জন্য পাঠান, আর অন্যান্য দেবতাদের তাঁর সহায়তার জন্য জন্ম নিতে বলেন।... জগদ্‌গুরুরাও জীবের দুঃখে আকুল হয়ে প্রার্থনা জানান। আমি প্রার্থনা করছি—তিনি আসুন। বর্তমানে চারদিকে যে বিরোধ আর অসামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে, তাতে তিনি না এলে, কেউ এর সমাধান করতে পারবে না। তিনি শিগ্‌গীরই আসবেন, বেশী দেরি নেই!"

শক্তিধর সাধকের আচার্য জীবনের শেষ অধ্যায়টি ক্রমে অগ্রসর

হইয়া আসে। এবার বাহির দুয়ারে কপাট লাগাইয়া ধীরে ধীরে হইতে থাকেন তিনি অন্তর্মুখীন।

১৩৪২ সালের অপরাহ্ণে মহাসাধকের কৃপাঘন মরলীলায় ধীরে ধীরে নামিয়া আসে চির যবনিকা। আশ্রিত শিষ্য ও ভক্তদের শোক-সাগরে ভাসাইয়া মগ্ন হন তিনি চির সমাধিতে।